মানব-সমাজ।

শ্রীশশধর রায় প্রণীত।

কলিকাতা।

২১০।৫ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, নব্যভারত-প্রেসে

শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সন ১৩২০।

উৎসর্গ পত্র।

অনন্যসাধারণ প্রতিভাশালী, বঙ্গের প্রধান গৌরব,

বঙ্গভাষার প্রকৃত হিতৈষী,

সৎ-সাহসী

সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়,

এম-এ, ডি-এল;

মহাশয়ের করকমলে

এই গ্রন্থ ভক্তিভরে

অর্পিত হইল।

ভূমিকা।

কোন একটী স্বনামখ্যাত কবি ও চিন্তাশীল ব্যক্তি কয়েক বৎসর হইল কতিপয় প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহা হইতে বুঝিতে পারিয়াছিলাম, এতদ্দেশে সমাজতত্ত্ব এবং জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান বিস্তৃতি লাভ করে নাই। এ নিমিত্ত ঐ প্রবন্ধাবলীর ভ্রান্তমত সকলের খণ্ডন করিতে ইচ্ছুক হইয়া "নব্য-ভারতে" দুই একটী কথা লিখিব, মনে করিয়া এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করি। ক্রমে তাহা হইতেই এই গ্রন্থ জাত হইয়াছে। প্রথমে বুঝিতে পারি নাই যে, ইহার কলেবর এত বড় হইবে। যাহা হউক, এত বড় হইলেও ইহাকে সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধীয় পূর্ণ গ্রন্থ বলা যায় না। বোধ হয়, সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে কোন নির্দ্দিষ্ট সময়েই সম্পূর্ণ গ্রন্থ লিখিত হইতে পারে না; কারণ সমাজ চির পরিবর্ত্তনশীল। এগ্রন্থও পূর্ণ গ্রন্থ নহে। কেবল মাত্র, সমাজতত্ত্বের যে অংশ জাতীয় উৎকর্ষ বিষয়ে আলোচনা করে, সেই অংশের অত্যাবশ্যকীয়, জ্ঞাতব্য বিষয় কয়েকটী সংক্ষেপে বিবৃত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। আমি এই কার্য্যে প্রধানতঃ পণ্ডিত-প্রবর গ্যাল্টন্ ও পিয়ার্সনকে অনুসরণ করিয়াছি। কিন্তু এতদ্দেশীয় সমাজ, বিশেষতঃ হিন্দুসমাজ, যে অংশে ইউরোপীয় সমাজ হইতে বিভিন্ন, সেই অংশে আমি ঐ বিখ্যাত পণ্ডিতগণের যথাযথ অনুসরণ করিতে পারি নাই। যাহা হউক, সকল আলোচনা অপেক্ষা মানবতত্ত্ব আলোচনা অধুনা এতদ্দেশের বিশেষ মঙ্গলজনক; এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। অত্যল্পকাল মধ্যেই "বর্ণতত্ত্ব" এবং "বংশানুক্রম" নামক অপর দুইখানি গ্রন্থও প্রকাশিত হইবে। এসকল পাঠে বঙ্গীয় সমাজ কিছুমাত্র উপকৃত হইলেও আমার শ্রম সফল হইবে। আর "সৌন্দর্য্য" উপভোগের সময় নাই; আমরা ক্রমেই অধঃপতিত হইতেছি। হিতকর বৈজ্ঞানিক আলোচনা কষ্টকর হইলেও, এক্ষণে তাহাতেই ধীরভাবে মনোনিবেশ করা আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়াছে, সন্দেহ নাই। ভগবান এতদ্দেশীয়গণকে ক্রমশঃ জ্ঞান বিজ্ঞানে উন্নত করুন, ইহাই আমার সর্ব্বান্তঃ-করণের প্রার্থনা।

এস্থলে আর একটী কথা উল্লেখ করা আবশ্যক বিবেচনা করি। এই গ্রন্থ যাঁহার নামে উৎসর্গীকৃত হইল, বঙ্গভাষা তাঁহার নিকট বিশেষ ভাবে ঋণী। কিন্তু বর্ত্তমান যুগ-প্রবর্ত্তক কবিবর রঙ্গলালের ন্যায় সার আশুতোষকেও বঙ্গ-ভাষা প্রায় উপেক্ষা করিয়াই আসিতেছে। তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলে বঙ্গসাহিত্য কেবল যে গুরুতর কর্ত্তব্য সাধন করিবে, তাহা নহে, নিজেও সম্মানিত হইবে, সন্দেহ নাই। আমার এই উৎসর্গপত্র সেই গুরুতর কর্ত্তব্য সাধনের এক অকিঞ্চিৎকর চেষ্টা মাত্র।

শ্রীশশধর রায়।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৯	৫	লইলেও	হইলেও
২১	৪	বিস্মৃতি	বিস্তৃতি
২৬	১২	সফল প্রদ	ফলপ্রদ
৩৪	২৯	প্রকৃতি সেবক	প্রকৃত সেবক
৪৭	১	ধর্ম্ম	ব্রহ্ম
ঐ	২	ধর্ম্ম	কর্ম্ম
ঐ	৫	শুক্রম	শুশ্রুম
৫২	১৪	লওয়া	+
৬২	২২	সে	যে
"	"	৮৯	৭৯
৮৮	পাদটীকা	স্বয়োর্ণা	স্বয়োবর্ণা
৯৬	শেষ পংক্তি	সাহকিতা	সাহসিকতা
১২৩	পাদটীকা	awaited	availed
১৩৩	২৩	তাহা	তাহার
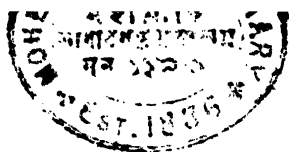
মানব-সমাজ।

প্রথম অধ্যায়।

সমাজ পদার্থটী বুঝা বড়ই কঠিন। ব্যক্তির সমষ্টিতেই সমাজ। কিন্তু কেবল তাহাই নহে। ঐ সমষ্টি অপেক্ষাও সমাজ আর একটু বেশী। * সমাজ বুঝিতে হইলে ব্যক্তিকে বুঝা আগে আবশ্যক। কোন নির্দ্দিষ্ট মানব সমাজকে পরিচালন করিতে ঐ সমাজস্থ ব্যক্তিকে চিনা চাই; তাহাকে ব্যক্তি হিসাবে তো চিনা চাই-ই, জীব হিসাবেও চিনিতে হয়। সমাজ যেমন মানুষের আছে, তেমনই অনেক ইতর জীবেরও আছে। বিবর্ত্তনের ফলে মানব ইতর জীব হইতে জাত হইয়াছে। তাই মানুষকে চিনিতে হইলে তাহার পূর্ব্ব পুরুষগণকে অর্থাৎ ইতর জীবদিগকেও চিনা চাই। মানুষকে বিশ্ব হইতে পৃথক করিলে বুঝা যাইবে না। দেহে ও মনে মানুষ সমস্ত জীবের উত্তরাধিকারী; সে দেহে ও মনে পৃথিবীর এবং জগতের সমস্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থার ঘাত প্রতিঘাত বহন করিতেছে। সে বিশ্বের সহিত এক সূত্রেই গ্রথিত। তাই তাহাকে চিনিতে হইলে জীব জড়, সমস্ত জগতের অংশ রূপেই চিনিতে হয়। পৃথক করিয়া চিনিবার উপায় নাই। জড়বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞান, —এ তিনের সম্যক আলোচনার পর মানবকে কিছু কিছু চেনা যাইতে পারে। এবং ব্যক্তিকে চিনিবার পর সমাজকে চিনিবার কিছু কিছু আশা করা যায়।

মানব-সমাজ বুঝা এত কঠিন। ইহাকে এক অর্থে মহাকাব্য বলিলেও কেবল কবিকল্পনার সাহায্যে ইহাকে বুঝা যাইতে পারে না। উপরে যে ত্রিবিধ বিজ্ঞানের কথা বলিলাম, উহাদিগকে এক কথায় প্রকৃতি বলা যায়।

---

* Human societary unit is a new synthesis * * *—a unity with distinctive mode of behaviour, with a whole that is more than the sum of its parts. Thomson's Heredity. p 510.

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান যেরূপ ভাবে পরিজ্ঞাত থাকিলে মানবকে এবং মানব সমাজকে বুঝা যায়, সকল দেশেই সমাজের নেতৃগণ তাহা জানেন না। জীব-বিজ্ঞান না বুঝিয়া মানবকে বুঝিবার চেষ্টা করা একবারেই অসম্ভব। ইহা নেতৃগণ বুঝেন না, এবং জানেনও না।* মানুষের বিষয় সকলেই চিন্তা করে এবং মানব-সমাজের বিষয় সকলেই ভাবে। কিন্তু প্রকৃত রূপে ভাবিবার উপযোগীতা কয়-জনের আছে? এসম্বন্ধে সন্দেহ-শূন্য মত দিবার অধিকার বোধ হয় কাহারও নাই। কিন্তু যে রোগের প্রতিবিধানে বহুদর্শী সুপণ্ডিত চিকিৎসক হতবুদ্ধি হইয়া যান, হাতুড়িয়া-বৈদ্য তাহা নিশ্চয় আরাম করিতে পারে বলিয়া অকপটে দ্বিধাশূন্য ভাবে প্রচার করিয়া থাকে। যে যত জানে কম, যে যত বুঝে কম, সে ততই দৃঢ় মত পোষণ করে। জগতে এই এক আশ্চর্য্য ব্যাপার!

কোন কথাই বলা যায় না। কিন্তু প্রায় সকল সমাজের নেতৃগণই স্ব-রচিত বিধিনিয়মের উপর এতদূর আস্থাবান যে, সকল কথাই নিশ্চিত রূপে বলিতে সাহসী হন; সকল বিধিই দৃঢ়তার সহিত অনুষ্ঠান করিতে সাহসী হন। জীব বিজ্ঞান, এমন কি, মানবতত্ত্ব পর্য্যন্তও জানিবেন না, অথচ মানব সমাজ পরিচালন করিবার দুরাকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করেন। মানব-সমাজ খেলা করিবার সামগ্রী নহে। ইহার এক দিকে প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করিলে শত দিকে অভাবনীয়, অচিন্তনীয় ফল উৎপন্ন হয়। সে সমস্ত চিন্তা করা, সে সমস্ত ধারণা করা একেবারেই অসম্ভব। স্পেন্‌সার দেখাইয়াছেন যে, ইংরেজ সমাজে সুরাপান নিবারণের চেষ্টা করায় নরহত্যা রূপ বিষময় ফল উৎপন্ন হইয়াছিল। দরিদ্রের অন্ন সংস্থান করিতে গিয়া দারিদ্র্যকে আরও বাড়াইয়া তুলা হইল; তাহার উপর স্থানে স্থানে ব্যভিচার দোষ উৎপন্ন করা হইয়াছিল।এমন যে সদনুষ্ঠান, তাহারও ফল কতদূর বিষময় হইল! ইহা কি পূর্ব্বে কেহ বুঝিতে পারিয়াছিলেন? এতদ্দেশে জাতিভেদ প্রথা প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রথমে কত সামাজিক মঙ্গল সাধন করিয়াছিল;- কিন্তু আজি কে অস্বীকার করিতে পারেন যে,সেই মঙ্গল হইতেই কত অমঙ্গল জাত হইয়াছে? এক দিকে বঙ্গ বিভাগ, আর এক দিকে বোমার দুমদুমি। কেহ কি কখন সম্ভব মনে করিয়াছিলেন যে, বঙ্গবিভাগ বোমাকে প্রশ্রয় দিবে? সমাজকে নাড়াচড়া করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। ব্যক্তিগত জীবন যেমন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম

* Ray Lankester, Kingdom of Man, p 43,

অনুসারে পরিচালিত হয়, সামাজিক জীবনও তেমনই নিয়মের অধীন। ব্যক্তিগত জীবনে কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ যে সূত্রে গ্রথিত, সামাজিক জীবনেও তাহাই। একথা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করা চাই। ব্যক্তির প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত না হইলে ব্যক্তিসমষ্টির অর্থাৎ সমাজের প্রকৃতিও পরিবর্ত্তিত হইবে না। যে কারণে যে কার্য্য ব্যক্তির জীবনে উৎপন্ন করিবে, অগ্রে তাহা বুঝা চাই। তৎপর ঐ কারণ সমাজে কি ফল উৎপন্ন করিবে, তাহা বুঝা যাইতে পারে। ব্যক্তিতত্ত্ব ও সমাজ-তত্ত্ব এক না হইলেও এক সূত্রেই গ্রথিত।

জীব-বিজ্ঞান শিখাইতেছে যে, এক ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জীববস্তু-পূর্ণ কোষ ক্রমে বিভক্ত ও বিবর্ত্তিত হইতে হইতে নিম্নতম হইতে উচ্চতম জীবদেহ রচনা করিয়াছে। ঐ প্রাথমিক কোষের অঙ্গ-বিভাগ ও ক্রিয়া-বিভাগ কিছুই ছিল না। উহা ক্রমে বিবর্ত্তিত হইয়া বহু-কোষিক জীবদেহ গঠিত করিল। এ দেহে অঙ্গ-বিভাগ ও ক্রিয়া-বিভাগ উৎপন্ন হইয়াছে। মানব-সমাজেও তদ্রূপই। প্রাথমিক সমাজে অঙ্গভেদ ও ক্রিয়াভেদ ছিল না। আবশ্যকমত সকলেই সকল কর্ম্ম করিত। ক্রমে সমাজ-দেহ যেমন বাড়িয়া চলিল, তাহার সঙ্গে সঙ্গেই সমাজের নির্দ্দিষ্ট অংশ নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মে নিয়োজিত হইল; আর তখন হইতেই সমাজের অঙ্গ-ভেদ ও ক্রিয়া-ভেদ উৎপন্ন হইল। এইরূপে জীব-বিবর্ত্তনের সহিত সমাজ-বিবর্ত্তনের নিকট-সম্বন্ধ লক্ষিত হইয়া থাকে।

তাহার পর ব্যক্তির কথা বিবেচনা করিতে হয়। পিতৃ মাতৃ শুক্র-শোণিতে যে পিণ্ড উৎপন্ন হইয়া থাকে, ব্যক্তি তাহারই পরিণাম। সেই শুক্র শোণিত কত যুগ যুগান্তর হইতে কত কত পূর্ব্ব-পুরুষগণের দেহের ও মনের উপাদান রাশি বহন করতঃ বর্ত্তমান পুরুষকে রচনা করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। পুরুষ পরম্পরায় বিধিনিয়মের অধীন হইয়া সেই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কোষদ্বয় কি উপকরণ লইয়া আসিয়াছিল, তাহাদিগের সংমিশ্রণ কালে সেই সকল উপকরণ কিরূপ ভাবে ভাঙ্গিয়া গড়িয়া একীভূত হইয়া গেল, আর কেমন করিয়াই বা বর্ত্তমান পুরুষ রচনা করিল, এ সকল কথা পণ্ডিতগণ এখনও বুঝিতে পারেন নাই, বলিলেই হয়। তবে যাহা কিছু বুঝিতে পারিতেছেন, তাহাতে এতদূর পর্য্যন্ত বলিতে পারা যাইতেছে যে, মানবকে কাদার মত যেমন ইচ্ছা তেমন করিয়া ভাঙ্গা-গড়া যায় না। তাহার একটা জন্মগত ব্যক্তিত্ব আছে, যাহা শুক্র-শোণিত সংমিশ্রণের কাল হইতেই নির্দ্দিষ্ট ও সম্পূর্ণ রূপে নিয়মিত। তাহার সেই ব্যক্তিত্ব হইতে এক কণাও এদিক ওদিক হইবার

উপায় নাই।* তাহার জীবনে সেই ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশিত না হইতে পারে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার ফলে এক পথ হইতে অন্য তুল্য পথে ধাবিত হইতে পারে, কিন্তু তাহাকে ইচ্ছানুরূপ পরিবর্ত্তিত করিবার সাধ্য কাহারও নাই। যে বংশানুক্রম হেতু খর্ব্বাকার হইবে, তাহাকে কোন ক্রমেই দীর্ঘকায় করা যাইবে না। যে ঐ হেতু বশতঃ ধীর অথবা চঞ্চল হইবে, তাহাকে অন্যরূপ করা যাইবে না। যে পিণ্ড বুদ্ধির উপকরণহীন, তাহা হইতে কোনক্রমেই শঙ্করাচার্য্য উৎপন্ন হইবে না। তবে যে পারিপার্শ্বিক অবস্থাধীনে যে পিণ্ড হইতে শঙ্করাচার্য্য উৎপন্ন হইল, তাহা অন্যবিধ অবস্থাধানে বরাহমিহিরও হইতে পারিত, অথবা নাও পারিত। ভ্রূণতত্ত্ব হইতে ইহাই শিখিতে পাই যে, পুং-কীট ও স্ত্রী-ডিম্বের সংমিশ্রণে যে যুক্তকোষ উৎপন্ন হয়, তাহার সমস্ত শক্তি অবস্থাধীনে বিকশিত নাও হইতে পারে। কিন্তু তাহাতে যাহা নাই, তাহা ব্যক্তির ভবিষ্যৎ জীবনে কখনই আসিতে পারিবেনা। শিক্ষা এ বিষয়ে নিতান্ত নিষ্ফল। যাহা আছে, শিক্ষা তাহাকে বাহির করিতে পারে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাহাকে প্রকটিত করিতে পারে,অথবা তাহার বিকাশের বাধক হইতে পারে ; কিন্তু যাহা নাই,তাহা আনিতে পারিবে না। এই অর্থে ব্যক্তির দৈহিক বিকাশ পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট,† সুতরাং মানসিক বিকাশও তাহাই।

ব্যক্তির যদি এই অবস্থা হইল, তবে সমাজের অবস্থা কি হইবে? যে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ লইয়া সমাজ-দেহ গঠিত,যে সমস্ত শক্তি লইয়া সমাজ-শক্তি প্রতিষ্ঠিত, তাহা কত যুগ যুগান্তরের ছায়া বহন করিতেছে, কত অতীত দেশ কালের পুঞ্জীকৃত উপাদানের পরিণাম! চিরাতীত কাল হইতে সমাজেরও দেহ এবং মন, ব্যক্তির ন্যায়, একটা নির্দ্দিষ্ট পথে চলিয়া আসিতেছে। ব্যক্তির ন্যায় সমাজেরও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ একটা নির্দ্দিষ্ট আকার ধারণ করিয়াছে। তাহা কি হাতুড়িয়া বৈদ্যের ফুঁ ফাঁতে উড়িয়া যাইবে? ইহা কখনই হইতে পারে না। যে কারণ-পরম্পরা যে কার্য্য উৎপন্ন করিয়াছে, তাহা উহাদিগের অনিবার্য্য ফল। বংশা-

* যৎক্ষণাৎ পতিতো বিন্দুঃ মাতৃগর্ভে নিয়োজিতঃ। তৎক্ষণাৎ লিখিতং ধাত্রা কর্ম্মাকর্ম্ম শুভাশুভং॥

† Nothing can arise in an organism unless the predisposition to it is pre-existent ; for, every acquired character is simply the re-action of the organism upon a certain stimulus. Weisman's Heredity vol 1 p 172. see also p 104-5.

মুক্রম, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অন্তর্নিহিত-শক্তি এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা * দ্বারা, ব্যক্তির ন্যায়, সমাজও নিয়মিত হয়। অতীত কাল হইতে ঐরূপই হইয়া আসিতেছে। এ তিনের পরিবর্ত্তন না হইলে উভয়েরই পরিবর্ত্তন অসম্ভব। সাময়িক বিধি নিষেধ দ্বারা সাময়িক লক্ষণ মাত্র উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু স্থায়ী পরিবর্ত্তন সিদ্ধ হইতে পারে না। স্থায়ীফল উৎপন্ন করিতে হইলে স্থায়ীরূপে ঐ ত্রিবিধ প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করিতে হয়; ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ব্যক্তির ও সমাজের অন্তর্নিহিত বীজশক্তির পরিবর্ত্তন দীর্ঘকাল অপেক্ষা করে; পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতিক্রিয়াও অল্পকালে ফলোৎপাদন করে না। জীব যেমন এক হইতে বহু হইয়াছে, সরল হইতে জটিল হইয়াছে, সমাজও তাহাই। পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত, জীবের ন্যায়, সমাজেরও বিকাশ সিদ্ধ হইয়াছে। ঐ বিকাশ হইতে হইতে কখন বা অকস্মাৎ পূর্ব্বাপেক্ষা সম্পূর্ণ পৃথক ফল উৎপন্ন হইয়াছে। এই কথা বুঝইবার জন্যই পণ্ডিতগণ এই অবস্থাকে sport অর্থাৎ খেলানামে অভিহিত করিয়াছেন। ইহা প্রধানতঃ অন্তর্নিহিত বীজশক্তির ফল। যাঁহারা সাময়িক উৎপীড়ন অথবা একটা মিষ্ট কথা দ্বারা সমাজের গতি সম্পূর্ণ ভিন্নপথে চালিত করিতে ইচ্ছা করেন, আর তাহা হইতে স্থায়ী ফলের প্রত্যাশা করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। ইহা তাঁহাদিগের সাধ্যাতীত। জীব বহু হইয়াছে, সমাজও বহুবিধ আকার ধারণ করিবেই; তাহা কেহই নিবারণ করিতে পারিবে না। যাঁহারা বহু সমাজকে মিশাইয়া 'একাঙ্গত্ব' সাধন করিবার স্বপ্ন দেখিতেছেন, তাঁহারা বহুবিধ জীবকে আবার সেই মৌলিক একটী জীবকোষে পরিণত করিতে পারেন। উভয়ই তুল্য প্রকার দুরাশা মাত্র। জীব-তত্ত্ব না বুঝিয়া সমাজ-তত্ত্বের মত প্রকাশ করিলে ফল এইরূপই হয়। † দেহ ও মন একসূত্রে গ্রথিত, ব্যক্তি ও সমাজ এক প্রকার নিয়মেই পরিচালিত; আর সে নিয়ম জীব-বিজ্ঞানের অন্তর্গত, কারণ সমাজতত্ত্ব মানবতত্ত্বের এবং মানবতত্ত্ব জীবতত্ত্বের অধীন। জীবতত্ত্ব বিশ্বতত্ত্বের একাংশ মাত্র। এই নিমিত্তই বলিয়াছি যে, বিশ্ব হইতে পৃথক করিলে মানবকে বুঝা যাইবে না। মানব যুগ যুগান্তর হইতে সমস্ত বিশ্বের

* Heredity, function and environment.

† Mankind is governed by the same laws as govern the animal kingdom, and no true system of sociology can be offered which does not take full account of those laws—G.G, Bourne. Herbert Spencer Lecture 1909 p 34.

ঘাত প্রতিঘাত দেহে ও মনে বহন করিতেছে; জল, স্থল, অন্তরীক্ষ সকলই তাহাকে নিয়মিত করিতেছে।* জলবিন্দু হইতে মহাসমুদ্র পর্য্যন্ত, তৃণ হইতে ভূধর পর্য্যন্ত, বাষ্প হইতে ঝটিকা পর্য্যন্ত, অন্ধকার হইতে আলোক পর্য্যন্ত, উদ্ভিদ্ হইতে কীট, পতঙ্গ, পশু, ও পক্ষী পর্য্যন্ত, নীহারিকা হইতে জ্যোতিষ্ক-মণ্ডল পর্য্যন্ত—সকলেই মানবের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতেছে।† কেবল মানবের দেহ নহে, তাহার স্বভাব, তাহার আচার ব্যবহার, সামাজিক রীতি নীতি সকলই উহাদিগের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। নদী-বহুল দেশের জনগণের স্বভাব একরূপ, সমুদ্র-তীর-বাসিগণের অন্যরূপ, এবং পার্ব্বত্যগণের স্বভাব আর একরূপ হইয়া থাকে; একথা কাহারও অবিদিত নাই। পার্ব্বত্য-গণের মধ্যে কন্যাসন্তান অপেক্ষা পুত্রসন্তান অধিক জন্মে। সমতলবাসী-দিগের মধ্যে ইহার বিপরীত হইয়া থাকে। এই এক ঘটনা হইতেই অর্থাৎ স্ত্রী-পুং-সংখ্যার ইতরবিশেষ হইতেই সামাজিক আচার ব্যবহার কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়! সংস্কারক সমাজের প্রতি যত অস্ত্রই প্রয়োগ করুন, এ প্রভেদ, এ পরিবর্ত্তন তিনি কোন ক্রমেই নিবৃত্ত করিতে পারিবেন না। তাই বলিয়াছি, মানবকে ইচ্ছানুরূপ ভাঙ্গা গড়া যায় না। সে জড় ও জীব, দ্বিবিধ প্রকৃতির উত্তরাধিকারী। কেবল বংশ-পরম্পরা জানিলেও মানবকে জানা যাইবে না, সুতরাং মানব সমাজকেও বুঝা যাইবে না।

সমাজ ব্যক্তির সমষ্টি, সন্দেহ নাই; কিন্তু সমাজ ঐ সমষ্টি হইতেও অধিক। সমাজের যেন নিজেরই একটা জীবন আছে; এই জীবন আদর্শকে লক্ষ্য করে। আদর্শ ব্যবহারিক জগৎ হইতে অনেক উপরে। ব্যক্তি তাহা কখনই লাভ করিতে পারে না; কিন্তু যখনই কোন মহাপুরুষ অনুরূপ আদর্শ লইয়া অবতীর্ণ হন, সমাজ অমনি তাহা আত্মসাৎ করে। ইহার ফলে সমাজ উন্নতির পথে অগ্রসর হয়।

মানবের ধর্ম্মশাস্ত্র বলিতেছে "আত্মানং বিদ্ধি,"Know thyself" ইত্যাদি।

* Man is held to be a part of Nature, a product of the definite and orderly evolution which is universal, a being resulting from and driven by the one great mechanism which we call Nature. Kingdom of man, p 7.

† The physical conditions of a country including the climate, the vegetation and the indigenous animals, affect the lives of the human inhabitants of that country. Haddon's Study of man, Introduction, p xvii,

মানবের বিজ্ঞান বলিতেছে, সকল আলোচনা অপেক্ষা আপন-তত্ত্ব অবগত হওয়াই মানবের অধিক প্রয়োজনীয়।* আপনাকে না চিনিলে, আপনাকে না বুঝিলে, মানবের বন্ধ-মুক্তির উপায় নাই। কিন্তু তাহাকে চিনিতে হইলে বিশ্বপ্রকৃতিকে চিনা চাই। তাই বলিয়াছি, মানবকে, মানবসমাজকে চিনা, বুঝা বড়ই কঠিন। সমাজের দুর্ভাগ্য এই যে, যাঁহারা মানবকে চিনিবার চেষ্টা করেন, চিরদিনই তাঁহারা সমাজের নেতৃত্বকে তুচ্ছ করিয়া আসিতেছেন। এক দেশে নয়, সর্ব্ব দেশেই এইরূপ। যাহারা প্রকৃতিকে বুঝে না, তাহারা মানবকে বুঝিবে কেমন করিয়া? দুর্ভাগ্য বশতঃ প্রায় সর্ব্ব দেশেই এই শ্রেণীর অনভিজ্ঞ লোক সমাজের নেতৃত্বপদ অধিকার করিয়া আসিতেছে। তাই সমাজ মানব-জীবনের প্রকৃত সফলতা লাভ করিতে সমর্থ হইতেছে না।

মানব জীবনের প্রকৃত সফলতা বন্ধ-মুক্তি। কিন্তু তাহা মানবকে খণ্ড খণ্ড করিয়া নহে। কোন মানবকেই খণ্ড খণ্ড করা যায় না। ব্যক্তিগত মানব, সামাজিক মানব, রাজনীতিক মানব, ধর্ম্মনীতিক মানব, অর্থনীতিক মানব—কোন মানবই এরূপ টুক্‌রা টুক্‌রা হইবার বস্তু নহে। পারিবারিক মুক্তি হইল, সামাজিক মুক্তি হইল না; সামাজিক মুক্তি হইল, রাজনীতিক মুক্তি হইল না; রাজনীতিক মুক্তি হইল, ধর্ম্মনীতিক মুক্তি হইল না—এরূপ হইতেই পারে না। ইহা ব্যক্তির পক্ষেও অসম্ভব, সমাজের পক্ষেও অসম্ভব। ব্যক্তির মুক্তি আত্মজ্ঞানে, সমাজের মুক্তিও আত্মজ্ঞানে। ব্যক্তির সহিত সমাজের সাদৃশ্য সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। আত্মজ্ঞানহীন ব্যক্তির ন্যায় আত্মজ্ঞানহীন সমাজও মুক্তি লাভ করিতে পারে না। যে সমাজ আপনার গঠন ও শক্তি, আপনার চিরাগত প্রকৃতি ও ধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া যায়, জগতে তাহার স্থান নাই। সে ক্রমে ক্রমে মৃত্যু-মুখে পতিত হইবেই, সন্দেহ নাই। যে আপনাকে চিনে, অমৃতের অধিকারী সে-ই হয়, অপরের তাহাতে অধিকার নাই।

সমাজকে প্রকৃতরূপে বুঝা, তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্যকে সফলতা দান করা, ব্রহ্মজ্ঞানের ন্যায় দুঃসাধ্য। ইহাকে বুঝি অথচ বুঝিও না। নাহংমন্যে সুবেদেতি নোনবেদেতি বেদচ। *সমাজকে বুঝি, ব্যবহারিক হিসাবে।

* After all we are of more interest, to ourselves than any study can be. The Study of man, Introduction, p xxiv.

পরমার্থতঃ বুঝিতে হইলে সমাজতত্ত্ব শাস্ত্রই প্রণীত হইতে পারিত না। সকল মানবেরই এক একটা সাধারণ ধর্ম্ম আছে। তাহা লইয়াই একটা অপূর্ণ সমাজ-তত্ত্ব রচিত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহাকে আজিও প্রকৃত পক্ষে জীব-তত্ত্বের সহিত একীভূত করা হয় নাই। মানব সবই শিখিতে চায়; শিখা অত্যাবশ্যকও। কিন্তু মানব কেবল মানব-তত্ত্বই অবহেলা করিয়া আসি-তেছে। ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়, সন্দেহ নাই। সমাজকে বুঝিতে হইলে, সমাজের বিধি নিয়ম প্রণয়ন করিতে হইলে, সামাজিক ইতর-জন্তু হইতে মানবসমাজ পর্য্যন্ত সকলকেই মনোমধ্যে অঙ্কিত রাখিতে হইবে। পিপীলিকা, মধুমক্ষিকা, ইহারা সমাজবদ্ধ হয় কেন? বহু তীর্থযাত্রী একত্র তীর্থে গমন করে, তাহারাও মানব সমষ্টি। কিন্তু তাহাদিগকে সমাজ বলা যায় না কেন? এই বিষয় চিন্তা করিলেই সমাজের প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। সমাজবদ্ধ জীব সমাজের জীবনকে রক্ষা করে। অপরের আক্রমণ হইতে সমাজকে রক্ষা করা, সমাজ-ভুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে দুর্ব্বলকে সবলের হস্ত হইতে উদ্ধার করা, পরস্পরের জীবন-ব্যাপারের অনুকূল কার্য্য করা এবং প্রতিকূল কার্য্য হইতে বিরত হওয়া, পরস্পরের প্রতি সমবেদনা অনুভব করা—ইহাই সমাজের প্রধান লক্ষণ এবং উপকারিতা। যদি পর-স্পরের উদ্দেশ্য সাধন ও সহায়তা না হইল, তবে সমাজের অন্য কোনও অর্থ নাই। এস্থলেও ব্যক্তিকে স্মরণ রাখিতে হইবে। ব্যক্তির প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তাহার জীবনব্যাপারের অনুকূল; সমাজেরও তাহাই হওয়া আব-শ্যক। ব্যক্তির কোন এক স্থানে আঘাত লাগিলে সর্ব্বশরীরেই বেদনা অনু-ভূত হইয়া থাকে, সমাজেও তাহাই হওয়া আবশ্যক। যে ব্যক্তির অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জীবন-ব্যাপারের অনুকূল হয় না, সে রুগ্ন; যে ব্যক্তির এক স্থানে আঘাত লাগিলে সর্ব্বত্র বেদনা হয় না, সে পীড়াগ্রস্ত, সে মৃত্যুমুখে পতিত। সমাজেরও তাহাই। যে সমাজে এক ব্যক্তির বিপদে অন্যান্য ব্যক্তিগণ বেদনা অনুভব করে না, যেখানে সমাজের এক অংশ সমস্ত সমাজের উপ-কারে আসে না, সে সমাজ রুগ্ন, সে সমাজ মৃত্যুমুখে পতিত। তাহাকে সুস্থ অবস্থায় আনিতে পারিলে রক্ষা হইবে, নচেৎ নহে।

---

* নিতান্তই বুঝি না যে তাও সত্য নহে। বুঝি যে এমন কথা কার সাধ্য কহে। জানিনা তবুও জানি।

উপনিষদ গ্রন্থাবলী পৃঃ ৬৯।

মানব সামাজিক জীব। সামাজিকতার ফল যেমন পরস্পরের নিকট হইতে উপকার লাভ, তেমনই বিবিধ মনোবৃত্তির উন্নতি সাধন। যে সমস্ত সদ্‌গুণ মানবের হৃদয়ে দেবত্ব আনিয়াছে, তাহা সামাজিকতারই ফল। আত্ম-রক্ষা, অপত্যরক্ষা, সমাজের প্রবর্ত্তক কারণ; এবং বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি, ন্যায় ও কর্ত্তব্যজ্ঞান, সমদর্শীতা ও স্বার্থত্যাগ, তৃপ্তি ও সুখ-বৃদ্ধি, সমাজ-বন্ধন হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। এস্থলে ব্যক্তির বাল্যজীবন হইতে মানবের প্রাথমিক অবস্থা অনুমিত হইতে পারে। বালক কেবল আপনাকেই বুঝে, তাহার আপনারটী ষোল আনা বহাল থাকা চাই; বালক বড়ই স্বার্থপর। কিন্তু যখন ক্রমে বয়োবৃদ্ধি সহকারে সেই বালক নানা জনের সংসর্গে আসে, তখন পরার্থের নিকট স্বার্থকে বলি দিতে ক্রমে অভ্যস্ত হয়। সামাজিক মানবও তদ্রূপ। কেবল স্বার্থ দেখিলে সমাজ চলেই না। সামাজিক ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিগণ পরার্থ দেখিতে বাধ্য।

বলিয়াছি, (মানব সমস্ত জীবের উত্তরাধিকারী। তাই অসামাজিক ইতর-জীবের ধর্ম্ম সকলও মানবে বর্ত্তমান আছে। উন্নতবৃত্তি সে সকলকে দমিত রাখিতে পারে; কিন্তু সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিতে পারে না। তাই সমাজবদ্ধ মানবও কখন কখন অসামাজিক স্বার্থসেবী ভাব কর্ত্তৃক চালিত হইয়া সমাজের এবং ব্যক্তির অনিষ্ট করিয়া থাকে। এইরূপে সামাজিক অপরাধ উৎপন্ন হয়।) ইহা মানব হৃদয়ে নিদ্রিত পশুভাবের পুনরাবৃত্তি। এই নিমিত্তই অপরাধিগণকে অধ্যাপক টম্‌সন্ অতীত কালের পুনরাবৃত্তি বলিয়াছেন। * সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বকালের ভাব অর্থাৎ স্বার্থ, আত্ম-সেবা ইহাদিগকে অদ্যাপি পরিচালিত করে। এই অবস্থাতেই সামাজিক অবনতি। দণ্ড ইহার একমাত্র প্রতিরোধক নহে, অথবা প্রধান প্রতিরোধকও নহে। এ কথা পরে বুঝা যাইবে।

ব্যক্তিগত জীবনে যেরূপ বাল্য, যৌবন, জরা ও মৃত্যু আছে, সামাজিক জীবনেও তাহাই। † ব্যক্তির জীবনে যেমন কর্ম্মই এক মাত্র লক্ষণ,

* Are not many criminals mere anachronism ?—People out of time or out of place, who require not incarceration or worse .....Heredity 1908 p, 531.

† কিন্তু বোধ হয় তাহা অপরিহার্য্য নহে।

সামাজিক জীবনেও তাহাই। জীববিবর্ত্তনের সহিত, কর্ম্মের ভাব, ইতর প্রাণীদিগের নিকট হইতে মানব প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহাই বা বলি কেন? ব্যক্ত-চৈতন্যের তো কর্ম্মই একমাত্র লক্ষণ; কর্ম্ম জীবনের সহজাত বৃত্তি। তাই অধ্যাপক লেব্ বলিতেছেন, "One of the most important instincts is usually not even recognized as such, namely the instinct of workmanship."* অর্থাৎ কর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তি মানবের সহজাত ধর্ম্ম। হিন্দুর গীতাও এই শিক্ষা দিতেছে। ব্যক্তি এবং সমাজ উভয়েরই লক্ষণ ও পরিণাম কর্ম্মে। সামাজিকের পরিণাম পরস্পরের সুখকর কর্ম্মে, সমাজ রক্ষার কর্ম্মে। তাহার বিপরীত হইলে ব্যক্তির ন্যায় সমাজেরও মৃত্যু উপস্থিত হয়। যেমন অপরে ব্যক্তির কর্ম্ম কাড়িয়া লইতে পারে, তেমনিই সমাজের কর্ম্মও কাড়িয়া লইতে পারে। এইরূপ হইলে উভয়েরই জীবনের আশা চলিয়া যায়।

---

* Loeb's Comparative physiology of the brain, 197.

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সমাজ রক্ষা ও তাহার উন্নতিবিধান করিতে হইলে সমাজের সর্ব্ববিধ কর্ম্ম সমাজের মধ্য হইতেই হওয়া আবশ্যক। অপরে কর্ম্ম করিয়া দিলে, ব্যক্তির পক্ষেও যেমন, সমাজের পক্ষেও তেমনি, দিন দিন অলসতা আসিয়া উপস্থিত হয়। এ অবস্থায় সমাজ ক্রমেই অধঃপাতে চলিয়া যায়। সমাজের কর্ম্ম সমাজের মধ্য হইতেই হওয়া আবশ্যক। কিন্তু কর্ম্ম করিবে কে? সমাজস্থ-জনগণ কর্ম্ম করিবার যোগ্য হওয়া চাই। তাহারা দেহে ও মনে, সংকল্পে ও শিক্ষায়, উদ্যোগে ও অধ্যবসায়ে কর্ম্ম করিবার উপযুক্ত হওয়া চাই। এ সকল কিসে হয়, তাহাই বিবেচনা করা আবশ্যক। ইচ্ছা করিলেই ত যোগ্য হওয়া যায় না; আর সকলের ইচ্ছাও হয় না। ব্যক্তি আজিকার পদার্থ নহে। যে পুংকোষ ও স্ত্রীকোষ সম্মিলিত হইয়া বংশের পর বংশ গঠন করিতেছে, তাহা চিরাতীত কাল হইতে বংশানুক্রমের নিয়ম অনুসারেই স্বকর্ম্ম সাধন করিয়া আসিতেছে। † এ নিয়ম সাধারণতঃ পরিবর্ত্তনহীন।

এস্থলে প্রথমে দেহ গঠনের কথা বিবেচনা করা যাউক; তাহা হইলে মনের বিষয় সহজে বুঝা যাইবে। আর দেহের উন্নতি অবনতির সহিত মনের উন্নতি অবনতি যেরূপ ভাবে জড়িত, তাহাতে দেহের কথাই অগ্রে বিবেচনা করা সঙ্গত। দেহ শুক্র শোণিতের মিশ্রণ জাত। পুংকোষ ও স্ত্রীকোষ

---

* The molecules of the reproductive protoplasm grow and increase without altering their peculiar nature and without modifying the hereditary tendencies derived from the parents.

Wiesmann's Heredity, Vol 1. p. 74.

† Mental and physical degeneration rather go hand in hand. Ibid Vol. II. p. 22.

অতীব ক্ষুদ্র হইলেও এক একটী মহা ভাণ্ডার। উহাদিগের প্রত্যেক অণুতে কত বংশের কত উপাদান সঞ্চিত রহিয়াছে! পুংকোষের কতিপয় অণু, স্ত্রীকোষের কতিপয় অণুর সহিত মিশ্রিত হয়; উভয় কোষেরই অবশিষ্ট অণু সকল মিশ্রিত নাও হইতে পারে। যে সকল অণু পরস্পর মিশ্রিত হইতে পারে, তাহারাও ভাঙ্গিয়া গড়িয়া যে কিরূপ পরিণতি প্রাপ্ত হইবে, তাহা কিছুই বলা যায় না। কিন্তু যেরূপ পরিণতিই প্রাপ্ত হউক, পুংকোষের অণু সকল ও স্ত্রী-কোষের অণু সকল আপন আপন শক্তি ও প্রবণতা সকল সময় প্রকাশ করিতে সক্ষম হয় না। অনেক সময় উভয়-কোষ-মিশ্রিত পিণ্ডে ঐ সকল শক্তি ও প্রবণতা প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়া যায়। স্ত্রী-কোষ ও পুংকোষ মিশ্রিত হইবার সময় ঐ কোষদ্বয়ের অণু সকল যে শক্তি ও প্রবণতা লইয়া আসিয়াছিল, তাহার কিয়দংশ ভ্রূণ দেহে প্রকাশ হয়, অপরাংশ গুপ্ত-ভাবে রহিয়া যায়। এই কার্য্য কোষদ্বয়ের মিশ্রণ সময় হইতেই আরম্ভ হয়। যুক্তকোষের অণু সকল কি এক অনির্ব্বচনীয় শক্তিতে শতধা সহস্রধা বিভক্ত হইতে হইতে অবশেষে তিনটী স্তর * গঠিত করিয়া লয়। তাহা হইতেই অপত্যদেহ পূর্ণাকারে রচিত হয়।

ইহাই মানব দেহ গঠনের প্রক্রিয়া। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, শুক্র শোণিতকোষ সকল বংশপরম্পরা-ক্রমে যে শক্তি ও প্রবণতা লইয়া মিশ্রিত হইয়াছিল, অপত্য তাহার অধিক কিছুই প্রাপ্ত হইতে পারে না; আর তাহার মধ্যে যে সকল শক্তি ও প্রবণতা প্রচ্ছন্ন রহিয়া গেল, অপত্যের জীবনে সে সকল প্রকাশ নাও হইতে পারে। অপত্য অনুকূল অবস্থায় পতিত হইলে সে সকল প্রকাশ হওয়া কথঞ্চিৎ সম্ভব, কিন্তু প্রতিকূল অবস্থায় প্রচ্ছন্ন শক্তিগুলি তো প্রকাশ হইবেই না, অপর শক্তিগুলিও পূর্ণরূপে বিকশিত হইবার বাধা পাইতে পারে। স্ত্রী-পুংকোষ মধ্যে যে উপকরণ নাই, তাহা কেহই দিতে পারে না; যাহা আছে, তাহা প্রকাশ হইতেও পারে, না হইতেও পারে। †

---

* Foster and Balfour. Embryology, 2nd Edition pp 323,and 271—273

† We have no experience of any means by which transmission may be made to deviate from its course, nor from the moment of fertilization

একক্ষণে সমাজের প্রয়োজনোপযোগী কর্ম্মের কথা বিবেচনা করুন। অপত্য বংশানুক্রম অনুসারে যে সকল শক্তি ও প্রবণতা লাভ করিয়াছে, তদুপযুক্ত কর্ম্ম ব্যতীত অন্য কর্ম্ম সে কেমন করিয়া করিবে? আমি এমন বলিতেছি না যে পুরুষ পরম্পরায় একই কর্ম্ম করিতে হইবে। পূর্ব্ব পুরুষগণ যেরূপ দেহ-যন্ত্রের ও যেরূপ শক্তির সহায়তায় যেরূপ কর্ম্ম করিতেন, পরবর্ত্তিগণ তাহারই সহায়তায় অন্য কর্ম্মও করিতে পারেন। কিন্তু অপত্য বংশানুক্রমে যে শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, সে শক্তি দ্বারা যাহা সিদ্ধ হইবার নহে, তাহা অপত্য করিতেই পারে না। তাহার দেহ ও মন যে উপাদান, যে শক্তি ও প্রবণতা লাভ করিয়াছে, তাহা দ্বারা যে কর্ম্ম সিদ্ধ হইতে পারে, সে সেই কর্ম্মেরই উপযোগী ; অন্য কর্ম্মের উপযোগী নহে। এই অনুপযোগীকে অন্য কর্ম্ম শিক্ষা দিলেও সে শিক্ষায় সুফল হইবে না, বরং কুফলও হইতে পারে। † কারণ তাহার দেহে যদি অসৎ কর্ম্মের শক্তি ও প্রবণতা প্রচ্ছন্ন থাকে, তবে তাহা শিক্ষা ও সংসর্গ দ্বারা বিকশিত হইয়া সমাজের অনিষ্টজনক হওয়া সম্ভব। এই নিমিত্তই বংশানুক্রমের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া সকলকেই একটা বাঁধা নিয়মে নানারূপ শিক্ষা দিবার চেষ্টা করা অতীব অসঙ্গত। বালক বালিকার প্রবণতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সমাজের প্রয়োজনোপযোগী শিক্ষা দেওয়াই সঙ্গত। এ নিয়মের অন্যথায় বর্ত্তমান সময়ে যে কুফল ফলিতেছে, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। তথাপিও বংশানুক্রমের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া জনসাধারণের মধ্যে একই শিক্ষা সমান ভাবে বিস্তার করিবার একটা ধুয়া উঠিয়াছে। ইহা বিজ্ঞানানুমোদিত নহে। প্রাচীন হিন্দুগণও ইহা বিলক্ষণ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। *

---

can teaching Hygiene or exhortation pick out the particles of evil in that zygote, or put in one particle of good. Thomson's, Heredity, 607.

† The so-called educating of the mentally backward child is one of the most difficult and one of the most dangerous with which we are called upon to deal, With them it is not a question of curing their mental defect, because their defect is congenital—born with them * * * It is not honest for us to gull the public into believing that those can be really educated. Race Culture, pp 50-15. Also cf Wallace, The world of Life p, 397.

* ন ধর্ম্ম শাস্ত্রং পঠতীতি কারণং ন চাপি বেদাধ্যয়নং দুরাত্মনঃ। স্বভাব এবাত্র তথাতিরিচ্যতে। যথা প্রকৃত্যা মধুরং গবাং পয়ঃ! হিতোপদেশ।

তবেই দেখা যাইতেছে যে, সমাজের উপযোগী কর্ম্ম সকলের নিকট হইতে আশা করা যায় না। শক্তি ও প্রবণতা অনুসারে সমাজের বিভিন্ন জনগণ বিভিন্ন কর্ম্ম গ্রহণ করিবেন, নচেৎ কর্ম্ম সুসিদ্ধ হইবে না। সুতরাং সমাজ ক্রমেই অধোগতি প্রাপ্ত হইবে। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে হয় প্রয়োজনীয় কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইবেই না, অথবা অনুষ্ঠিত হইয়াও পরিত্যক্ত হইবে, নচেৎ কার্য্য অসিদ্ধ হইয়া যাইবে। এ স্থলে উপায় কি? সমাজস্থ জনগণ উপযুক্ত উপাদানে গঠিত না হইলে, উপযুক্ত শক্তি অথবা প্রবণতা লাভ করিতে পারে না। উপাদানের অর্থ ই বংশানুক্রমিক উপাদান। যে স্থলে কর্ম্মোপযোগী মানুষের অভাব, সে স্থলে মানুষ গড়িবার উপায় অবলম্বন করাই উচিত। মানুষ গড়িব কেমন করিয়া? মানুষ ত কাদা দিয়া হাতে গড়িয়া লওয়া যায় না। স্ত্রীপুরুষ দ্বারাই মানুষ গঠিত হয়; সুতরাং এমন স্ত্রী, এমন পুরুষ একত্রিত করিব, যাহারা বংশপরম্পরায় ঈপ্সিত কর্ম্মের উপাদান দ্বারা গঠিত হইয়া আসিতেছে। এ স্থলে নিম্ন জীবের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। খেঁকী কুকুরকে সাহসী করিব, সুতরাং ডালকুত্তার সহিত তাহার সংযোগ না ঘটাইয়া উপায় কি? তাহা হইলে বাচ্চা সাহসী হইবার আশা করা যায়। এ প্রণালী এত সহজ ও পরিষ্কার ভাবে প্রমাণিত নহে যে, ইহা হইতে সর্ব্বত্রই সুফল হইবে। কিন্তু এ কথা নিশ্চিত রূপে বলা যাইতে পারে যে, বিবাহ দিবার সময় বরকন্যার বংশগত দোষগুণ, শারীরিক ও মানসিক অবস্থা বিশেষরূপে প্রণিধান করিয়া কার্য্য করিলে সুফল প্রাপ্ত হইবার আশা করা যায়। অযোগ্যের বংশে যোগ্য পুত্র লাভ করিবার অন্য উপায় নাই বলিলেই হয়। মানুষ গড়িতে হইলে বিবাহ বিধির উপর লক্ষ্য রাখা আবশ্যক; কারণ মানুষ গড়িবার অন্য উপায় নাই। কিন্তু যে সমাজে বিবাহক্ষেত্র অতীব সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছে, যে সমাজে যোগ্য অযোগ্য ভাবিয়া কার্য্য করিবার অবসর নাই, সে সমাজকে পতিত অবস্থা হইতে রক্ষা করিবার উপায়ও নাই। এ কথা বিশেষরূপে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

বংশানুক্রমের ত্রিবিধ নিয়ম জানা গিয়াছে; মিশ্রিত, অমিশ্রিত এবং উভচিহ্নিত।* (১) স্ত্রী ও পুংকোষের অণু সকল সম্পূর্ণরূপে মিশ্রিত হইয়া এরূপ ভাবে অপত্যের দেহ ও মন গঠিত করিতে পারে যে, উহাদিগের কোন লক্ষণই বুঝা যায় না। উভয়ের লক্ষণ ভাঙ্গিয়া গড়িয়া মিশিয়া যায়। এইরূপ হইলে

---

* Blended, exclusive and particulate.

মিশ্রিত বংশানুক্রম বলে। (২) অমিশ্রিত বংশানুক্রমের লক্ষণ এই যে, স্ত্রী ও পুংকোষের অণু সকল মিশ্রিত হইলেও একের শক্তি ও প্রবণতা এতই প্রবল হয় যে, অপত্য-দেহে উহাই প্রকাশ পায়। অপরের শক্তি ও প্রবণতা লুপ্ত হইয়া থাকে, অথবা চিরতরে পরিত্যক্ত হয়। দুইটী বিভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত পুং কোষ ও স্ত্রী কোষ মিশ্রণে কখন বা প্রথম বংশে মিশ্রিত লক্ষণযুক্ত অপত্য দেখা যায়; কিন্তু পর পর বংশে ঐ লক্ষণ অমিশ্রিত অর্থাৎ পৃথক হইয়া যায়। তখন দেখা যায় যে, অপত্য সংখ্যার মধ্যে বার আনা এক লক্ষণযুক্ত ও সিকি অপর লক্ষণযুক্ত হইল। এই সিকি এবং ঐ বার আনার মধ্যে সিকি চিরদিন অমিশ্রিত লক্ষণ যুক্ত রহিয়া যায়; উহার অবশিষ্ট আট আনা মিশ্রিত বংশানুক্রম প্রদর্শন করে। পাদরি মেণ্ডেল ইহা সর্ব্ব প্রথম দেখাইয়াছেন। নীচের চিত্রের ক ও খ চিরদিন স্বধর্ম্ম স্থির রাখে।

ক খ
।
কখ
।

ক	কখ	খ
।০	॥০	।০

অবশেষে, (৩) যেস্থলে অপত্য দেহে স্ত্রী-পুংকোষের অণু সকল স্ব স্ব শক্তি ও প্রবণতা পৃথক ভাবে প্রকাশিত করে, তাহাকে উভচিহ্নিত বলা যায়। এই ত্রিবিধ বংশানুক্রম অনুসারে অপত্য গঠিত হইয়া থাকে। স্ত্রী ও পুংকোষ পৃথক ভাবাপন্ন হইলে অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষ এক জাতীয় হইয়াও ভিন্ন দেশোদ্ভব অথবা ভিন্ন প্রকার হইলে, অনেক সময় অপত্য উভয় অপেক্ষাই হীনশক্তি হইয়া থাকে। কখন বা অধিকতর শক্তি-শালীও হয়। কোন নির্দ্দিষ্ট স্থলে কি ফল উৎপন্ন হইবে, তাহা বংশানুক্রমের গতি পর্য্যবেক্ষণ করিলেই বুঝিবার আশা করা যায়। এইরূপে ঈপ্সিত শক্তি ও প্রবণতা যে বংশে সমধিক দৃষ্ট হয়, সে সম্বন্ধে তাহাই উপযুক্ত ক্ষেত্র। এ ক্ষেত্রে অপত্য ঈপ্সিত শক্তি ও প্রবণতা লাভ করিবার সম্ভব। কর্ম্ম বংশানুগত নহে, কর্ম্মের উপযোগী শক্তি ও প্রবণতাই বংশানুগত। কর্ম্মের উপযোগী উপাদানও বংশানুগত। তৎপ্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া বিবাহ-ক্ষেত্র ক্রমেই সংকীর্ণ করিলে সে সমাজের অস্তিত্বই সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়ে। এই নিমিত্তই এ কথা নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে, পতিত সমাজকে উন্নত করিতে হইলে জীবতত্ত্বের নিয়মানুসারে বিবাহ-ক্ষেত্রের প্রসার বিধান করা অত্যাবশ্যক।

সমাজ ভাবিতে গেলেই সমাজের জনসংখ্যা ভাবিতে হয়। মানুষ না থাকিলে সমাজ কাহাকে লইয়া? জন্মের সংখ্যা, অন্ততঃ জীবিতের সংখ্যা প্রচুর থাকা চাই-ই, বরং কিছু অতিরিক্ত থাকা সমাজের পক্ষে কল্যাণকর। তাহা হইলে জীবন-সংগ্রামের প্রখরতা হেতু সমাজস্থ জনগণের বুদ্ধি ও শক্তি উৎকর্ষতা লাভ করে। * ঐ অতিরিক্ত জন-সংখ্যা উপযুক্ত সীমা অতিক্রম করিলে মরণজনিত হ্রাস উপস্থিত হয়; পুনরায় ঐ সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এইরূপে জনসংখ্যা চক্রের ন্যায় উঠা পড়া করে। ইহাতে সমাজের উত্থান পতন হইতে পারে, কিন্তু ধ্বংস হয় না। ধ্বংসের কারণ আলোচনা করা অত্যাবশ্যক এবং ঐ কারণকে দূর করা অথবা তাহা হইতে দূরে অবস্থান করা সমাজের স্থায়িত্বের পক্ষেই প্রয়োজনীয়। সমাজধ্বংসের সর্ব্ব প্রধান কারণ জনন-শক্তির হীনতা এবং অকাল মৃত্যু। জনন-শক্তির হীনতা ক্রমে বন্ধ্যাত্ব আনিয়া উপস্থিত করে। অকাল মৃত্যুর প্রধান কারণ পীড়া; আনুষঙ্গিক কারণ বাল্য বিবাহ, খাদ্যের অসদ্ভাব ইত্যাদি। অকাল-মৃত্যু মধ্যে অতিরিক্ত শিশু মরণ বিশেষ আশঙ্কার বিষয়। এক্ষণে এই সকলকে যথাক্রমে আলোচনা করিব।

মানব বহু পরিবর্ত্তন সহ্য করিতে পারে, কিন্তু চিরাগত আচার ব্যবহার ও প্রথার গুরুতর পরিবর্ত্তন সহ্য করিতে পারে না। এরূপ পরিবর্ত্তন সহজেই জনন-শক্তির হীনতা উৎপাদন করে। যদিও কোন পরিবর্ত্তন জনক-শক্তির বৃদ্ধিকারক, কিন্তু এমন অনেক পরিবর্ত্তন আছে, যাহাতে বন্ধ্যাত্ব আনয়ন করে। † ডার-উইন্ বলেন—"অবস্থার পরিবর্ত্তনের সহিত জননশক্তির যেরূপ ভাবে পরিবর্ত্তন হইতে দেখা যায়, বিশেষতঃ বানর শ্রেণীর মধ্যে এই পরিবর্ত্তনের ক্রিয়া যেরূপ লক্ষিত হইয়া থাকে, তাহাতে প্রথমে মানবও যে, অবস্থার পরিবর্ত্তন বশতঃ বন্ধ্যাত্ব প্রাপ্ত হইত, সেবিষয়ে সন্দেহ করা যায় না।" এই মহাত্মা অন্যত্র বলিয়াছেন যে, জাতীয় বিলোপের কারণ অনেক স্থলেই বন্ধ্যাত্ব ও পীড়া, বিশেষতঃ শিশুদিগের পীড়া। ইহা আচার ব্যবহারের পরিবর্ত্তন হইতেই জাত হয়। সে পরিবর্ত্তন সাক্ষাৎ স্বরূপে অনিষ্ট-জনক না হইলেও উহার ফল অতিশয় মারাত্মক। ‡ ইহা ব্যতীত, বংশগত

* The Evolution of sex. p 249.

† Descent of man 293-94.

‡ The most potent causes of extinction appear in many cases to be lessened fertility and ill health specially amongst children arising from changed conditions of life, notwithstanding that the new conditions may not be injurious in themselves. Idid, p, 284

পীড়া অথবা দুর্ব্বলতাও জনন-শক্তির হীনতা উপস্থিত করিতে পারে। ম্যালেরিয়া প্রভৃতি জনন-শক্তির হানি করে। পীড়া এবং ব্যক্তিগত দুরাচার বন্ধ্যাত্বের এবং অকাল মৃত্যুর অন্যতর কারণ। তারপর আর এক কথা। জনন-হীনতা অথবা বন্ধ্যাত্ব অনেক সময় ব্যবসায়ের উপরও নির্ভর করে। তীব্র উত্তেজনার বেগে, দিবারাত্রি অক্লান্ত পরিশ্রমে, দিগ্দেশে বিস্তৃত হইয়া বাণিজ্যাদি ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়া, অর্থোপার্জ্জন হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে ব্যক্তিগত বন্ধ্যাত্ব ও জাতিগত জনন-হীনতা উৎপন্ন করিয়া থাকে †। জনন-হীনতার এ সকল কারণ ব্যতীতও আর একটী কারণ আছে, তাহার নাম দাসত্ব। ইহাতে দেহের ও মনের এরূপ অবসন্নতা আনিতে পারে যে, জনন-যন্ত্র তাহা সহ্য করিতে সক্ষম হয় না। পরবশতায় অনেক ইতর জীবের বংশহানি হওয়া প্রত্যক্ষসিদ্ধ।

বন্ধ্যাত্ব এবং অকাল-মৃত্যুর প্রধান কারণ সকল সংক্ষেপে উল্লেখ করিলাম। ইহার মধ্যে কতিপয় কারণ নৈসর্গিক, অপর কারণ সামাজিক দুষ্ট-বিধির এবং ব্যক্তিগত দুরাচারের ফল। এ সকলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যে সমাজ চলিতে পারে, সে ক্রমেই উন্নত হয়; যে না পারে, সে সমাজ অবনত হইয়া পড়ে, এবং কালে লোপ হইয়া যায়। আচার ব্যবহারের আমূল পরিবর্ত্তন করা, কিছুতেই উচিত নহে। এই সাংঘাতিক কারণের গতি রোধ করা কঠিন নহে। বাল্য বিবাহ, ব্যক্তিগত দুরাচার—এ সকলও নিবৃত্ত করা সহজ; কিন্তু খাদ্যের অসদ্ভাব অথবা দাসত্ব, এ দুই কারণের প্রতিকার করা সহজ নহে। যাহা হউক, সমাজের প্রথম কথাই স্থায়ীত্ব। উপরে যে সকল প্রতিকূল কথা বলা হইল, তাহা ব্যতীতও স্থায়ীত্বের প্রতিকূল আর একটী বিশেষ গুরুতর কথা বিবেচনা করা উচিত। প্রত্যেক সমাজেই অন্ততঃ তিন চারিটী স্তর থাকে—উচ্চ, মধ্যম ও নিম্ন। নিম্ন শ্রেণী হইতে ক্রমে উচ্চ শ্রেণীতে, উচ্চ শ্রেণী হইতে ক্রমে নিম্ন শ্রেণীতে উঠা পড়া হওয়া চাই। সমাজস্থ জনগণ

† In the large cities of America "hustle hustle" is the cry of commerce and of commerce only * * "hustle hustle" may allow a company to declare a 20 per cent divident and to rush up shares, but it steadily works for sterility and other forms of degeneracy. Race Culture, p 82.

Many nations have fallen and disappeared when their commercial condition was at its zenith, Ibid p, 80.

এইরূপে নিম্ন হইতে উচ্চে, উচ্চ হইতে নিম্ন স্তরে উঠা পড়া করিতে না পারিলে সে সমাজ জমিয়া যায়। তাহার জীবনী শক্তি থাকে না। যে জাতির জন-সংখ্যা প্রধানতঃ নিম্নস্তরেই সীমাবদ্ধ, অর্থাৎ কতকগুলি দরিদ্র, রুগ্ন, অশিক্ষিত, চরিত্রহীন মানব লইয়া যে জাতি গঠিত, সে জাতি অধিক কাল জীবিত থাকিতে পারে না। * এ কথা স্বীকার করি যে, প্রত্যেক সমাজেই অধিকাংশ লোক দরিদ্র, অশিক্ষিত থাকিবে, সন্দেহ নাই। শিক্ষিত, অর্থশালী, বলিষ্ঠ লোকের সংখ্যা সকল সমাজেই অল্প। ইহাঁরাই উচ্চ শ্রেণীর। নিম্ন শ্রেণীতে অর্থহীন, অশিক্ষিতের সংখ্যাই অধিক। কিন্তু আজি যাহারা অর্থহীন অশিক্ষিত, সুতরাং নিম্ন শ্রেণীর, কালি তাহারা অর্থশালী ও শিক্ষিত হইয়া উচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত হইতে পারে, অন্ততঃ উন্নীত হইবার সম্ভাবনাও থাকে, এরূপ বিধান না থাকিলে কোন সমাজই জীবিত থাকিতে পারে না। যে রুগ্ন, অর্থহীন, মূর্খ,.........সমাজে তাহার স্বার্থ কি? কোন রূপে তাহার নিজের কালটা কাটিয়া গেলেই হইল। সমাজে তাহার স্বার্থ কি? জীবনে তাহার সুখ কি? এ অবস্থা হইতে সে এক দিন উন্নত হইতে পারিবে, এমন আশাও যদি না থাকে, তাহা হইলে তাহা দ্বারা সমাজের কি কাজ হইতে পারে? কিছুই না। উচ্চ শ্রেণীর মুষ্টিমেয় ব্যক্তি ইহসংসারের সুখ-ভোগ করুক; কিন্তু সমাজের অধিকাংশ লোক যদি সমাজ রক্ষার বিষয়ে চেষ্টাহীন হইল, তবে সে সমাজ অল্প কালেই ভাঙ্গিয়া পড়িবে, কখনই উন্নত থাকিতে পারিবে না। যাহাতে সমাজের অধিকাংশ লোকের মনে সমাজ রক্ষার একটা স্পৃহা উৎপন্ন হয়, তাহা করিতেই হইবে। উন্নতি বিধান করা অল্পেরই কর্ম্ম। কিন্তু স্থির রাখিবার চেষ্টা অধিকাংশের থাকা চাই। যে সমাজে অল্প লোক অধিকাংশকে পদদলিত করিতেছে, সে সমাজ মুমূর্ষু অথবা মৃত।

এস্থলে আর একটী কথা বিবেচনা করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। ব্যক্তির

---

* If therefere, a nation has its population recruited not from those who are physically, mentally, finacially able to have and to bring up the best stock, but from the poorer classes, what can be expected of the coming race? Nothing but evil.

* * No nation can survive if its population be recruited from slumdom.

ন্যায় সমাজেরও দৃশ্যতঃ একটা আয়ুস্কাল আছে। বিভিন্ন জীব-সমাজের আয়ুস্কালও ভিন্ন ভিন্ন। এই কাল জাতিগত, ইহা প্রত্যেক জীবের পৃথক পৃথক *। সম্ভবতঃ প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন জীব ভিন্ন ভিন্ন আয়ুস্কাল প্রাপ্ত হইয়াছে। ব্যক্তির পরমায়ু অল্প, কিন্তু জাতির পরমায়ু অত্যন্ত অধিক। তাহা হইলেও জাতীয় পরমায়ুরও দৃশ্যতঃ একটা সীমা আছে।† ইহাই সমাজের পরমায়ু। রুগ্ন, অবসন্ন, অল্পায়ু ব্যক্তি সমাজের আয়ু ক্ষয় করে। তেমনি চরিত্র-বলহীন, নৈতিক-বলহীন ধর্ম্মে পতিত সমাজও দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে পারে না। যাহারা দেহে ও মনে রুগ্ন ও অবসন্ন, তাহারা অপত্য উৎপন্ন করিয়া ভবিষ্যৎ সমাজকেও তদ্রূপ অথবা ততোধিক রুগ্ন, অবসন্ন ও অধঃপতিত করিতে না পারে, সেদিকে সমাজের দৃষ্টি থাকা চাই। সমাজস্থ জনগণ স্ব স্ব সদ্বুদ্ধিতেই এরূপ কার্য্য হইতে বিরত হয়, ভাল। নচেৎ সামাজিক বিধি নিষেধদ্বারা তাহাদিগের অপত্যোৎপাদন যথা সম্ভব রহিত করতঃ ভবিষ্যৎ সমাজকে অধঃপতনের হস্ত হইতে রক্ষা করা অত্যাবশ্যক। নচেৎ সমাজের উন্নতি স্থায়ী হয় না। সামাজিক উন্নতি নষ্ট হইবার ইহা এক গুরুতর কারণ।

যাহারা দৈহিক ও মানসিক উৎকট পীড়াবশত সমাজদ্রোহী অথবা সমাজের শত্রুরূপে পরিণত হইয়াছে, তাহাদের বংশবৃদ্ধি কল্যাণকর নহে। এই গুরুতর বিষয় পরিশিষ্টে আলোচিত হইবে।

---

* বাইশ বল্‌দা তের ছাগলা,
দশের উর্দ্ধ না যায় হেংলা (কুকুর)
নরা গজা বিশা শ
শকুনি হাজার, কাক পাঁচশ।

† বর্ত্তমান সময়ে জীবের অথবা সমাজের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম বলিয়া মৃত্যুকে স্বীকার করা কঠিন। উহা আকস্মিক দুর্ঘটনা মাত্র।

তৃতীয় অধ্যায়

সমাজের প্রথম ও শেষ কথাই মানুষ এবং তাহার কর্ম্ম। মানুষ বলিতে সংখ্যা ও দেহ ; এবং কর্ম্ম বলিতে দেহ ও মন ;—এই কয়েকটী কথা সর্ব্বাগ্রে বিবেচ্য।

সংখ্যা।—যে দেশে যে পরিমাণ লোক প্রতিপালিত হইতে পারে, তদপেক্ষা জন সংখ্যা অধিক থাকা উচিত। তাহা হইলে জীবন-সংগ্রামের কঠোরতা হয়, সুতরাং জনগণ শ্রমশীল, কৌশলী ও বুদ্ধিবৃত্তিতে উন্নত হইয়া উঠে। দেশের প্রতিপালনক্ষমতা অপেক্ষা জনসংখ্যা ন্যূন হইলে আহার্য্য বস্তু অপেক্ষাকৃত অনায়াসলভ্য হয়। তাহার ফলে জনগণ অলস এবং উদ্ভাবনী শক্তিহীন হইয়া উঠে। সুতরাং দেহ ও মন, উভয়ই কালক্রমে দুর্ব্বল হইয়া যায়। কিন্তু জনসংখ্যা ইচ্ছানুরূপ বৃদ্ধি করিবার উপায় কি? উপায় দুই প্রকার। এক প্রকার রুগ্ন, অকৃতি, অল্পায়ু বংশজ ব্যক্তির অপত্যোৎপাদন না করা, অথবা যথাসম্ভব কম করা। দ্বিতীয় প্রকার, সুস্থ, কৃতি, এবং বহ্বপত্য দীর্ঘায়ু বংশজ ব্যক্তির অপত্যোৎপাদন করা। অপত্যের সংখ্যা এবং আয়ুঃ অনেক পরিমাণে বংশানুগত নিয়ম অনুসারে নির্দ্দিষ্ট হয়। কোন বংশে অল্প সংখ্যক অপত্য হওয়াই নিয়ম, কোন বংশে অধিক সংখ্যক হইয়া থাকে। কোন বংশ অল্পায়ুঃ, কোন বংশ দীর্ঘায়ুঃ। কাহারও বংশ-পরম্পরাগত পীড়া আছে, কাহারও নাই। এ সকল দেখিয়া শুনিয়া বিবেচনা পূর্ব্বক বিবাহ-সংস্কার নিষ্পন্ন করা আবশ্যক। কিন্তু বিবাহক্ষেত্র সংকীর্ণ হইয়া গেলে বিবেচনা করিবার স্থল থাকে না। এ নিমিত্ত সুস্থ সবল সচ্চরিত্রগণের পক্ষে, অর্থাৎ যাহাদিগের অপত্যোৎপাদন করা বিধেয়, তাহাদিগের পক্ষে, বিবাহক্ষেত্রের প্রসার অথবা বিস্তৃতি সাধন অত্যন্ত প্রয়োজন। যাহারা রুগ্ন, অবসন্ন, অর্থাৎ যাহাদিগের অপত্যোৎপাদন করা বিধেয় নহে, তাহাদিগের বিবাহ যথাসম্ভব নিষিদ্ধ হওয়া উচিত।

জনসংখ্যা বিবেচনা করিতে আর এক কথা বিবেচ্য। বিভিন্ন জাতীয় নরনারীর সংসর্গে অনেক সময় জনসংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। বাঙ্গালী, মৈথিলী, মহারাষ্ট্রীয় প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় নরনারীর মধ্যে যৌন সম্বন্ধ স্থাপিত

হইলে অপত্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবার আশা করা যায়। কিন্তু তাহারা কোন কোন অংশে উন্নত এবং কোন কোন অংশে অনুন্নত হইতে পারে! এক-জাতীয়গণ, যথা রাঢ়ী, বারেন্দ্র, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদি মধ্যে বিবাহ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলে, বিবাহ-ক্ষেত্রের বিস্তৃতি হওয়ায়, অপত্য সংখ্যা একদিকে যেমন বর্দ্ধিত, অপরদিকে অপত্যগণও পূর্ব্বাপেক্ষা সবল, সুস্থকায় ও উন্নত হইতে পারে। যাহাদিগের ধাতুমধ্যে গুরুতর বৈষম্য, তাহাদিগের সংসর্গে অপত্য অধঃপতিত হওয়া সম্ভব। কিন্তু প্রায় সমধর্ম্মীদিগের সংসর্গে সুফলই আশা করা যায়। ইংরাজ ও বাঙ্গালীর সংসর্গে মেটে ফিরিঙ্গি হইয়াছে; রাঢ়ী, বারেন্দ্র সংসর্গে তদ্রূপ হইবার সম্ভাবনা নাই।

সংখ্যা সম্বন্ধে বলিতে গেলে জনগণের অবস্থার কথাও উল্লেখ করিতে হয়। দরিদ্র অবস্থার ব্যক্তিগণের অপত্য অধিক সংখ্যক হইয়া থাকে; এবং ধনি-গণের অপত্য-সংখ্যা অল্প। অবস্থা অতিরিক্ত মাত্রায় অর্থশালী হওয়া নানা প্রকারেই অমঙ্গলজনক। একথা ব্যক্তির পক্ষেও যেমন, সমাজের পক্ষেও তেমনই প্রকৃত। সমাজে ধনবিভাগ বেশী হইলে, কেহই অতিরিক্ত ধনবান হইতে পারে না। তাহা হইলে অপত্য সংখ্যাও আশানুরূপ হওয়া সম্ভব। বেশী দরিদ্রও নহে এবং অতীব ধনবানও নহে, এইরূপ সমাজে জনসংখ্যা মোটের উপর উন্নত থাকিয়া যায়। তবে, কালক্রমে উহার হ্রাস, বৃদ্ধি, উত্থান পতন হইয়া থাকে। সে দীর্ঘকালের কথায় এস্থলে আমাদিগের বেশী প্রয়োজন নাই।

বিবাহক্ষেত্রের বিস্তৃতির কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। সামাজিক নিয়মের অতিরিক্ত কঠোরতা বিবাহক্ষেত্র সংকীর্ণ করিয়া দেয়। দৃষ্টান্তস্থলে অতিরিক্ত পণ গ্রহণ এবং বিধবা বিবাহ নিষেধের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সকল সামাজিক দুরাচার জনসংখ্যা হ্রাস হওয়ার প্রবল কারণ। কিন্তু ইচ্ছা করিলেই এ সকলের সংস্কার করা যায় না। ইহাদিগের মূল কারণ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে অনুসন্ধান করা আবশ্যক; তৎপর তাহা প্রতিরোধ করিবার নিমিত্ত অন্তবিধ কারণের সমাবেশ করা প্রয়োজন। এতদ্দেশে সমাজ-তত্ত্বের নিয়মানুসারে ঐ সকল দুরাচারের মূলানুসন্ধান করা হয় না, সুতরাং ফলও হয় না। যাহা হউক, জনসংখ্যার দিকে বিশেষ দৃষ্টি না রাখিলে সমাজ কোন মতেই পরিপুষ্ট থাকিতে পারে না। বহুবিধ পীড়া সমাজের জনসংখ্যা হ্রাস করিতেছে। তখন কি কর্ত্তব্য? বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ঐ সকল পীড়ার মূলানু-

সন্ধান করতঃ তাহার প্রতিবিধান করাই একমাত্র উপায়। তাহা না করিলে সমাজ উৎসন্ন হইবেই, কেহই নিবারণ করিতে পারিবে না। কিন্তু কোন কোন সমাজে একটী অবৈতনিক মন্ত্রীত্ব পাইবার নিমিত্ত যেরূপ চেষ্টা ও আগ্রহ দেখা যায়, এ সকলের দিকে তাহার শতাংশও দেখা যায় না। ইহারই নাম দেশবৎসলতা! যাঁহারা বলিবেন, ঐরূপ মন্ত্রীত্ব পাওয়াও এ সকলের অন্যতর উপায় মাত্র, তাঁহারা আত্ম-বঞ্চিত।

অকাল মৃত্যু ও জনসংখ্যা হ্রাস হইবার আর এক প্রধান কারণ চিরাগত আচার ব্যবহারের পরিবর্ত্তন। ইহাতে প্রাপ্তবয়স্কদিগের অপেক্ষা শিশুদিগের মৃত্যু অধিক হইয়া থাকে। শিশু-মরণাধিক্যের বহু কারণের মধ্যে বাল্যবিবাহ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এতদ্দেশে বাল্যবিবাহিত নরনারীর প্রথম অথবা দ্বিতীয় সন্তান বোধ হয় অনেকেরই শিশুকালেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। শিশুগণই ভবিষ্যৎ বংশ। তাহাদিগের মৃত্যুসংখ্যা অধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে ভবিষ্যৎবংশ উৎসন্ন হইয়া যায়। এই সকল এবং আরও নানাবিধ বিষয় বিবেচনা করতঃ যাহাতে সমাজের জনসংখ্যা হ্রাস না হয়, তদ্রূপভাবে সামাজিক বিধি সকল প্রণীত ও প্রতিপালিত হওয়া উচিত। তাহা না হইলে সমাজ কখনও উন্নত হইতে পারে না, আর উন্নতি বন্ধ হইলেই অবনতির সূত্রপাত হয়, এ কথা বিশেষরূপে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

দেহ।—দেহ সম্বন্ধে প্রথমেই বলিয়া রাখি যে, দেহ গঠন প্রায় সম্পূর্ণ রূপে বংশানুক্রমের নিয়মাধীন। পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেহকে কিছু পরিবর্ত্তিত করিতে পারে, কিন্তু এখন আর বংশানুগত বিধানের হাত হইতে ছাড়াইয়া লইতে পারে না। কোন কালেই পারিয়াছে কিনা, তাহাও বিশেষ সন্দেহজনক। যাহা হউক, দেহ এখন প্রধানতঃ বংশানুগত। দেহের স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ও সবলতা যত্ন চেষ্টা দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে হ্রাস বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, কিন্তু সে অধিক নহে। দেহের বল বিক্রম অকস্মাৎ অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেই পারে না, একথা বলিতেছি না। এখন আর ক্রম-বিবর্ত্তনবাদের পূর্ব্ববৎ আদর নাই। অনেক উচ্চ শ্রেণীর জীববিজ্ঞানবিদ্গণ* বিশ্বাস করেন যে, জীব অকস্মাৎ পূর্ব্ব পুরুষগণ অপেক্ষা সম্পূর্ণ পৃথক ভাবে বিবর্ত্তিত হইতে পারে।† এ কথা সত্য হইলে দুর্ব্বল পিতামাতারও প্রফেসার

* Morgan, De Vries, Thomson etc. etc.

† The current belief assumes that species are slowly changed into new types. In contradistinction to this conception, theory of

গ্রামমূর্ত্তির ন্যায় অকস্মাৎ অতিরিক্ত মাত্রায় সবল পুত্র কন্যা হওয়া অসম্ভব মনে করা যায় না। কিন্তু এরূপ দৃষ্টান্ত অধিক নহে। সচরাচর ও সাধারণতঃ বংশানুক্রমের নিয়মানুসারেই ফলাফল গণনা করিতে হয়। তাহা হইলে, বংশদোষ অথবা বংশগুণ অপরিবর্ত্তিত থাকিলে অপত্যের দোষ গুণও অপরিবর্ত্তিত থাকিয়া যাইবে। অপত্য দুর্ব্বল, অবসন্ন হইতেছে; এরূপ স্থলে সবল ও উন্নত করিবার উপায় কি? উপায় দ্বিবিধ, তাহা পূর্ব্বেই ইঙ্গিত করিয়াছিঃ(১) সুস্থ, সুকৃতি বংশীয়গণের সহিত যৌন সম্বন্ধ স্থাপন। এই নিয়ম বংশ পরম্পরায় প্রতিপালিত হওয়া আবশ্যক; নচেৎ প্রথমতঃ যেরূপ সুফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, অবশেষে তাহা আর স্থির থাকে না। (২) যাঁহারা অসুস্থ, অকৃতি ও সমাজদ্রোহী, তাঁহারা বংশ বৃদ্ধি করিবেন না। এই দুই উপায়ে বংশানুক্রমে শুক্রশোণিতগত অবস্থার বিকাশ ও বর্জ্জন হইয়া স্থায়ী ফলের আশা করা যায়। ফলতঃ বিবাহ বিধান ভিন্ন যখন অপত্যোৎপাদনের আর কোন বৈধ ও হিতকর উপায় নাই, তখন বিবাহবিধি সকলের সংস্কারই একমাত্র ভরসা স্থল। যাহাতে সুস্থ, সচ্চরিত্র, কর্ম্মঠ পুত্র কন্যা লাভ হয়, তদ্রূপ বিধান সকল রচিত ও পালিত হওয়াই চাই। নচেৎ সমাজ রক্ষা হইতে পারে না। কোন সমাজেই ইহা সম্যক্ অনুষ্ঠিত হয় নাই; কোন সমাজ স্থায়ীও হয় নাই। ইহা হইতে কেহ যেন মনে করেন না যে, আমি সমাজকে একটা কলের মত নিয়মাধীনে চালাইতে চাই। মানব সমাজ (অথবা অন্য কোন সমাজই) কলের মত ইচ্ছানুরূপ পরিচালিত করা যায় না। সমাজ-তত্ত্বের নিয়ম সকল দুর্লঙ্ঘ্য। কিন্তু যদি প্রযত্নের কিছুমাত্র ক্ষমতাও অঙ্গীকার করা যায়, তাহা হইলে স্বীকার করিতেই হইবে যে, জীবতত্ত্বের ও সমাজ-তত্ত্বের নিয়মানুসারে না চলিলে কোন সমাজেই ধ্বংসের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইবে না। এতদ্দেশে বর্ত্তমান সময়ে যদি কেবল মাত্র বিবাহ বিধির সংস্কার উদ্দেশ্যে সমাজের অগ্রণিগণ বিবেচনা পূর্ব্বক নিয়ম সকল গঠিত করেন, এবং তাহা প্রতিপালন করেন, তাহা হইলেই সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করা যায়। এ কার্য্য যেমন দুরূহ, কর্ম্মীরও তেমনই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া অত্যাবশ্যক। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে কেবল

mutation assumes that new species and varieties are produced from existing form by sudden leaps.
——Species and Varieties by Hugo De Vries, p VIII.

এই উপায়ে কর্ম্ম বিস্তৃতরূপে অনুষ্ঠিত হইবার আশা করা যায় না। ইহাতে ভাব বিস্তারের বিশেষ সহায়তা হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু বাঞ্ছিত পথে সমাজকে পরিচালিত করিতে হইলে কতিপয় অগ্রণী ব্যক্তির, স্বীয় জীবনে, স্বীয় আচারে, তদ্রূপ পথ অনুসরণ করতঃ অপরকে দৃষ্টান্ত দেখাইয়া দেওয়া আবশ্যক। এই দৃষ্টান্ত আদর্শ রূপে সমাজকে উন্নতির পথে লইয়া যায়।

দেহের স্বাস্থ্য ও উপযোগীতা, দুই-ই থাকা চাই। কেবল সুস্থ হইলে হইবে না, সমাজের আবশ্যকীয় কর্ম্মের উপযোগী হওয়া চাই। কর্ম্ম যদিও মন হইতেই আরম্ভ এবং মন হইতেই নিষ্পন্ন হয়, দেহের বড় বেশী অপেক্ষা এখন আর আর করে না, ভবিষ্যতেও করিবে না; * তথাপি দেহকে উপেক্ষা করা যায় না। কারণ দেহ সুস্থ না হইলে মন উন্নত ও পবিত্র হইবে না,† সুতরাং কর্ম্মও প্রতিহত হইবে। মনই কর্ম্মের সংকল্প করিবে, দেহ সেই কর্ম্মসাধনের সহায়তা হইবে। সামাজিক চতুর্ব্বিধ কর্ম্মই ‡ হওয়া চাই, আর দেহ ঐ কর্ম্ম করিবার যোগ্য হওয়া আবশ্যক। দেহ বংশগত নিয়মের অধীন; মনও অনেক অংশে তাহাই। কিন্তু বংশ যৌন সম্বন্ধের ফল। সুতরাং দেহ এবং মনকে কর্ম্মসাধনোপযোগী করিতে হইলে যথাযোগ্য বংশের নরনারীদিগকে বিবাহিত করিতে হয়। নতুবা যেমন তেমন করিয়া একটা দায় উদ্ধার করিলে সর্ব্বনাশেরই পথ পরিষ্কার হয় ভিন্ন আর কিছুই লাভ নাই।

এস্থলে এতদ্দেশীয়গণের দেহ বর্ত্তমান সময়ে যে এক বিশেষ পরিবর্ত্তনের অধীন হইতেছে, তাহা উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না। কিছুদিন হইল এতদ্দেশীয় ভদ্রাভদ্র সকল শ্রেণীতেই দেখা যাইতেছে যে, অনেকের মূত্রে চিনির ভাগ কিছু অধিক নির্গত হয়; আর কাহারও বা ফস্‌ফেট, অক্‌ঝ্যালেট কিছু বেশী পড়িতেছে। চিনি অধিক নির্গত হওয়ায় বহুমূত্র এবং ফস্‌ফেট আদি অধিক নির্গত হওয়ায় নানাবিধ শিরোরোগ উৎপন্ন হইতেছে। জনন-

* The future struggles for supremacy will be contested between minds, and muscles will be at a discount.

Nature 9, May 1909 p 36.

† Purity of mind means health of body * * * purity aud health truly go together. Annie Besant A study in consciousness, p 435.

‡ (১) অধ্যয়ন, অধ্যাপন (২) দেশরক্ষা (৩) কৃষি বাণিজ্য (৪) সেবা।

হীনতাও এসকল হইতে জাত হইতে পারে। সম্ভবতঃ এ সকল ম্যালেরিয়ারই গৌণ পরিণাম, অথবা অনাহার ও দুশ্চিন্তার ফল। যাহা হউক, এ সমুদয় বস্তু দেহের বিশেষ আবশ্যক; উহারা অতিরিক্ত মাত্রায় পরিত্যক্ত হইলে দেহ নিশ্চয় ভাঙ্গিয়া যাইবে। এ সকল প্রতিরোধ করিবার ব্যবস্থা সমাজের মধ্য হইতেই হওয়া চাই। আমরা তাহার কি করিতেছি! কেবল বর্ষে বর্ষে ১১।১২ লক্ষ লোক মরিয়া যাইতেছি; আর কোটী কোটী লোক আধমরা হইয়া কেঁকাইতেছি।

দেহের প্রতি সমাজের বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়। ব্যক্তিগত ব্যায়াম, পরিবারগত উৎসব, জাতীয় ক্রীড়া ও অঙ্গচালন-ব্যবস্থা—এ সকল অবশ্য থাকা চাই। এই সকল উপলক্ষে যেমন দেহ পুষ্ট, তেমনই মনও প্রফুল্ল হয়। মন প্রফুল্ল না হইলে দেহ সুস্থ থাকিতেই পারে না। দেহ দৃঢ়, নীরোগ, শ্রমসহিষ্ণু ও কষ্টসহিষ্ণু হওয়া আবশ্যক। সমাজের সকলেরই এইরূপ হওয়া সম্ভবপর নহে। কিন্তু কোন শ্রেণীর জনগণের দেহ এইরূপ না হইলে সে সমাজ উন্নত হইতে পারে না। দেহ সুগঠিত, পুষ্ট ও কর্ম্মক্ষম করিতে বিবাহ সংস্কার একটু বিবেচনামত করিলেই কালে অনেক ফললাভ করা যাইতে পারে। অনাহার ও পীড়ার কথা পৃথক। কিন্তু যে সমাজ দুর্ব্বল ও পতিত হইয়া গিয়াছে, সেই সমাজস্থ জনগণের পক্ষে সময় সময় প্রায় সমভাবাপন্ন অন্য সমাজের সহিত যৌন সম্বন্ধ স্থাপন করা অত্যাবশ্যক, কারণ তাহাতে নবীন পরিবর্ত্তনের সূচনা হইয়া দেহ ও মনে শুভফল উৎপন্ন হইবার আশা করা যায়। *

কিন্তু কি ব্যক্তিগত কি সামাজিক, উভয় দিক হইতে মনকেই সর্ব্বপ্রধান স্বীকার করিতে হয়। মন প্রস্তুত না হইলে কোন কর্ম্মই হয় না। সামাজিক মন কি? তাহা কেমন করিয়া গঠিত হয়?

মন দেহের অনুগত। দেহ বংশানুক্রমের নিয়মানুসারে গঠিত হয়, সুতরাং মনও ঐ নিয়ম পালন করে। মনও অনেকাংশে উত্তরাধিকার সূত্রেই পাওয়া যায়।† কিন্তু এস্থলে কেবল ব্যক্তিগত উত্তরাধিকার দেখিলে হইবে না। সমাজ-

* The establishment of a successful race or stock requires the alternation of periods of inbreeding in which characters are fixed and periods of out-breeding (exogamy) in which by the introduction of fresh blood, new varieties are produced. Thomson's Heridity, p 537.

† There appears no doubt that good and bad physique, the liability to

গত একটা উত্তরাধিকার আছে। সমাজের জ্ঞান, বুদ্ধি ক্রমেই উন্নত হইতেছে; ভাব ক্রমেই পরিবর্ত্তিত ও বিশুদ্ধ হইতেছে। এক পুরুষে যে সকল উন্নতিলাভ করিতেছে, তাহা গ্রন্থাদিতে লিপিবদ্ধ করিয়া যাইতেছে। পরবর্ত্তিগণ তৎপাঠে তাহার অধিকারী হইতেছে। আবার তাহাদিগের চিন্তা ও ভাব তৎপরিবর্ত্তিগণ প্রাপ্ত হইতেছে। এইরূপে সমাজমধ্যে একটা সামাজিক উত্তরাধিকারের সৃষ্টি হইতেছে। ইহাই সমাজকে কালে জ্ঞানোন্নত করে। সমাজের চতুর্ব্বিধ কর্ম্ম পূর্ব্বেই বলিয়াছি। মন ইহার প্রত্যেকটীর উপযোগী হওয়া চাই। এ চতুর্ব্বিধ কর্ম্ম বলিতে চতুর্ব্বিধ কর্ম্মীর নির্দ্দিষ্ট শ্রেণী বিভাগ বলিতেছি না। তদ্রূপ বিভাগ থাকে থাকুক, কিন্তু একশ্রেণী হইতে অন্যশ্রেণীতে উন্নত অবনত হওয়ার বিধান থাকা আবশ্যক। এ কথা পূর্ব্বেও বলিয়াছি। সে যাহা হউক, বংশানুক্রম ছাড়িয়া দিলে মন গঠিত করিবার ব্যক্তিগত উপায় শিক্ষা ও সংসর্গ। এই দুই উপায় সর্ব্বত্রই কৃতকার্য্য অথবা সফলপ্রদ হয়, তাহা নহে; তবে বংশ পরম্পরাগত ভাব ও প্রবণতা, যাহা ব্যক্তির শরীরে প্রচ্ছন্ন থাকে, তাহা জাগাইয়া দিবার এই দুই উপায় ভিন্ন অন্য উপায় নাই। ইহাতে সুফল কুফল দুইই হইতে পারে। বরং অবাধে সকল শ্রেণীকেই সমান শিক্ষা দিলে সুফল অপেক্ষা কুফলই অধিকতর সম্ভব।

সকলে দার্শনিক অথবা বৈজ্ঞানিক, কবি অথবা ঐতিহাসিক হইতে পারে না। কিন্তু শিক্ষা যদি মনকে সংযত, চরিত্রকে উন্নত করিতে পারে, তাহা হইলেই উদ্দেশ্য সফল হইল। এমন দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক, কবি অথবা ঐতিহাসিক আছেন, যাহাদিগের চরিত্র দেখিলে মনে হয় যে, ইহারা অশিক্ষিত অপেক্ষাও অধম। প্রকৃতপক্ষে ইহারা শিক্ষিত না হইলেই সৎপথে অধিক থাকিত, অন্তত এতদূর কুপথে যাইত না। উচ্চশিক্ষা সাধারণের জন্য নহে, চেষ্টা করিলেও সাধারণে তাহা পাইবে না; কেবল লাভের মধ্যে শিক্ষিত বদমায়েস সৃষ্টি হইয়া সমাজকে দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিবে। এতদ্দেশে বর্ত্তমান বর্ষে * ৫৮৯০ টী বালক প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু ২৫৮ জন মাত্র বি-এ এবং ১২৫ জন মাত্র এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। সর্ব্ব দেশেই এইরূপ। ইহার অর্থ কি? উচ্চশিক্ষা সাধারণের জন্য নহে। উচ্চ

---

and the immunity from disease, the moral characters and the mental temperament are inherited in man and with much the same intensity. Pearson—The Scope and importance p. 33

* ১৩১৬।

শ্রেণীর জ্ঞানচর্চা প্রধানতঃ অল্পেরই আয়ত্ত হইবে। কিন্তু যাঁহারা এই গুরু-তর কার্য্যে ব্রতী হইবেন, তাঁহাদিগের আহার্য্য সুলভ এবং জীবন নিরাপদ হয়, তৎপ্রতি একান্ত দৃষ্টিরাখা সমাজের অবশ্য কর্ত্তব্য। উচ্চশ্রেণীর জ্ঞান-চর্চ্চা যে দিক হইতেই কর, ফল একই। সকল পথই শিক্ষার্থীকে শ্রীভগ-বানের পাদমূলে লইয়া উপস্থিত করিবে। জ্ঞান অর্থই ভগবদ্‌জ্ঞান। সকল আলোচনারই সেই একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু সকল আলোচনা সে ভাবে করা সহজ নহে। ইতিহাস, অর্থনীতি প্রভৃতিও উন্নত বিজ্ঞানশাস্ত্র বলিয়া মনে করি। কিন্তু ইহাদিগের আলোচনায় সামাজিক মানবের বিশেষতঃ পর-বশ সমাজের মন সময় সময় লক্ষ্যভ্রষ্ট ও চঞ্চল, বিক্ষিপ্ত ও ক্ষুব্ধ হইতে পারে। তাহা হইলে আর জ্ঞানের সাধনা হইল না। গভীর প্রশান্ত মনে জ্ঞানের আলোচনা হওয়া আবশ্যক। তবে যখন বিবিধ কারণে কোন নির্দ্দিষ্ট সমাজের অস্তিত্বই সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠে, তখন উন্নত জ্ঞানা-লোচনা সফল হইতে পারে কিনা, এমন কি, সামাজিক ভাবে অনুষ্ঠিত হই-তেই পারে কিনা, সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ করিবার কারণ আছে। তখন হয়ত ক্ষোভোৎপাদক শাস্ত্র আলোচনাই প্রশস্ত হইতে পারে। কিন্তু এ সকল বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও এ বিষয়ে কোনই মতভেদ থাকিতে পারে না যে, মানবের প্রধান শিক্ষার বিষয়ই মানব। একথা মণীষিগণ সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালেই প্রচার করিয়াছেন। অন্য সকল শিক্ষাই এই শিক্ষার সহায় মাত্র। কারণ আপনাকে না বুঝিলে মানবের বন্ধ-মুক্তির অন্য উপায় নাই। কিন্তু কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে বা নির্দ্দিষ্ট সমাজে সকলেই এই শিক্ষা, এইজ্ঞান প্রাপ্ত হইতে পারে না। তাই সমাজের কার্য্য পরিচালনা করিতে কর্ম্ম-প্রধান শিক্ষাই অধিকাংশের পক্ষে প্রশস্ত, ভাবময় শিক্ষা অল্পাংশের নিমিত্ত।

কর্ম্ম-প্রধান শিক্ষাও ভাবের উপর নির্ভর করে। কারণ ভাবই কর্ম্মের মূল। কর্ম্ম-প্রধান উন্নত শিক্ষা উচ্চ বিজ্ঞানের অনুগত। বিবিধ শিল্প, যাহা যন্ত্রাদি সাহায্যে অনুষ্ঠিত হয়, তাহা বিজ্ঞানের উপরেই নির্ভর করে। সমাজের আবশ্যকীয় পদার্থ সকল এবং সুখ-বিধায়ক * উপকরণ সকল প্রয়োজনানুরূপ নির্ম্মিত হওয়া চাই। যদি না হইতে পারে, তবে অন্যত্র হইতে পাইবার সুবিধা থাকা চাই। কিন্তু যে সমাজে শিল্প শিক্ষা কেবল নব-প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, সে সমাজে অন্যত্র হইতে দ্রব্যজাত গ্রহণ করা স্বশিল্পের অহিতকর;

* বিলাসের কথা বলিতেছি না। কিন্তু বিলাসোপকরণ সম্পূর্ণ বর্জ্জনীয় নহে।

সুতরাং শিল্প শিক্ষার প্রথম অবস্থায় সমাজ স্বশিল্প অনুসরণ করিবে। তৎপর স্বশিল্প যথাযোগ্য উন্নতি লাভ করিতে সক্ষম হইলে যখন অন্যত্রাগত শিল্পের প্রতিযোগীতা সহ্য করিতে সক্ষম হইবে, তখন ঐ প্রতিযোগীতায় তাহার অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা ক্রমেই হ্রাস হইয়া যাইবে। যেরূপেই হউক, সমাজের আবশ্যকীয় শিল্পজ্ঞান সমাজ মধ্যে থাকা চাই-ই। নচেৎ সর্ব্বদা বিপদাশঙ্কা বর্ত্তমান থাকে। শিল্প-শিক্ষা, কৃষি-শিক্ষা, এতদুভয় দেশ ভেদে বিভিন্ন রূপে অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। যে দেশের মাটী যে প্রকার, যে দেশে জল প্রাপ্তির সম্ভাবনা যেরূপ, তদনুসারে কৃষিকার্য্য না হইলে ফলদায়ক হয় না। কিন্তু এই কার্য্যেও বিশেষ ফল লাভ করিতে হইলে উচ্চ বিজ্ঞান শাস্ত্রের অধিকারী হওয়া আবশ্যক। সম্প্রতি উচ্চ বিজ্ঞান-বলে আমেরিকা দেশে ১০/ বিঘা জমি হইতে বার্ষিক ১২০০৲ টাকা ঊর্দ্ধ উপার্জ্জন হইয়াছে। শিল্প ও কৃষি বর্ত্তমান যুগে আর বিজ্ঞানের সাহায্য ভিন্ন অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। হইলে সমাজের প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে সক্ষম হইবে না। কিন্তু এক দিকে যেমন এ সকলের উন্নতি, অন্য দিকে তেমনিই বাণিজ্য, এতদুভয় একত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই। নচেৎ উৎপন্ন দ্রব্যের ক্রেতা না থাকায় উহা অকর্ম্মণ্য ও ক্ষতিজনক হইবে। বাণিজ্যই কৃষি ও শিল্পের শ্বাস প্রশ্বাস ; উহা না থাকিলে ইহারা সজীব থাকিতে পারে না, অথবা মৃতপ্রায় হইয়া পড়ে। কিন্তু কিছুই অতি-রিক্ত মাত্রায় ভাল নহে। বাণিজ্যও অতিরিক্ত মাত্রায় অনুশীলন করিলে সমাজ ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়। ঐতিহাসিক জানেন, পুরাকালে কত সমাজ বাণিজ্যে অতীব উন্নত হইয়াছিল। অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়েও ফিরিঙ্গি ও দিনামার এবং আরবীয়গণ বাণিজ্যে বিশেষ উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল। কিন্তু তাহাদিগের এখন কিরূপ অধঃপতন হইয়াছে, তাহা সকলেই জানেন। বাণিজ্যে অতিমাত্র ব্যাপৃত হইলে বংশ-হানি হয়। এবং সমাজ অন্য প্রকারে অধঃপতিত হইয়া যায়। সুতরাং সমাজ টিকিতে পারে না।* যাহা হউক, বাণিজ্য ব্যতীতও সমাজের উন্নতির আশা নাই, অথবা অতি অল্প। সুতরাং কর্ম্ম-প্রধান শিক্ষা অধি-কাংশের পক্ষেই প্রশস্ত শিক্ষা হওয়া উচিত। অল্পাংশ ভাবময়, জ্ঞানময় শিক্ষা লাভ করতঃ ঐ অধিকাংশকে পরিচালন করিবেন। তাহা হইলে কৃষি শিল্পের উন্নতিও যেমন হইবে, অভাবের নিত্য সহচর দুরাচার সকলও তেমনিই নিবৃত্ত

* Race Culture p 82.

থাকিতে পারে। নিম্নজীব হইতে পরম্পরাগত দুর্বৃত্তি সকল, যাহা দেহে প্রচ্ছন্ন আছে, তাহা সাধারণ শিক্ষায় যতদূর ব্যক্ত হইয়া পড়ে, কৃষি শিল্পাদি শিক্ষায় ও শ্রমশীল কর্ম্মানুষ্ঠানের মধ্যে তাহা তাদৃশ বিকাশ প্রাপ্ত হইতে পারে না। তাই তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তির ন্যায়, অশিক্ষিতগণ তত অধিক দুরাচারগ্রস্ত হইতে পারে না।

এস্থলে পুঁথিগত শিক্ষার বিষয়ে আর একটী কথা উল্লেখ না করিয়া নীরব থাকিতে পারি না। এই শ্রেণীর শিক্ষা সমাজকে অল্পাধিক পরিমাণে অনির্দ্দিষ্ট পথে যাইতে বাধা দিয়া থাকে। অনির্দ্দিষ্ট, অর্থাৎ যাহার পরিণাম ফল সম্যক জ্ঞাত হওয়া যায় নাই, অথবা সম্যকজ্ঞাত হওয়া অসম্ভব, তদ্রূপ কার্য্যের অনুপযোগী করিয়া তুলে। ইহাতে সন্দেহ, দ্বৈধ এবং ইতস্ততঃ বাড়াইয়া দেয়। তথাকথিত বর্ণমালা-শিক্ষিত ব্যক্তি পরিণাম ভাবিতে কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় অভ্যস্ত হইয়া পড়েন। সুতরাং উদ্যম, অধ্যবসায় ও সৎসাহস হ্রাস হইয়া যায়। ইহাতে আকস্মিক অনুষ্ঠানের সহিত আকস্মিক বিপ্লব নিবৃত্তি হইতে পারে, কিন্তু সমাজ সাহস ও উদ্যম হারাইয়া ক্রমে জড়ত্বের দিকে চলিয়া যায়। মহাত্মা লক্ বলিয়াছেন, "যিনি নিশ্চয় ফল না জানিয়া কোন কর্ম্মে অগ্রসর হইবেন না, তাঁহাকে নিষ্কর্ম্মা হইয়াই বসিয়া থাকিতে হইবে; অবশেষে তিনি জড়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া ধ্বংসের মুখে পতিত হইবেন।" * এই শ্রেণীর লোক পতিত সমাজে যত অধিক থাকিবে, তাহার উন্নতির বিঘ্নও ততই অধিক, ইহাতে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ নাই। সমাজের একটা জীবনীশক্তি চাই; সমাজের শিক্ষাও তদুপযুক্ত হওয়া আবশ্যক। উহা সমাজের কর্ম্মোপযোগী হইবে, নচেৎ কর্ম্ম হয় না। সমাজের কর্ম্ম চতুর্ব্বিধ, তাহা বলিয়াছি। (১) অধ্যয়ন, অধ্যাপন, (২) দেশরক্ষা (৩) কৃষি বাণিজ্য, (৪) সেবা। এই সকল কর্ম্মোপযোগী শিক্ষা না থাকিলে সমাজ টিকিতে পারে না। শিক্ষা ভাবপ্রধান ও কর্ম্মপ্রধান। এতদুভয় শ্রেণীরই উচ্চ শিক্ষা এখন আর বর্ণমালার সাহায্য ব্যতীত সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব। আর, উচ্চ শিক্ষাও সমাজের অতি অল্পাংশ ব্যক্তিরই আয়ত্ব। সুতরাং বর্ণমালার সাহায্যে যে শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্রূপ উচ্চশিক্ষা অল্পসংখ্যক ব্যক্তিগণই অনুসরণ করিবেন। অপরে কর্ম্ম-প্রধান শিক্ষার যে অংশ বর্ণমালার সাহায্য গ্রহণ করে না, তাহারই অনুশীলন করিবেন। অল্পাংশের

* Locke's Human understanding IV. 14 para 1.

নিমিত্ত ভাবময় উচ্চশিক্ষা ; অধিকাংশের সম্বন্ধে কর্ম্মপ্রধান নিম্নশিক্ষা। ইহাই সমাজ শিক্ষার প্রকৃষ্ট বিধান, আর বোধ হয় এতদ্দেশীয় প্রাচীন বিধানও বটে। এ বিধানের অন্যথায় বর্ত্তমান যুগে জগতে যে একটা স্বেচ্ছাচালিত সার্ব্বজনীন শিক্ষা প্রচলিত হইয়াছে, তাহার কু-ফল পাশ্চাত্য প্রদেশেও মনীষিগণ এক্ষণে উপলব্ধি করিতেছেন, কিন্তু সংশোধন করিবার পথ পাইতেছেন না। সাধারণকে শিক্ষা দেওয়া অসাধ্য ; তাহাদিগকে সামাজিক ও ধর্ম্মনৈতিক কতিপয় বিধান সকল প্রতিপালন করিতে শিখাইলেই যথেষ্ট হইল। মনোবৃত্তিতে অনুন্নত বালকগণের কথা বলিতে গিয়া সামাজতত্ত্ববিৎ ডাক্তার রেণ্ট্‌ল বলিতেছেন যে "ইহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে, এ কথা বলিয়া সমাজকে প্রতারিত করা সাধুতার পরিচায়ক নহে।* ফলতঃ সাধারণকে উচ্চশিক্ষা তো দেওয়া যাইতেই পারে না, বর্ণমালার অধীন শিক্ষাও পরবশ দেশে দেওয়া সঙ্গত নহে। ভাবপ্রধান ও কর্ম্মপ্রধান শিক্ষার মধ্যে সমাজের নিত্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা বর্ণমালার সাহায্য ব্যতীতও দেওয়া যাইতে পারে এবং তাহাই প্রকৃষ্ট। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, পুথিগত শিক্ষা সমাজের উদ্যম ও সাহস ভাঙ্গিয়া দেয়। পতিত সমাজে সাধারণে এই শ্রেণীর শিক্ষা প্রচলিত হওয়া অপেক্ষা সাংঘাতিক কর্ম্ম আর কিছুই হইতে পারে না।

যাহা হউক, সমাজের অস্তিত্বই সর্ব্বাগ্রে চিন্তনীয়, উন্নতি পরের কথা। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ কর্ম্মমধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ম্মই সর্ব্বাগ্রগণ্য। এই শ্রেণীর কর্ম্মী না থাকিলে অপর তিন শ্রেণীর কর্ম্ম নির্ব্বিঘ্নে অনুষ্ঠিত ও পরিচালিত হইতে পারে না। যে সমাজে দেশ-রক্ষক নাই, সে সমাজে অন্য সর্ব্ববিধ কর্ম্মই প্রতিহত হইবে, তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। জগতে এমন সময় কখন আসে নাই এবং এমন সময় কখনও আসিবেও না, যখন এক সমাজ নিঃস্বার্থভাবে অন্য সমাজের প্রকৃত উপকার সাধন করিবে। এ নিমিত্ত বিবিধ সমাজের স্বার্থ-সংঘর্ষ অনিবার্য্য। আর এই কারণবশতঃই দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ম্মীও প্রত্যেক সমাজেই অত্যাবশ্যক।

কিন্তু ইহাদিগের কর্ম্মও (অর্থাৎ দেশরক্ষা) এখন আর উচ্চশিক্ষা ব্যতীত সিদ্ধ হইতে পারে না। শুধু দৈহিক শক্তিতে এখন আর দেশরক্ষা হয় না। ইহাতেও

* It is not honest for us to gull the public into believing that these can be really educated. They may be taught to be clean and to recognise some of the moral and social laws.* * * Race Culture p, 51.

বিবিধ-বিজ্ঞান-শাস্ত্রের আশ্রয় লইতে হয়। তাই বলিয়াছি, বর্ত্তমান-যুগের সামাজিক প্রাধান্যের ইতিহাস মানসিক উন্নতির ইতিহাসের সহিত জড়িত। তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মও (অর্থাৎ কৃষি-বাণিজ্য) এক্ষণে বিজ্ঞানশাস্ত্রের উন্নতির উপর নির্ভর করিতেছে, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, দেশরক্ষা ও কৃষি-বাণিজ্য, এই দুই গুরুতর কর্ম্মই উচ্চশিক্ষার উপরে নির্ভর করে। এই নিমিত্তই অধ্যয়ন অধ্যাপনকে সামাজিক চতুর্ব্বিধ কর্ম্মের মধ্যে প্রথম স্থান দেওয়া হইয়াছে। এই কর্ম্ম অল্পসংখ্যক ব্যক্তির; তাঁহারাই সমাজের চালক ও রক্ষক। তাঁহাদিগের শিক্ষা প্রধানতঃ এই কয়েকটী বিষয়ে থাকাই চাই, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, বস্তুতত্ব, ভূ-তত্ব ও জীব-তত্ব।* এই সকল বিষয়ে উচ্চশিক্ষা না থাকিলে কেহই সমাজ পরিচালকের আসন গ্রহণ করিবার যোগ্য হইবেন না। বর্ত্তমান সময়ে এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে।

সমাজের স্বাস্থ্যের কথা আলোচনা করিতে দেশের অবস্থা ও ব্যক্তির অবস্থা উভয়ই বিবেচনা করিতে হয়। সমাজ সুস্থ না থাকিলে কোন কর্ম্মই হইতে পারে না। কিন্তু সমাজকে অনন্তকাল সুস্থ রাখাও দুঃসাধ্য। মানব সমাজেরও বাল্য, যৌবন, জরা দৃষ্ট হইয়া থাকে। জরা নানাবিধ দুরাচার বশতই: আসিয়া উপস্থিত হয়। এ সকলকে প্রতিরোধ করা কঠিন। কিন্তু তথাপিও সামাজিক স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত প্রত্যেক ব্যক্তি লোকতঃ ও ধর্ম্মতঃ দায়ী। সমাজ-ধ্বংসের প্রধান কারণ কারণ পরবশতা। ইহা হইতে মানসিক ও দৈহিক জড়তা আসিয়া উপস্থিত হয়; সুতরাং কর্ম্ম প্রতিহত হয়। আর কর্ম্মের অভাবে সমাজ কখনই টিকিতে পারে না।

লোকস্থিতির এক বিশেষ অন্তরায় পীড়া। দেশব্যাপী পীড়া দমন করিবার চেষ্টা কেবল ব্যক্তিগত হইতে পারে না। উহা দেশব্যাপী রাজশক্তির কর্ম্ম। বঙ্গীয় সমাজে বর্ত্তমান সময়ে বর্ষে বর্ষে বার লক্ষ লোক ম্যালেরিয়া কলেরা ইত্যাদি রোগে জীবন বিসর্জ্জন দিতেছে। ইহা প্রতিরোধ করিবার শক্তি ব্যক্তির আয়ত্ত নহে। যে শক্তি সমাজের সর্ব্বত্র অনুভূত হইতে পারে, অনায়াসে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতে সক্ষম হয়, তাহা ভিন্ন অর্থাৎ রাজশক্তি ভিন্ন,

---

* "We desire to make the chief subject of education both in school and in college a knowledge of nature as set forth in the sciences which are spoken of as physic, chemistry, geology and biology." Ray Lankester, Kingdom of Man p, 52.

এরূপ দেশব্যাপী মহামারী কখনই নিবৃত্ত হইবার নহে।* আর যথোপযুক্ত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান না থাকিলেও এই গুরুতর কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে না। দেশের স্বাস্থ্যোন্নতি কোথায়ও সহজসাধ্য ব্যাপার নহে। তারপর সমাজিক দুরাচার ও দুর্নীতি—এ সকলও অনেক সময়েই রাজশাসন ব্যতীত নিবৃত্ত হওয়া সহজ নহে। অবশ্য ইহা স্বীকার করি যে, জনসাধারণের সহানুভূতি না পাইলে এ সকল বিষয়ে রাজশাসন কিছুই করিতে পারে না। আর রাজশাসন দেশীয় উচ্চ শিক্ষিত জ্ঞানিগণের হস্তে ন্যস্ত না থাকিলে বিশেষ ফলপ্রদ হয় না। এই নিমিত্তই জ্ঞানিগণ সমাজ শাসনোপযোগী স্মৃতিশাস্ত্র রচনা করিবেন; আর দেশ-রক্ষকগণ তদীয় বিধান সকল পরিচালন করিবেন; ইহাই এতদ্দেশীয় প্রাচীন আদর্শ। সমাজের স্বাস্থ্যরক্ষা আর একটী গুরুতর বিষয়ের প্রতি নির্ভর করে। উহা বংশ-পরম্পরাগত পীড়া। এ পীড়া দুশ্চিকিৎস্য। এরূপ স্থলে বিবাহ-বিধির সংকোচ করাই একমাত্র উপায়। বংশ-পরম্পরাগত মারাত্মক পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তির বিবাহ করা অনেক সময়েই অসঙ্গত। কিন্তু তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিবে কে? তাহাদিগের সৎ শিক্ষা এবং রাজবিধি; এই দুই উপায় ভিন্ন অন্য উপায় নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সামাজিক স্বাস্থ্য ও জনসমাজের সৎ-শিক্ষা রাজবিধানের উৎকর্ষের প্রতি নির্ভর করে। ব্যক্তিগত ও সামাজিক দুরাচার, স্থানীয় অস্বাস্থ্য, এ সকল অপেক্ষাও গুরুতর বিষয় জননহীনতা। সমাজ-ধ্বংসের পক্ষে ইহার ন্যায় কারণ আর নাই। আমি জননহীনতা শব্দে জন্ম মৃত্যুর অনুপাতও বোধ করিলাম। জন্ম সংখ্যা অপেক্ষা মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে সে সমাজ টিকিবে কেমন করিয়া? জন্ম সংখ্যার নানা কারণে হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ম্যালেরিয়া প্রভৃতি কতিপয় পীড়া জননশক্তির হানী করে। সুতরাং জন্ম সংখ্যারও হ্রাস করিয়া থাকে। জন্ম সংখ্যা প্রধানতঃ প্রাপ্ত-বয়স্ক দম্পত্তির সংখ্যার উপর নির্ভর করে। এই শ্রেণীর দম্পত্তির দেহ ও মন সুস্থ ও প্রফুল্ল থাকা আবশ্যক। যে সমাজে সুস্থ ও প্রফুল্ল, প্রাপ্ত-বয়স্ক দম্পত্তির সংখ্যা কম, সে সমাজে জন্মের সংখ্যা হ্রাস হইবেই তো। জন্মের সংখ্যা কি বিজ্ঞান বলে বৃদ্ধি করা যায়? বোধ হয়, যায়। জীবতত্ত্বের নিয়ম সকল প্রতিপালন করিলে ইহা একেবারেই অসাধ্য নহে। কিন্তু লোকস্থিতির সহজতর উপায় মৃত্যুর সংখ্যা হ্রাস করা অতীব কঠিন নহে। ব্যক্তিগত আয়ুষ্কাল যদিও অনেকাংশ বংশপরম্পরাগত নিয়মের প্রতি নির্ভর করে, তথাপি

*সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট ইহার চেষ্টা করিতেছেন।

শারীরতত্ত্বের এবং চিকিৎসা শাস্ত্রের নিয়ম সকল সুপ্রতিপালিত হইলে মৃত্যু-সংখ্যা হ্রাস করা অসম্ভব নহে, বরং বিশেষ সম্ভব। কেবল তাহাই নহে, বাল্য বিবাহাদি কতিপয় সামাজিক দুর্নীতি নিবৃত্ত করিলেও মৃত্যুর সংখ্যা হ্রাস হওয়া সম্ভব। ফলতঃ সমাজ-স্থিতির দিকে লক্ষ্য না করিয়া কেবল কাল স্রোতে ভাসিয়া গেলে ধ্বংসের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি নাই। মানব সমাজের সভ্যাবস্থায় অসভ্যাবস্থা অপেক্ষা জন্ম সংখ্যা কমিয়া যাইবেই, কিন্তু জ্ঞানোন্নত সভ্য মানব মৃত্যু-সংখ্যা কমাইতে অবশ্যই সক্ষম হইবে। এই কার্য্য গুরুতর প্রযত্নসাধ্য; আর সে যত্নও কেবল ব্যক্তিগত হইলে চলিবেনা, উহা সমাজব্যাপী শক্তি অর্থাৎ রাজশক্তি কর্তৃক পরিচালিত হওয়া আবশ্যক। যে দিক দিয়াই বিবেচনা করা যাউক, সমাজস্থিতির প্রধান বিঘ্ন রাজশক্তির অভাব, ঔদাসীন্য অথবা বিকৃতাবস্থা। সমাজের সর্ব্বত্র যে ভাব স্পন্দিত হইতেছে, রাজশক্তি তাহারই বাহ্য বিকাশ, আর কিছুই নহে। এই শক্তির ইত্যাকার লক্ষণ থাকিলেই সমাজের স্থায়িত্ব ও উন্নতির আশা করা যায়; নচেৎ সমাজ সহস্র খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িবার আশঙ্কা উপস্থিত হয়। ব্যক্তির যেমন জীবাত্মশক্তি, সমাজের তেমনই রাজ-শক্তি। এই শক্তি সম্রাট নামক নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির হস্তগত হওয়াই যে আবশ্যক, তাহা নহে; কিন্তু এই শক্তি-প্রসূত মঙ্গল বিধান সকল সর্ব্বত্র পালিত হয়, এরূপ ব্যবস্থা থাকিলেই যথেষ্ট হইল। মানবসমাজ কেবল বর্ত্তমান বংশীয় ব্যক্তি সকলের সমষ্টি নহে। পূর্ব্ব পুরুষগণের জ্ঞান ও সভ্যতায় মানব সমাজ সর্ব্বদাই অনুপ্রাণিত। সেই জ্ঞান ও সভ্যতা প্রত্যেক ব্যক্তিকে সামাজিক বৃত্তিতে অলঙ্কৃত করিবে, নতুবা সমাজ রক্ষা হয় না। দেশহিতৈষিতা পৃথক কথা; আমি এস্থলে তাহার কথা বলিতেছি না। নির্দ্দিষ্ট সমাজস্থ ব্যক্তিগণ সেই সমাজের গঠন, চালন, বংশপরম্পরাগত ভাব, সেই সমাজের বিশেষত্ব, অক্ষুণ্ণ অবস্থায় রক্ষা করিবার নিমিত্ত যত্নবান হওয়া চাই। এই সকল বিষয়ের প্রবল ইচ্ছাই সামাজিক বৃত্তি। সমাজের প্রতি শ্রদ্ধাবান ও আসক্ত না হইলে এ বৃত্তির স্ফুরণ হয় না। আত্ম-সমাজকে ঘৃণার চক্ষে দেখিলে সামাজিক বৃত্তি লোপ হয়, তখন আর সমাজকে ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করা কিছুতেই সম্ভব হয় না, ইহা অনায়াসেই বুঝা যাইতে পারে। সামাজিক-বৃত্তি হইতেই সমাজ-নীতি জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ধর্ম্ম নীতির কথা পরে বলিব। সমাজবদ্ধ জীব মাত্রেই সামাজিক নিয়ম প্রতিপালন করে, নচেৎ সমাজ উচ্ছৃঙ্খলতার নামান্তর মাত্র হইয়া উঠে। তখনই ধ্বংসের পথ প্রশস্ত হয়। আর যদ্যপি এই কার্য্যের

সহায়তা করিবার নিমিত্ত মূর্খতা, জড়তা, দুরাচার ও ধর্ম্ম জ্ঞানের শিথিলতা আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে সে সমাজ অচিরেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এ অবস্থা স্থায়ী হইলে সে সমাজ কখনই জীবিত থাকিতে পারে না।

সমাজের চতুর্ব্বিধ কর্ম্ম মধ্যে সেবার কথা এক্ষণে বলা আবশ্যক। কাহার সেবা? কিরূপ সেবা? সেবার অর্থ প্রয়োজন সিদ্ধির সহায়তা করা; যাহাকে সেবা করি, তাহার কোন না কোন প্রয়োজন সিদ্ধির সহায়তা করি। সুতরাং সামাজিক কর্ম্মের চতুর্থ বিভাগ সেবাও সমাজের সেবা, অর্থাৎ সমাজের প্রয়োজন সিদ্ধির সহায়তা করা। অপর ত্রিবিধ কর্ম্ম বিভাগও তাহাই। কিন্তু আমার মনে হয় যে, উহারা যেমন উচ্চ জ্ঞান বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করে, সেবা তদ্রূপ নহে। সেবা অনেকাংশে ভক্তির উপর নির্ভর করে। যিনি অপর তিন কর্ম্মের অধিকারী নহেন, তিনিও এই চতুর্থ কর্ম্মের অধিকারী। সেবা বড়ই মধুর ধর্ম্ম, যিনি প্রকৃতপক্ষে সেবা করিতে জানেন, তিনি ধন্য। সমাজের সেবার ন্যায় উচ্চ ধর্ম্ম বোধ হয় আর নাই। শূদ্রকে নীচ বলিবে কে? মানব জন্মের সফলতা সেবকের যেমন সহজসাধ্য, অধ্যাপক, দেশ-রক্ষক, অথবা ধনোপার্জ্জক, ইহাদিগের কাহারই তেমন নহে। কিন্তু সেবা প্রকৃতপক্ষেই সমাজের সেবা হওয়া চাই; তাহাতেই মানবকে ভক্তিমার্গে উন্নত করতঃ মুক্তির অধিকারী করে। সমস্ত নীতির মূলেই সামাজিকতা; সমাজ-রক্ষাই নীতি শাস্ত্রের উদ্দেশ্য, সুতরাং যিনি সেবাব্রত সুসম্পন্ন করিতে পারিলেন, তাঁহার ন্যায় সমাজের উপকারী আর কে আছে?

এক হিসাবে দেখিতে গেলে, সকল সেবাই সমাজ সেবা। যে স্বার্থপর নিজের সেবা করিতেছে, সেও প্রকারান্তরে সমাজেরই সেবা করে। তবে তাহার কর্ম্ম মধ্যে কিয়দংশ এরূপ হইতে পারে যে, তাহা সমাজের অনিষ্ট-কর। সুতরাং স্বার্থ-সেবা সমাজের মঙ্গলজনক এবং অমঙ্গলজনক, উভয় প্রকারই হইতে পারে। মঙ্গলজনক সেবাকেই প্রকৃত সেবা বলিতেছি। তাহাতেই মানব ভক্তি-পথে অগ্রসর হয় এবং ক্রমে মানব-জন্মের পূর্ণ সফলতা লাভ করে। সফলতা কি? বন্ধমুক্তি। সেবা প্রকৃতই মুক্তিদাতা, কিন্তু ফল-নিরপেক্ষ সেবাই একাগ্র সেবকের প্রধান চিহ্ন। ফল যাহা হয় হউক, সেবাই আমার কর্ম্ম; আমি সেবাই করিব—এই বুদ্ধিতে যিনি সেবায় প্রবৃত্ত হন, তিনিই প্রকৃতি-সেবক। নিষ্ফলতা তাঁহার কর্ম্মকে রোধ করিতে তো পারেই না, বরং কর্ম্মের প্রবর্ত্তকও হইতে পারে। নিষ্ফলতা তাঁহার হৃদয়ে

জড়তা আনিতে পারে না ; আশঙ্কা তাঁহাকে দমিত করিতে সক্ষম হয় না। কারণ তিনি কর্ম্ম করিবেনই। কর্ম্ম করাই সেবকের ধর্ম্ম, সেবাই তাঁহার উদ্দেশ্য, সুতরাং কিছুতেই তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে পারে না, একথা সহজেই বুঝা যায়।

কিন্তু এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, নিষ্ফল কর্ম্মীর পরিণামে একবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব। আমি বলি, কখনই না। এক সমাজ অপর সমাজের সহিত সংশ্রব-শূন্য হইয়া বাস করা যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে ধ্বংস তাহার পরিণাম নহে। সে সমাজ স্বাভাবিক নিয়মানুসারেই ধনে বংশে বাড়িয়া উঠে, তাহার বিপক্ষতা করিবার কেহই নাই ; কেবল একমাত্র প্রকৃতি বিরুদ্ধ হওয়া সম্ভব। কিন্তু জীব মানব-পদে উন্নত হওয়ার পর এবং মানব নামের যোগ্য হওয়ার পর, প্রকৃতির বিপক্ষতায় কখনও ধ্বংস হয়ও নাই, হইতে পারেও না। সে এক দিকে যেমন প্রকৃতির দাস, অন্য দিকে তেমনি প্রকৃতির প্রভু। * * এক অর্থে, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন বিধি মানবের নিকট ব্যর্থ হইয়াছে। যাহা হউক, প্রায় সকল মানব সমাজই অপর সমাজের সহিত সংশ্রব-যুক্ত। সমাজে সমাজে সংঘর্ষ একরূপ অনিবার্য্য। তাহা হইলেও কেবল সংঘর্ষের ফলে ধ্বংস কখনই আসিতে পারে না। কোন সমাজ অপর সমাজকে টিপিয়া মারিতে পারে না। পারে কেবল পরবশতা, যদি তাহার ফলে জননহীনতা আসিয়া উপস্থিত হয়। এ সকল কথা পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং আমার নব-প্রকাশিত "পরবশতা" নামক গ্রন্থে ইহার বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি, তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

সমাজ-সেবার যদি কোন সার্থকতা থাকে তবে তাহার অর্থ ই, এই কুফল নিবারণ করা। যে বনে সিংহ বাস করিতেছে, তথায় মৃগকুল নির্ম্মূল হয় নাই ; যে নদীতে কুম্ভীর বাস করিতেছে, তথায় সফরীকুল বিনষ্ট হয় নাই। কেবল বল প্রয়োগ দ্বারা এক সমাজ অপর সমাজকে নির্ম্মূল করিতে কখনও পারে নাই। আহারের সদ্ভাব ও বংশ বিস্তৃতি, এতদুভয় থাকিলেই জীব টিকিয়া গেল ; সুতরাং সেবার প্রধান লক্ষ্যই এই দুইটী। সেবাব্রতে এই দুইটী লক্ষ্য থাকিবেই।

সমাজের যে চতুর্ব্বিধ কর্ম্মের উল্লেখ করিয়াছি, তাহার প্রত্যেকটীরই চরম উদ্দেশ্য মুক্তি। মুক্তিই মানব জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, সুতরাং ধর্ম্মপথই

* Man is nature's rebel * * her insurgent son, Kingdom of man.

মানবের একমাত্র অবলম্বনীয়। ধর্ম্ম শব্দ আমি প্রচলিত বিস্তৃত অর্থে ব্যবহার করিতেছি। ধর্ম্মহীন সমাজ টিকিতেই পারে না; অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দেশ-রক্ষা, কৃষি, বাণিজ্য এবং সেবা, এ সকলই ধর্ম্ম সাধনের অঙ্গ। সেবাকেও ধর্ম্ম সাধনের অঙ্গরূপেই গ্রহণ করা আবশ্যক। তাহাতে হৃদয়ের বল বৃদ্ধি হয়, কর্ম্মে উৎসাহ হয়, অদম্য তেজে কর্ম্ম সুসম্পন্ন হয়। সেবার প্রবর্ত্তক ভক্তি, তাহা পূর্ব্বেও বলিয়াছি। কিন্তু এস্থলেও জ্ঞান বিজ্ঞানের একেবারেই আবশ্যকতা নাই, এমত নহে! বিজ্ঞান বলে সেবার পথ সহজ করিয়া লওয়া যায়। কষ্টসাধ্য সেবা অনায়াসে এবং কালব্যাপী সেবা অল্প কালেই সিদ্ধ হইতে পারে। সুতরাং সমাজের চতুর্ব্বিধ কর্ম্মেই জ্ঞানের অনুশীলন আবশ্যক হইতেছে। সেবকেরও জ্ঞানানুশীলন কর্ত্তব্য, নতুবা ধর্ম্ম হানি হয়। তাই সমাজ রক্ষার বিঘ্ন উপস্থিত হয়।

সমাজের উৎপত্তি ও পুষ্টি ব্যক্তির সহিত তুলনীয়। ব্যক্তির দেহ ও সমাজের দেহ প্রায় একই নিয়মে পরিচালিত। ব্যক্তির বিভিন্ন দেহাংশ আপন আপন কর্ম্ম সম্পন্ন করিতেছে, কিন্তু সমষ্টি-জীবন-ব্যাপারেরও অনুকূল হইতেছে। সমাজেরও তাহাই হওয়া আবশ্যক। সমাজের প্রত্যেক অংশ আপন কর্ম্ম সম্পন্ন করুক; কিন্তু সমষ্টিতে সমাজ স্থিতির অনুকূল হওয়া চাই। নচেৎ সমাজ রক্ষা হয় না। যে সকল জীব সমাজবদ্ধ হয় নাই, তাহারা কেবল আপনার প্রয়োজনের দিকেই লক্ষ্য রাখে। কিন্তু সমাজবদ্ধ জীবের তদ্রূপ করিলে চলে না। পরস্পরের প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্তই সমাজ। মানব বোধ হয় কোন দিনই সমাজ-শূন্য ছিল না। সমাজ-বন্ধন যতই শ্লথ হউক, মানব বোধ হয় কখনই অপরের প্রয়োজনের দিকে একবারে লক্ষ্যহীন ছিল না। উচ্চ শ্রেণীর বানরগণের ব্যবহার হইতে এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। ক্রমে মানবের প্রয়োজন যত বাড়িতে লাগিল, সমাজবন্ধনও তত দৃঢ় হইতে লাগিল, পরে অসাধারণ বংশ বৃদ্ধি হেতু এবং আহারের অসদ্ভাব বশতঃ মানব ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। তখন বিভিন্ন ভূভাগের বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে পড়িয়া মানব বিভিন্ন জাতিতে পরিণত হইয়া গেল। কালক্রমে প্রত্যেক জাতি মধ্যেও বিভিন্ন সমাজ-বন্ধন প্রবর্ত্তিত হইল। জীবের একটী ক্ষুদ্র বংশরক্ষক কোষ যেমন অপর বংশ-রক্ষক কোষের সহিত মিলিত হইয়া শতধা সহস্রধা বিভক্ত হয় এবং ক্রমে জীব-দেহ গঠিত করে, ঐ জীব দেহ যেমন নানা অংশে বিভক্ত হইয়া নানা কর্ম্ম সম্পন্ন করে, সমাজও তেমনই।

যত দিন দেহ জীবিত থাকে, তত দিন সেই সকল অংশ পরস্পরের সহায়তা করে। আর, দেহ যখন মরিয়া যায়, তখন (পূর্ণ-গঠিত দেহও) পচিয়া যেমন নানা খণ্ডে বিভক্ত হয়, সমাজও তাহাই। সমাজ-দেহ যত দিন সজীব থাকে, তত দিন তাহারও প্রত্যেক অংশই সমাজ-স্থিতির অনুকূল, কিন্তু সমাজ জীবন-শূন্য হইলে এরূপ ভাবে খণ্ড খণ্ড ও বিভক্ত হইয়া যায় যে, কোন অংশ অপর অংশের অনুকূল হয় না। ভিন্ন ভিন্ন অংশের অনুকূলতা রক্ষা হইলেই সমাজের জীবন রক্ষা হইল; নচেৎ সমাজ ধ্বংস-মুখে পতিত হয়। এই অনুকূলতা রক্ষা করাই প্রত্যেক ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য। এ কর্ত্তব্য এড়াইবার উপায় নাই। এই কর্ত্তব্য সাধনের মূল মন্ত্রই, ত্যাগ। ত্যাগেই সমাজের প্রতিষ্ঠা, ত্যাগেই তাহার পুষ্টি, ত্যাগেই তাহার রক্ষা। যে জীব সমাজবদ্ধ নহে, সে আপনার ইচ্ছামত সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতে পারে। কিন্তু সমাজবদ্ধ জীব পরার্থ সাধনের নিমিত্ত সেই স্বাধীনতা অল্পাধিক পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। ইহারই নাম ত্যাগ, ইহারই নাম সংযম। ইহাই সকল ধর্ম্মের মূল, ইহাই সমাজসেবার আদি, মধ্য ও শেষ।

সমাজের উন্নতি ও পুষ্টি সম্বন্ধে দুইটী মত আছে। এক মতে মানব পূর্ণ সভ্যাবস্থায় সৃষ্ট হইয়াছে; অন্যমতে মানবের প্রথমাবস্থা অসভ্যাবস্থা। প্রথম মতকে অবনতিবাদ এবং দ্বিতীয় মতকে উন্নতিবাদ বলা যাইতে পারে। মানব-তত্ত্ব-শাস্ত্রের বর্ত্তমান অবস্থায় অবনতিবাদ স্বীকার করা যায় না। মানব অনুন্নত অবস্থা হইতে কালসহকারে উন্নত হইয়াছে, এই সিদ্ধান্তই এক্ষণে প্রকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়। বিবর্ত্তনবাদ উন্নতিবাদেরই নামান্তর। নিম্ন প্রাণী হইতে বিবর্ত্তিত হইয়া মানবের আবির্ভাব। উহা এক স্থানে অথবা একাধিক স্থানে হইয়া থাকুক, মানব প্রথমতঃ পশুভাবাপন্নই ছিল। অপর পশুর মৃত দেহে তাহার দেহ পোষণ হইত। কখনও বা মৃগয়ালব্ধ জীব-দেহ অপক্ক অবস্থাতেই আহার করিত। এই সময়কে মৃগয়া-যুগ বলা যাইতে পারে। মৃগয়ার নিমিত্ত একাধিক ব্যক্তি মিলিত হইয়া ঐ বর্ব্বর অবস্থাতেও একটা মোটামুটী সমাজ গড়িয়া তুলিয়াছিল। মৃগয়াকালে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা বীরত্ব দেখাইতে পারিতেন, তিনি ঐ সমাজের অধিপতি হইতেন; অন্যেরা তাঁহার অনুগত থাকিত। সে সময়ে ঐরূপ ভিন্ন ভিন্ন সমাজ মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত না হইত, এমত নহে। এই সংঘর্ষের ফলে অনেক সময় উভয় সমাজ একীভূত হইয়া যাইত। তাহাতেও বীরত্ব ও কৌশল অনুসারে আধিপত্য স্থাপিত হইত।

অধিপতি দৈহিক ও মানসিক শক্তির প্রাধান্য বশতঃ স্বীয় প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতেন। কিন্তু তখন মানসিক শক্তি অপেক্ষা সম্ভবতঃ দৈহিক শক্তিরই অধিক প্রয়োজনীয়তা ছিল। সুতরাং ঐ সমাজে তাহারই আদর অধিক হইত। অদ্যাপিও বীরের আদর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সমাজ জ্ঞানোন্নত না হইলে মানসিক শক্তির আদর হয় না। এই যুগে মৃগয়াই দেহ ধারণের উপায় ছিল। কিন্তু এই উপায় অতি অনিশ্চিত। সুতরাং কালক্রমে ভূমি কর্ষণ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করার প্রথা আবিষ্কৃত ও প্রচারিত হইল। এই সময়কে কৃষি-যুগ বলা যাইতে পারে। এই সময়ে মানব সভ্যতায় অপেক্ষাকৃত উন্নত হইয়াছিল। এবং বিভিন্ন সমাজে বংশ বৃদ্ধি হওয়াতে মানব সমাজ বহু শাখায় বিভক্ত হইয়া আপনাপন সুবিধা মত সমাজ পরিচালিত করিয়াছে। এই সময়ে সমাজে অল্পাধিক শান্তি স্থাপিত হইয়াছে; এবং সভ্যতার উন্নতি সহকারে ব্যক্তিগত ও সামাজিক অভাব বৃদ্ধি হইয়াছে। জ্ঞান চর্চ্চাও এই সময়েই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। বিভিন্ন ব্যক্তি মধ্যে ও সমাজ মধ্যে অভাব পূরণার্থ যে বিনিময়-প্রথা প্রচলিত হয়, তাহাতে আর সামাজিক প্রয়োজন সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হয় না। সুতরাং মুদ্রা প্রচলিত হয়। কৃষিজাত দ্রব্যাদি আবশ্যকের অতিরিক্ত পরিমাণ উৎপন্ন হওয়ায় ক্রমে অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়কে বাণিজ্য-যুগ বলা যাইতে পারে। উপরে যেরূপ ত্রিবিধ যুগ-বিভাগ করা হইল, তাহা ক্রমোন্নতিবাদের পরিচয়-সূচক। তাহাতে এরূপ বুঝিতে হইবে না যে, পূর্ব্বোক্ত যুগের অবসান হইবার পর শেষোক্ত যুগ প্রবর্ত্তিত হয়, কারণ পর যুগেও পূর্ব্ব যুগের লক্ষণ বিদ্যমান থাকে। বর্ত্তমান সময়কে বাণিজ্য যুগ বলা যাইতে পারে; কিন্তু এক্ষণেও কৃষি এবং মৃগয়া পূর্ণ ভাবেই চলিতেছে। বাণিজ্য-যুগের ইতিহাস এক দিকে যেমন সভ্যতার পরিচায়ক, অন্য দিকে তেমনি বর্ব্বরতার পরিচায়ক। এ যুগে বিভিন্ন সমাজের সংঘর্ষ প্রধানতঃ বাণিজ্য উপলক্ষেই হইয়া থাকে। অতিরিক্ত বাণিজ্য লিপ্সা সংঘর্ষ-জনিত লোকক্ষয় করিতেছে; আর বাণিজ্যে অতিমাত্রায় লিপ্ত হইলে যে সামাজিক চঞ্চলতা উপস্থিত হয়, তাহাতে জননহীনতা উৎপন্ন করে। এই হেতু সমাজ ধ্বংস-মুখে পতিত হয়। অতিরিক্ত বাণিজ্যে ধর্ম্মহীনতাও আনয়ন করে, সুতরাং সমাজ টিকিতে পারে না।

চতুর্থ অধ্যায়।

সমাজের যে চতুর্ব্বিধ কর্ম্মের আলোচনা করিলাম, উহাই এতদ্দেশীয় জাতিভেদের মূল। সকল দেশেই এইরূপ কর্ম্মভেদ আছে, কিন্তু এতদ্দেশে তাহা নানা কারণে এক বিশেষ আকার ধারণ করিয়াছিল। তাহাতে সমাজের অশেষ মঙ্গল হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান সময়েও জাতিভেদ অনেক শুভফল উৎপাদন করিতেছে। কিন্তু আমার বিবেচনায় ইহার প্রধান অপকারিতা দুইটী;—(১) বিবাহ-ক্ষেত্র সঙ্কুচিত করা; (২) পান ভোজনে স্পর্শ-দোষ সৃজন করা। যিনি প্রকৃত ব্রাহ্মণ, আধ্যাত্মিক উন্নতি-পথের প্রকৃত পথিক, তাঁহার সম্বন্ধে ঐ দুইটীর সঙ্কোচ প্রয়োজনীয় হইতে পারে; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু সমাজ যে ভাবে গঠিত হইয়াছে, তাহাতে ঐ সঙ্কোচ দুইটী উন্নতি পথের বিঘ্ন হইয়া উঠিয়াছে, এবং বোধ হয় প্রথমটী জাতীয় বিলোপের কারণও হইতে পারে। বিবাহ ক্ষেত্রের সঙ্কোচ—অতীব গুরুতর বিষয়; ইহাতে এক রক্ত পুনঃ পুনঃ মিশ্রিত হইয়া জাতীয় ধ্বংস উৎপন্ন করিয়া থাকে। যাহা হউক, ইহার অনুকূলে ও প্রতিকুলে অনেক বিবেচ্য বিষয় আছে। তাহা যথাসময়ে পশ্চাৎ আলোচিত হইবে।

এক্ষণে, কর্ম্মালোচনার পর, সমাজের উন্নতি-অবনতি আলোচনা করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে; কারণ কর্ম্মই সমাজকে উন্নতির অথবা অবনতির পথে লইয়া যায়। উন্নতি কি? সমাজ কিরূপ অবস্থায় উপনীত হইলে উন্নত বলা যায়? সমাজস্থ ব্যক্তিগণ ধনে বংশে বাড়িলেই যে উন্নত হইল, তাহা নহে। অধিক ধনবৃদ্ধি অবনতির পথেও সমাজকে লইয়া যাইতে পারে। আর অতিরিক্ত বংশবৃদ্ধি দরিদ্র সমাজের পরিচায়ক। ইংলণ্ডাদি দেশ অপেক্ষা এতদ্দেশে বংশ-বৃদ্ধির পরিমাণ দ্বিগুণেরও অধিক। অতিরিক্ত বংশবৃদ্ধি দারিদ্র্যের লক্ষণ। সমাজস্থ জনগণের সংখ্যা আহার সংস্থানের অপেক্ষা কিছু অধিক হওয়া উন্নতির একটী প্রধান কারণ। যাহা হউক, প্রকৃত উন্নতি বলিতে যাহা বুঝা যায়, তাহা এ সকল নহে। মহাত্মা ডারুইন্ বলেন, সামাজিক উন্নতি তিনটী বিষয়ের উপর নির্ভর করে;—(১) মোট জন সংখ্যা; (২) মানসিক অবস্থা, অর্থাৎ জন-গণের বুদ্ধিমত্তা ও নৈতিক ভাব; (৩) তাহাদিগের উৎকর্ষ।* উৎকর্ষ

* We can only say that it (progress) depends on an increase in the

শব্দে আমি চরিত্র-বল ও ধর্ম্মবল বুঝি। ডারুইন্ দৈহিক অবস্থা অপেক্ষা মানসিক অবস্থার উপরেই দৃষ্টি অধিকতররূপে আকর্ষণ করিয়াছেন। জাতীয় উন্নতি মনের উপরই অধিক নির্ভর করে। সমাজের সকলেই মানসিক উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হয় না, সত্য। কিন্তু কতিপয় ব্যক্তির মন সমধিক উন্নত, অর্থাৎ সামাজিক ভাবে জাগ্রত না হইলে, সামাজিক উন্নতি অসম্ভব। বর্ত্তমান যুগে এবং ভবিষ্যতে বিভিন্ন সমাজের সংঘর্ষে কোন্ সমাজ জয়ী হইবে, তাহা মানসিক অবস্থার উপরই অধিক নির্ভর করে। † চরিত্রবল, নীতিবল ও ধর্ম্মবল—এ সকলই মানসিক অবস্থা। ডারুইন নৈতিক ভাবকেই সামাজিক উন্নতির কারণ সকল মধ্যে প্রাধান্য দিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু নৈতিক ভাব কোথা হইতে উৎপন্ন হয়? তাঁহার মতে উহা মূলতঃ সামাজিক বৃত্তি হইতে উৎপন্ন হয়। * যাহা সমাজের মঙ্গলজনক, তাহা সুনীতিসম্মত; আর যাহা অমঙ্গলজনক, তাহা দুর্নীতিমূলক। সামাজিক বৃত্তি, অর্থাৎ স্ব-সমাজের মঙ্গলেচ্ছা হইতে যে সকল কর্ম্ম উৎপন্ন হয়, ও যে সকল কর্ম্ম সমাজের মঙ্গল সাধন করে, তাহা সুনীতি-সম্মত। এই মতেরই বিস্তৃতি সাধন করতঃ প্রাচীনকালে মনীষিগণ বলিয়াছিলেন "পুণ্যঞ্চ পরোপকারং পাপঞ্চ পরপীড়নে।" পাপ পুণ্য, ধর্ম্ম অধর্ম্ম, সকলেরই মূল এই স্থানে। সামাজিক বৃত্তি হইতেই নৈতিকভাব জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু সামাজিক বৃত্তি, সমাজস্থ জনগণের মঙ্গল-সাধনেচ্ছা, কর্ম্মে পরিণত করিতে হইলে মনের বল থাকা চাই, স্বার্থত্যাগ করিবার প্রবৃত্তি থাকা চাই, আর চাই সংযম। ডারুইন ইহা বিবর্ত্তনবাদের দিক হইতে যেরূপভাবে বুঝাইয়াছিলেন, তাহা এতদ্দেশীয় প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির পাঠ করা কর্ত্তব্য। তিনি একস্থানে বলিয়াছেন, "No man can

actual number of the population, on the number of men endowed with high intellectual and moral faculties as well as on their standard of excellence. Corporial structure appears to have little influence except so far as vigour of body leads to vigour of mind. Descent of man p. 216.

† The future struggles for supremacy * * will be contests between minds, and muscles will be at a discount.

Nature, 9th May, 1920, p. 36.

* The * * moral sense is aboriginally derived from the social instincts. Descent of Man. p, 182.

practice the virtues necessary for the welfare of his tribe without self-sacrifice, self-command and the power of endurance." *সকল পীড়ন সহাস্যবদনে সহ্য করিবার ক্ষমতা না থাকিলে, সকল স্বার্থ স্ব-সমাজের মঙ্গল সাধনে তৃণবৎ উপেক্ষা করিতে না পারিলে, এবং কায়ঃ, মন ও বাক্য—এই ত্রিবিধ সংযমে বলীয়ান না হইলে, সমাজের মঙ্গল-সাধনের আশা করা যায় না। কিন্তু এ সকল কি সকলেরই হয়? না, তাহা নহে। যিনি শ্রেষ্ঠ, যিনি অগ্রণী, তাঁহারই হয়; অন্যে তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করে। "যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।" বহু হট্টগোলে সামাজিক বিশেষ মঙ্গল হয় বলিয়া সকল স্থলে বিশ্বাস করি না। কিন্তু ডারুইনের প্রদর্শিত তিনটী ভাব কোন ভাগ্যবানের হৃদয়ে উদিত হইলেই যথেষ্ট হয় না; ঐ ভাব পরিপুষ্ট হওয়া আবশ্যক, যেন অন্য বিরোধী ভাবে ঐ ভাব সকলকে আচ্ছন্ন করিতে সমর্থ না হয়। পরিপুষ্ট হইবার প্রধান উপায়, অভ্যাস। যে কর্ম্ম অতি কষ্টসাধ্য, চেষ্টাদ্বারা কোনমতে নিষ্পন্ন করিতে হয়, তাহাও পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করিলে অবশেষে অনায়াসে করা যাইতে পারে। সুতরাং যেরূপেই হউক, সংযম ও সহিষ্ণুতার সহিত তাহা পুনঃ পুনঃ আচরণ করিতেই হইবে; তাহা না করিলে উহা অভ্যস্ত বা অনায়াস-সাধ্য হইবে না। আর অভ্যস্ত না হইলেও উহা কোন কালেই সহজাত বৃত্তির ন্যায় অবশ্য-কর্ত্তব্য হইয়া উঠে না। বাল্য হইতে অনুকূল ভাবে মনকে উত্তেজিত করিতে হয়, তাহা হইলে উহা সহজ বৃত্তির ন্যায় অনুষ্ঠিত হইতে পারে। তখন উহা বুদ্ধির সাহায্য ব্যতীতই হৃদয়-রাজ্য অধিকার করিয়া লয়। ‡ বুদ্ধির ইতস্ততঃ দোদুল্যমান শাসন হইতে মুক্ত হইয়া ভাব অথবা স্মৃতি জাগ্রত হইতে না পারিলে উহার অদম্য তেজ, উন্মাদিনী শক্তি, একাগ্র লক্ষ্য বিকাশ প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হয় না; তাই দ্বৈধ চিন্তায় কর্ম্ম নিষ্ফল হইয়া পড়ে। অতি-বুদ্ধির নিন্দাবাদ চির-প্রচলিত। মন সংকল্প করিবে, /

* Ibid 181.

‡ A belief constantly inculcated during the early years of life while the brain is impressible appears to acquire almost the nature of an instinct and the very essence of an instinct is that it is followed independently of reason.—ibid 187.

বুদ্ধি সদুপায়ে তাহা নিষ্পন্ন করিবে। এ ক্ষেত্রে বুদ্ধি মনের আজ্ঞাবহ হইবে। তবেই কর্ম্মের সফলতা। অত্যুচ্চ নৈতিক ভাব সামাজিক বৃত্তি হইতে জাত, আর সামাজিক বৃত্তি সহজাত বৃত্তির ন্যায় হওয়া চাই। সুতরাং সমাজের মঙ্গল-জনক কর্ম্ম বাল্য হইতে আরম্ভ করা আবশ্যক। নতুবা অন্য পথ নাই। সাময়িক উত্তেজনায় কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে তাহা অচিরকাল মধ্যেই মৃতপ্রায় হইয়া পড়ে। সমাজের চতুর্ব্বিধ কর্ম্মই আবাল্য অনুষ্ঠিত হওয়া অত্যাবশ্যক। নতুবা সমাজের উন্নতি সুদূরপরাহত।

পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে, সামাজিক উন্নতির মূলে—

(১) আহার সংগ্রহ।

(২) জনসংখ্যা।

(৩) জনগণের স্বাস্থ্য।

(৪) এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কথা, জনগণের নীতি-বল ও ধর্ম্ম-বল।

এতদ্দেশীয় সমাজে, বিশেষতঃ হিন্দু সমাজে (১) আহার পূর্ব্বে ছিল, এখন নাই ; (২) জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাত ক্রমে কমিয়া আসিতেছে ; তাহার কারণ জন্মের হার হ্রাস হওয়া * ও মৃত্যুর হার বৃদ্ধি হওয়া। জনসংখ্যার যে পরিমাণ বৃদ্ধি এখনও দেখা যায়,তাহাও উচ্চ শ্রেণীস্থ হিন্দুগণের মধ্যে নহে এবং প্রধানতঃ পূর্ব্ববঙ্গে। হিন্দু মুসলমান উভয় সমাজেই জন্মের হার হ্রাস হইয়াছে। মুসলমান সমাজে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে সত্য ; এবং হিন্দু সমাজ অপেক্ষা অধিকতর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, তাহাও সত্য ; কিন্তু মুসলমান সমাজেও জন্মের হার খর্ব্ব হওয়ায় জনসংখ্যা হ্রাস হইবার আশঙ্কা হইতেছে। যে সমাজেই জনন-হীনতা উপস্থিত হয়, তাহা নিবৃত্ত না হইলে সে সমাজ বিনষ্ট হইবেই। † সুখের এবং আশার বিষয় এই যে, এখনও এতদ্দেশীয়গণের জননশক্তির হীনতা উপস্থিত হয় নাই। আহার, স্বাস্থ্য ও (সর্ব্বোপরি) বিবাহ বন্ধনের উন্নতি না হইলে জনসংখ্যা সম্বন্ধে কোন আশাই করা যায় না ; আর ঐ ত্রিবিধ বিষয়ের উন্নতি সাধিত করিতে পারিলেই সমাজ টিকিয়া গেল এবং উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইল।

---

* The slower rate of growth seems to be due rather to a falling off in the birth rate.—Imperial Gazetteer of India, 1909, Vol p 38.

† The most potent cause of extinction appears to be lessened ferti-

আহার ও স্বাস্থ্যের বিষয় পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। বিবাহ-বন্ধন সম্বন্ধে প্রথম কথা বিবাহক্ষেত্রের বিস্তৃতি, নচেৎ যথাযোগ্য বরকন্যার অভাবে, রুগ্ন, দুর্ব্বল, বংশদোষগ্রস্ত বরকন্যা বিবাহিত হইয়া সমাজকে অধোগতির দিকে লইয়া যায়। এ সম্বন্ধে আর একটী গুরুতর কথা এই যে, অন্তর্বিবাহ ও বহির্ব্বিবাহ—এই দ্বিবিধ বিবাহ পদ্ধতিই সময় সময় অবলম্বিত হওয়া আবশ্যক, নচেৎ সমাজের উন্নতির বিশেষ আশা করা যায় না। † অন্তর্ব্বিবাহ অর্থে এক জাতীয় জনগণ মধ্যেই যৌন সম্বন্ধ স্থাপন; ইহাতে জাতীয় চরিত্রকে স্থায়ীত্ব প্রদান করে। আর বহির্ব্বিবাহ অর্থে বিভিন্ন জাতীয় জনগণের যৌন সম্বন্ধ স্থাপন, ইহাতে সমাজ মধ্যে নবজীবন সঞ্চার করে। প্রাচীন সমাজ মাত্রেরই এইকথা মনোযোগ পূর্ব্বক স্মরণ রাখা উচিত। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ব্যক্তিগত ও সামাজিক উন্নতির প্রধান উপকরণ মানসিক উন্নতি। উচ্চমনা কর্ম্মী, প্রায়ই বংশানুক্রমে জন্মিয়া থাকেন। সুযোগ্য ব্যক্তির বংশে তৃতীয় পুরুষ পর্য্যন্ত সুযোগ্য ব্যক্তি জন্মিবার সম্ভাবনা অধিক। জনসাধারণের মধ্য হইতে যোগ্য অযোগ্য বিচার না করিয়া কোন একজনকে বাছিয়া লইলে, এবং যোগ্য ব্যক্তিগণের পুত্র পৌত্র প্র-পৌত্রদিগের মধ্য হইতে কোন এক জনকে লক্ষ্য করিলে;—এই শেষোক্ত ব্যক্তিই প্রথমোক্ত ব্যক্তি অপেক্ষা যোগ্যতর হইবার অধিক সম্ভব। এ বিষয়ের প্রধান বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতবর গ্যাল্টন এই কথা বিস্তৃতরূপে বুঝাইয়াছেন। যোগ্য মাতাপিতা যদি একটি যোগ্য সন্তান লাভ করেন, তবে তাহা হইতে সমাজ যেরূপ লাভবান হইবে, এরূপ আর কিছুতেই নহে। একজন উদ্যমশীল, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, কর্ত্তব্যপরায়ণ, ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি কোন সমাজে জন্মগ্রহণ করিলে সে সমাজ উন্নত হইবেই। ব্যক্তির গুণ জাতিতে প্রতিফলিত হয়। বংশানুক্রম অনুসারে অনন্যসাধারণ মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডল প্রাপ্ত হইয়া যে মহাপুরুষ তদনুরূপ মনের অধিকারী হন, তিনি একাই দশের অসাধ্য সাধন করতঃ সমাজকে উন্নতি পথে অগ্রসর করাইয়া দেন।* সামাজিক আচার

---

lity and illhealth ......&c...the births have been few and the deaths, numerous. Descent p. 29

† The establishment of a successful race or stock requires the alternation of period of inbreeding in which characters are fixed and periods of outbreeding in which by the introduction of fresh blood, new variation are promoted. Thomson's Heridity p 537.

* The law of the whole animal kingdom is the same as for the individual.—Success in this world depends upon brain Gaskell.

ব্যবহার, অনুষ্ঠান এবং বহুবিধ গুরুতর কর্ম্মও শরীরতত্ত্বের নিয়মাবলীর সহিত সংসৃষ্ট। স্পেন্সার বলিয়াছেন,—

Some of the most important human institutions are intimately connected with those fundamental physiological laws, more specially the laws of reproduction, inheritance and variation." উপযুক্ত দেহ বিধান ব্যতীত উপযুক্ত মনের উদ্ভব হওয়া কঠিন।† তাই মনের উন্নতি বিচার করিতে হইলে, মনের উন্নতি সাধিত করিতে হইলে, জীবতত্ত্বের নিয়ম সকল অবগত হইয়া তদনুসারে বংশানুক্রম চালিত করিতে হয়। তাহাতে যদি সমাজস্থ কোন বংশেও একটী অনন্য-সাধারণ স্নায়ুমণ্ডলযুক্ত সন্তান লাভ হয়, তাহা হইলেই সমাজ প্রচুর লাভবান হইয়া থাকে। উন্নতিপথে গুরুতর সামাজিক বিবর্ত্তন এইরূপেই অধিকতর সম্ভব, এবং চেষ্টাসাধ্য; নচেৎ আকস্মিক ঘটনার ন্যায় হইয়া উঠে। যে সকল মানসিক গুণ থাকিলে সমাজ উন্নত হয়, তাহা উপযুক্ত দেহেরই ফল। দেহ উপযুক্ত পিতামাতা হইতে প্রাপ্ত। সুতরাং বংশানুক্রমের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বিবাহ-বন্ধন অনুষ্ঠিত না হইলে সমাজকে উন্নতির পথে লওয়া সম্ভব হইবে না। প্রাচীন সমাজের জাতীয় স্বভাব একরূপ স্থায়ীত্ব লাভ করে, তাহাকে নবজীবনে অনুপ্রাণিত করিতে হইলে বিবাহ প্রথার পরিবর্ত্তন অবশ্য-কর্ত্তব্য। আন্তর্জাতিক বিবাহের সুফল সকল চিরস্থায়ী নহে; তাই বহির্জাতিক বিবাহ সময় সময় প্রবর্ত্তিত করা আবশ্যক। উহার ফলও চিরস্থায়ী নহে। এ নিমিত্তই পণ্ডিতগণ উভয়বিধ বিবাহ প্রণালী প্রচলন করাই সঙ্গত বোধ করেন। কিন্তু যে সকল জাতিমধ্যে দেহ ও মনের গুরুতর প্রভেদ লক্ষিত হয়, তাহাদিগের বিবাহ বন্ধন অপেক্ষা, অল্প প্রভেদ-বিশিষ্ট অথচ বিভিন্ন জাতীয় জনগণের বিবাহই অধিক ফলপ্রদ। এই বিষয় মনোযোগী না হইলে কোন সমাজই দীর্ঘকাল উন্নত থাকিতে পারে না। এপথ অবলম্বন করিতেই হইবে।

এস্থলে এতদ্দেশীয় একটী দৃষ্টান্ত দিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারি না। বিষয়টী সর্ব্বসম্মত না হইতে পারে, তথাপি উল্লেখ-যোগ্য। বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমান সমাজের কথা আলোচনা করুন। বাঙ্গালী

† The mental condition is often caused by the physical condition, and the sound body is still required upon which to build the sound mind.

Race culture, 14.

জাতি বিদ্যাবুদ্ধি এবং উদ্ভাবনী শক্তিতে ভারতবর্ষের শীর্ষস্থানীয় হইয়াছে কেন? ইহার অন্য যত প্রকার কারণই থাকুক, জীব-বিজ্ঞানানুমোদিত কারণই প্রধান। প্রবাদ আছে বঙ্গের অধিকাংশ ব্রাহ্মণ কায়স্থ জাতির পূর্ব্বপুরুষ নাকি কান্যকুব্জ দেশ হইতে আসিয়াছিলেন। মোটে ৫জন ব্রাহ্মণ ও ৫ জন কায়স্থ আসিয়াছিলেন। একথা স্বীকার না করিলেও অনেক সময়ে অনেক ব্রাহ্মণাদি পশ্চিম দেশ হইতে আসিয়াছিলেন এবং এখনও আসিতেছেন, ইহা স্বীকার করা যায়। দেশ তখন জনশূন্য মরুভূমি ছিল না। এখানেও ব্রাহ্মণাদি ছিলেন। বহু ব্রাহ্মণ শূদ্রাদির সমাজে আসিয়া ঐব্রাহ্মণ ও কায়স্থ কতদিন স্ব স্ব বংশানুক্রম স্থির রাখিতে পারিয়া ছিলেন? তাঁহারা বংশানুক্রমে এতদ্দেশীয় নারীদিগের পাণিগ্রহণ করতঃ অপত্য উৎপাদন করিলে ক্রমে তাঁহাদিগের বংশধারা মিশ্রিত হইয়া পড়িয়াছিল। পূর্ব্বতন বাঙ্গালী রক্তে নূতন রক্তের মিশ্রণ হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান বাঙ্গালী জাতির দেহ, বিশেষতঃ মস্তক পরীক্ষা করিলে এ বিষয় বিশেষ সন্দেহ থাকে না। কাণ্যকুব্জ দেশীয় কতিপয় ব্রাহ্মণ কায়স্থ এবং এতদ্দেশীয় কতিপয় ব্রাহ্মণ কায়স্থের মস্তক পরিমাপ করিয়া যতদূর অবগত হইতে পারিয়াছি,* তাহাতে মোটের উপর বলা যায় যে, কান্যকুব্জীয়গণের মাথা লম্বা, আর বঙ্গীয়গণের মাথা চওড়া। এই কথাই একটু বিস্তৃত ভাবে বলিলে এইরূপে বলিতে হয়, মাথার প্রস্থ ও দৈর্ঘ্যের অনুপাত এতদ্দেশীয়গণের অধিক, আর কান্যকুব্জীয়গণের তদপেক্ষা অল্প। মাথার খুলির পিছন দিকে যে একটী ঢিপি আছে, তথা হইতে ভ্রূযুগলের মধ্যস্থান পর্য্যন্ত দৈর্ঘ্য ধরিলাম; আর এক কর্ণের উপর হইতে অন্য কর্ণের উপর পর্য্যন্ত প্রস্থ ধরিলাম। এখন অনুপাত জানিতে হইলে, প্রস্থকে দৈর্ঘ্য দিয়া ভাগ করিতে হয়, এবং ঐ ভাগ ফলকে একশত দিয়া গুণ করিতে হয়। যথা—

$$\frac{\text{প্রস্থ} \times ১০০}{\text{দৈর্ঘ্য}} = \text{অনুপাত}$$

এইরূপ প্রণালী অবলম্বন করিয়া দেখিয়াছি, কান্যকুব্জীয়গণের গড় অনুপাত ৭২,৭৩; এবং বঙ্গীয়গণের অনুপাত ৭৮, হইতে ৮০; এবং কোন কোন স্থলে তাহারও কিছু অধিক। এ বৈষম্য বংশগত, অর্থাৎ জাতিগত; সম্ভবতঃ জলবায়ু নিবন্ধন নহে। তবেই কান্যকুব্জীয়গণ হইতে বঙ্গীয়গণ কত

* কয়েক মাস হইল আমি ও বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রামপ্রসাদ চন্দ মহাশয় রাজসাহী জেলাতে অনেকের মাথা মাপিয়াছিলাম। উহা রিস্‌লি সাহেবের গবেষণার সহিত প্রায় মিল হইয়াছে।

পৃথক! তাহা হইবেই তো। পূর্ব্বতন পৃথক সমাজের সহিত কান্যকুব্জীয়-গণের সংমিশ্রণের ফল এইরূপই হইবার আশা করা যায়। তারপর, আর একটী কথা;—ঐ পূর্ব্বতন বঙ্গীয় সমাজ কাহারা? উহারা কি কান্যকুব্জীয়-গণের সহিত এক জাতীয়? উহাদিগের দেহবিধান এখন পর্য্যালোচনা করা সহজ নহে; তথাপি বর্ত্তমান সময়ের বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ কায়স্থগণের মুখের আকৃতি ও অস্থি-সংস্থান, বর্ণ এবং মাথার খুলির নানা স্থানের মাপ ও অনুপাত ইত্যাদি পর্য্যালোচনা করিলে দ্রাবিড়ী ও মঙ্গোলীয় জাতির সহিত বিশেষ নৈকট্য দেখা যায়। এ বিষয় এস্থলে বিস্তৃত আলোচনা হইতে পারে না। ইহাও জলবায়ুর ফল হওয়া সম্ভব নহে। এতদ্দেশীয় ইতিহাস ও লোকতত্ত্বের মীমাংসা এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে পারে।

তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে, বঙ্গীয়গণের দেহে দ্রাবিড়ী, মঙ্গোলীয় ও আর্য্য শোণিত মিশ্রিত হইয়াছে। তাই বঙ্গীয়গণকে কিছু বিশেষ ভাবে বহির্জাতীয় সম্বন্ধের ফল মনে করা যায়। উপরে যাহা বলা হইল, তাহাতে প্রতিভা, শক্তি ও মানসিক বলের অন্য কারণ অনুমান করা নিষ্প্রয়োজন। ইহাতে প্রচুররূপে বুঝা যায় যে, এ জাতি ভারতবর্ষে উচ্চস্থান অধিকার করিবেই। এই মিশ্রিত অবস্থা বঙ্গীয়গণের গৌরবজনক ভিন্ন কোন মতেই গৌরবের ক্ষতিকর নহে।

এক্ষণে এতদ্দেশীয় মুসলমান সমাজের কথা ভাবিতে গেলে প্রথমেই মনে উদয় হয় যে, ইহারা কে? ইহারা ত হিন্দুই। যে জাতি দ্রাবিড়ী, মঙ্গোলীয় ও আর্য্যরক্তসম্ভূত, ইহারা ত সেই জাতির নানা বর্ণের মিশ্রণ। তাহার উপরও কোন কোন স্থলে আরবীয়গণের রক্তমিশ্রিত হইয়াছে। ইহাদিগের প্রাধান্যও এই দিকে হইতে দেখিলে দুর্ব্বোধ্য হয় না। ইংলণ্ডীয় জনগণের শিরায় শিরায় কত মিশ্ররক্ত প্রবাহিত হইতেছে, তাহা সকলেই জানেন। মানবসমাজের ইতিহাস ও লোকতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলে উপরের লিখিত মত বহির্বিবাহ যে জাতীয় শক্তি সঞ্চয়ের একটী প্রধান উপায়, ইহা হৃদয়ঙ্গম হওয়া কঠিন হয় না।

যাহা হউক, সমাজের উন্নতির মূল কারণ যে সকল নির্দ্দেশ করিয়াছি, তন্মধ্যে ধর্ম্ম ও নীতির স্থান সর্ব্বোচ্চ। ধর্ম্ম ও নীতি পৃথক্ নহে; ধর্ম্মই সমস্তের মূল। ধর্ম্ম বলিতেই কর্ম্মকে বুঝায়। ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা ও ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা এতদ্দেশে পুরাকাল হইতেই পৃথক ভাবে আলোচিত হইতেছে। পূর্ব্বমীমাংসা

এবং উত্তর মীমাংসা দুই স্বতন্ত্র শাস্ত্র। ধর্ম্মজিজ্ঞাসা জ্ঞানকাণ্ড লইয়া ব্যাপৃত। কিন্তু কর্ম্মে জ্ঞান দৃঢ় হয় এবং জ্ঞানে ধর্ম্ম সুসম্পন্ন হয়। তাই এতদুভয় প্রকৃত পক্ষে পৃথক নহে। শ্রুতি বলেন—

অন্য দেবাহুর্বিদ্যয়াঽন্য দেবাহুরবিদ্যয়া।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে॥
বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ংসহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে॥

জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ের একত্র অনুশীলন আবশ্যক। নতুবা সফলতার আশা নাই। কর্ম্ম-ক্ষেত্র বিশাল; কেবল ব্যক্তিগত কর্ম্ম সমাজের পক্ষে সর্ব্বদা সুফলপ্রদ হয় না; তাই সামাজিক কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হওয়া চাই। যাহাতে সমাজস্থ জনগণের মঙ্গলজনক কর্ম্ম অবাধে সংসাধিত হইতে পারে, তাহাই প্রধান সামাজিক ধর্ম্ম। ইহাতে বিভিন্ন সমাজের সংঘর্ষ হইবে বলিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিলে সামাজিক জড়তা, অবশেষে মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়। যদি তদ্রূপ সংঘর্ষ না হয়, সেত আরও মঙ্গলের কথা,; কিন্তু হইলেও নিবৃত্ত হওয়া ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ। ঐ সংঘর্ষে জয়ী হইতেই হইবে, সমাজের কর্ম্ম আপন আয়ত্বে আনিতেই হইবে; নচেৎ সমাজিক উন্নতির আশা করা বাতুলতার নামান্তর মাত্র; বরং সামাজিক অস্তিত্বও বিনিষ্ট হইতে পারে। সামাজিক কর্ম্মের উপযোগী সামাজিক মন চাই। যেমন ব্যক্তির মন ও দেহ একই, দেহের অবস্থা অনুসারেই মন নিয়মিত হয়, তেমনই সমাজ-দেহ ও সামাজিক মনও একই পদার্থ। সর্ব্ব প্রযত্নে দেহ ও মন গঠিত করিতে হয়। দেহ ও মন গঠিত করিতে বিবাহ প্রথার দিকে দৃষ্টি রাখা, এবং আবাল্য সৎশিক্ষা ও সৎ-সঙ্গ অত্যাবশ্যক। এইরূপে উপযুক্ত ব্যক্তির আবির্ভাব হইলে সমাজ উন্নতির পথে অগ্রসর হইবেই, নচেৎ কেবল শিক্ষা ও সঙ্গ দ্বারা কাহারও সাধ্য নাই যে, উন্নতি-পথে স্থায়ী ফল লাভ করে; ইহা সুনিশ্চিত।*

কিন্তু এইরূপ উপযুক্ত ব্যক্তির আবির্ভাবের প্রত্যাশায় সমাজ কি নিশ্চেষ্ট

---

* ঈশোপনিষৎ ১০ ১১।

*Hygiene, education, social institution may improve the lot of the individual, but they cannot produce any permanent effect on the race ÷ ÷ fitness and unfitness being innate, not acquired characters – Herber Spencer Lecture 1909 p 36.

ভাবে বসিয়া থাকিবে? না, তাহা নহে। উপরে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে, ইহাও সমাজের প্রযত্ন-সাধ্য। বিবাহ বন্ধনের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হয়, আর রাখিতে হয় সমাজের সাধারণ উৎকর্ষের দিকে। গাণ্টন দেখাইয়াছেন যে, সাধারণ যোগ্যতার গড় ধরিলে সমাজের অবস্থা যেরূপ দেখা যায়, বিশেষ ধীশক্তি-সম্পন্ন মহাপুরুষ তাহা অপেক্ষা কিছু অধিকতর যোগ্যতা লাভ করিয়া জন্মগ্রহণ করেন। গাধার সমাজে ঘোড়া হয় না, ঘোড়ার বিবর্ত্তনেও মানুষ হয় না। তাই সমাজস্থ জনসাধারণের উন্নতি বিধানই মহাপুরুষের আবির্ভাবের কারণ। জনসাধারণের উন্নতি হইলেই সে সমাজে অতীব যোগ্য ব্যক্তির শুভাবির্ভাব সম্ভবপর হয়। * ব্যক্তি সমাজ-বৃক্ষেরই ফল। তাই পূর্ব্ব-কথিত দুই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া যত্নবান হইলেই যথা যোগ্য ব্যক্তির আবির্ভাব সম্ভব হইতে পারে। আর তখন হইতেই সমাজও উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে। কিন্তু ঐ উন্নতি সাধন করিতে এবং তাহা স্থির রাখিতে হইলে, যোগ্য ব্যক্তি বংশ পরম্পরায় সমাজে জাত হওয়া চাই। নতুবা কিছুই ফল হয় না। পিতা উন্নতি করায় পারিবারিক অবস্থা ভাল হইল; কিন্তু যোগ্য পুত্র না থাকিলে সে উন্নতি ক'দিন থাকে? অচিরেই পরিবার দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়ে। তদ্রূপ, সমাজ দৈবাৎ কোন মহাপুরুষের আবির্ভাব বশতঃ লাভবান হইলেও, পরবর্ত্তী বংশধরগণ অযোগ্য হইলে সে লাভ দু'দিনও টিকিবে না। তাই, জ্ঞান পূর্ব্বক সমাজের বিধি নিষেধ সকল এরূপভাবে প্রণয়ন করিতে হয় যে, পরবর্ত্তিগণের দৈহিক ও মানসিক অবস্থা মোটামুটী টিকিয়া যায়, বরং ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে। ঐ সকল বিধি নিষেধ অবনতির সহায়ক না হয়, তৎপক্ষে দৃষ্টি রাখিতেই হইবে। বিধি নিষেধের মধ্যে সর্ব্বপ্রধানই হইতেছে, বিবাহ সম্বন্ধীয়। মানুষ যদি দেহে ও মনে পতিত হইয়া গেল, তবে বিধিনিষেধ পরিচালনা করিবে কে? তাই মানুষ বংশপরম্পরায় উন্নত হওয়া আবশ্যক। সুতরাং বিবাহ বিষয়ক বিধিনিষেধ গুলি বিজ্ঞানসম্মত হওয়া উচিত। প্রাচীনকালে অনেক সমাজ অতীব উন্নত হইয়াছিল। কিন্তু সে উন্নতি টিকিল কৈ? পরবর্ত্তিগণ অযোগ্য হওয়ায় সে উন্নতির ভার বহন করিতে পারিল না। মানুষই সমাজের প্রধান সম্পত্তি;

---

* কোন সমাজে ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইলে দয়াময় ভগবান ধর্ম্মরক্ষার্থে অবতীর্ণ হন। এই প্রাচীন মতের সহিত আলোচ্য বৈজ্ঞানিক মতের বিরোধ নাই, উভয়ের একীকরণ হইতে পারে।

এই সম্পত্তিতে হীন হইলে কোন সম্পত্তিই টিকিবে না। সুতরাং যথাযোগ্য মানবই সমাজের প্রধান লক্ষ্য। এই লক্ষ্যপ্রাপ্তির দুইটী মাত্র উপায় আছে। (১) জন্ম; (২) শিক্ষা * সুপুত্র জন্মগুণে ও শিক্ষাগুণে হয়। দেহে ও মনে উপযুক্ত নরনারীর বিবাহসম্বন্ধ-জাত পুত্র, উপযুক্ত শিক্ষা পাইলেই সুপুত্র হয়। কিন্তু শিক্ষাও জন্মের উপরই অনেক অংশে নির্ভর করে। যাহার শিক্ষণীয়তা আছে, সেই শিখিতে পারে। অন্যে পারে না। শিক্ষণীয়তা অর্থে মনের উপযোগীতা। মহাভারত দুই জনেই শুনিয়াছিল, একজন ভাবিল, ধর্ম্মেরই জয় হয়, আর একজন ভাবিল, পঞ্চ পুরুষ সংসর্গেও দোষ নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মন শিক্ষা গ্রহণের উপযোগী না হইলে, শিক্ষার প্রকৃত ফল উৎপন্ন হয় না। কিন্তু মন কি? উহা প্রধানতঃ মস্তিষ্কের এবং স্নায়ুমণ্ডলের অবস্থার উপর নির্ভর করে। ঐ সকলের গঠন ও সংস্থান একরূপ হইলে মন একরূপ হয়। অন্যরূপ হইলে মন অন্যরূপ হয়। † ব্যক্তির মানসিক অবস্থা দেখিয়া "মাথা খারাপ," "মাথা ভাল"—এরূপ বাক্য সকলেই বলিয়া থাকেন। মন দেহের অবস্থার উপর নির্ভর করে, ইহা অস্বীকার করা যায় না। দেহ যখন বংশানুক্রমের নিয়মাধীন, মনও বংশানুগত হইবেইতো। তাই, বংশানুক্রমের নিয়মানুসারে মনকেও উন্নত করা যায়। ইহাই মানবীয় উৎকর্ষ সাধনের, সামাজিক উন্নতি বিধানের প্রধান আশার স্থল। ‡ মানবের দেহ ও মন উন্নত রাখিতেই হইবে। নচেৎ কেবল কলকারখানায় উন্নতি নাই। ডাক্তার সেলিবি অতি সুন্দর ভাষায় বলিয়াছেন—the products of civilization are not mechanisms, but men. মনের উন্নতি যেমন বংশপরম্পরার উপর নির্ভর করে, তেমনই জ্ঞানানুশীলনের উপরও নির্ভর করে। এক পুরুষে যে সকল জ্ঞানের উন্নতি করে, তাহা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হইয়া পর বংশীয়গণকেও শিক্ষা প্রদান করে।

---

* শিক্ষা ব্যক্তিগত উন্নতি করিতে পারে, কিন্তু বংশ পরম্পরায় উন্নতির পক্ষে সুযোগ্য পিতামাতার ঔরসে ও গর্ভে জন্ম ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। Herbert Spencer Lecture 1909 p 36.

† Vide Bastians Brain as an organ of mind.

‡ There can be no question that amongst the promisc of race-culture is the possibility of breeding such things as talent and mental energy. ... ... Parenthood and race culture. p. 290.

ইহাকে এক রকমে শিক্ষা বিষয়ক বংশানুক্রম বলা যায়। এই রূপে যথাযোগ্য দেহ ও মনের অধিকারী পিতা মাতা হইতে যে পুত্র জন্মলাভ করেন, তিনি সৎশিক্ষা ও সৎসঙ্গের ফলে বংশপরম্পরায় সামাজিক উন্নতি স্থির রাখিতে, বরং বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হন। মানুষ গড়িতে না জানিলে কোন সমাজকেই উন্নত রাখা যায় না।

এ স্থলে আর এক কথার পুনরাবৃত্তি করা আবশ্যক। যথাযোগ্য নরনারীর পবিত্র দাম্পত্য সম্বন্ধ স্থাপন যেমন সামাজিক উন্নতির মূল, তেমনই অযোগ্য, দেহে ও মনে অধঃপতিত নরনারীর যৌন সম্বন্ধ নিষেধও এপক্ষে তুল্য আবশ্যক। যাহারা বংশানুক্রমে রোগগ্রস্ত, কিম্বা মদ্যপায়ী অথবা দস্যু তস্কর নরহন্তা প্রভৃতি যাহারা সমাজদ্রোহী, তাহারা পরবংশ গঠন করিলে সে বংশ দেহ ও মনে অবনত হইবেই। পরবর্ত্তিগণকে অধঃপতিত করিবার অধিকার কাহারও নাই। সুতরাং ঐ সকল ব্যক্তিগণের অপত্যোৎপাদন করা নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। এইরূপে সমাজকে অধঃপতনের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া পূর্ব্ব-বর্ণিত উপায়ে ক্রমে উন্নতির পথে লইয়া যাইতে হয়। নচেৎ সামাজিক উন্নতির বিশেষ কোন আশা করা যায় না।

মানুষ নিম্নতর জীবের বিবর্ত্তন-জাত। তথাপিও মনের উন্নতিই তাহার সর্ব্বস্ব। দেহে মানব অনেক ইতর জীব অপেক্ষাও হীন, কেবল মনের উন্নতিই তাহাকে জীবজগতে সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদান করিয়াছে। ইহাই তাহাকে মানবত্ব হইতে আরও উন্নত করিবে। ইহারই বলে সে প্রকৃতির রাজা। তাই মানব সমাজ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে প্রধান কথা এই যে, সমাজের মন উন্নত রাখিতে হইবে। অধঃপতিত দুর্ব্বলমনগণ ক্রমে নিঃশেষ হইয়া যায় যাউক, তাহাতে ক্ষতি নাই। পরবংশ উন্নতমনগণ কর্ত্তৃক গঠিত করিতেই হইবে। এই কথা স্মরণ রাখিতে পারিলে, এবং কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলেই সমাজতত্ত্বের সব কথা শেষ হইয়া গেল।

পঞ্চম অধ্যায়।

সকল সমাজেরই একটা কিছু আদর্শ থাকে। সকল সমাজেই সেই আদর্শের উপর ভিত্তি স্থাপিত হইয়া সমাজ গড়িয়া উঠে। এতদ্দেশীয় হিন্দু সমাজ কিসের উপর প্রতিষ্ঠিত ? কিসের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে এই সমাজকে পতিত অবস্থা হইতে আবার উন্নতির পথে চালিত করা সম্ভব হয় ? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে হিন্দু জাতিটা কি, তাহার প্রকৃতিই বা কি, এ বিষয় জানা আবশ্যক। কারণ তাহার প্রকৃতির অনুরূপ পথে ভিন্ন অন্য পথে তাহাকে কিছুতেই লওয়া সম্ভব নহে। এই বিস্তৃত বিষয় সংক্ষেপে আলোচিত হইতে পারে না। তথাপিও একথা সাহস করিয়া বলা যায় যে, বাঙ্গালী হিন্দু সমাজ এখন যে সকল ব্যক্তি লইয়া গঠিত, তাঁহারা আর্য্য,† দ্রাবিড়ী, মঙ্গোলী, প্রভৃতির বংশধর। কেহ বা আর্য্য-দ্রাবিড়ী, কেহ আর্য্য-মঙ্গোলী, কেহ বা দ্রাবিড়ী-মঙ্গোলী, আবার কেহ বা তিনেরই সংমিশ্রনে জাত। ইহাদিগের শোণিতে মিশ্রিত-রক্ত প্রবাহিত হইতেছে। যাঁহারা জগতে নানাবিধ গৌরবান্বিত সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, ইহারা তাঁহাদিগের বংশধর। ইহাদিগের উপকরণ উজ্জ্বলতম। ইহাদিগের মহত্ত্ব-সূর্য্য কিয়দ্দিবস হইল মেঘাবৃত হইয়াছে মাত্র, অস্তমিত হয় নাই। আর্য্য ও মঙ্গোলীয়, সভ্যতা অসাধারণ উদ্দম ও সৎসাহসের উপরে প্রতিষ্ঠিত। দ্রাবিড়ী সভ্যতাও কর্ম্মক্ষেত্রে অতুল উৎসাহ ও তেজস্বীতার উপর গঠিত। এ সকল ধর্ম্মবল ও চরিত্রবলের পরিচায়ক। এই সিদ্ধান্ত যদি সত্য হয়, তবে ধর্ম্মের উপরই এতদ্দেশীয় হিন্দু সমাজের পুনরায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। কথাটা আর একটু বিস্তৃত ভাবে বলি। আমি অনেকবার মানব সমাজকে ব্যক্তির সহিত তুলনা করিয়াছি। ব্যক্তি অতি ক্ষুদ্র জীবকোষ * হইতে জাত হয়। তখন সর্ব্বপ্রকার শক্তি এই কোষ মধ্যেই নিহিত থাকে, তাহার স্থান বিভাগ কি ক্রিয়া-বিভাগ থাকে না বলিলেই হয়। পরে ক্রমে ক্রমে ভ্রূণ যতই বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হয়, ততই ঐ সকল শক্তি পৃথক পৃথক স্থানগত হয়। তখন পৃথক পৃথক অঙ্গ প্রত্যাঙ্গাদি বিভিন্ন প্রকার ক্রিয়া সম্পন্ন করে। কিন্তু তথাপিও তাহারা মিলিত ভাবে ব্যক্তির সমষ্টি-জীবন ব্যাপারের অনুকূল

† আর্য্য মাত্রেরই মাথা লম্বা নহে। এক শাখার মাথা, চওড়াও আছে।

* যুক্ত কোষ। অর্থাৎ স্ত্রী কোষ ও পুং কোষের মিশ্রণ-জাত যুক্ত কোষ (Zygote)

হয়। ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। তারপর নিম্নতম জীব হইতে উন্নত হইয়া মানব হইল কি প্রকারে? ইহারও ইতিহাস ঠিক ঐ রূপই। নিম্ন জীবগণের প্রথমতঃ অঙ্গ-বিভাগের ও কর্ম্ম-বিভাগের বাহুল্য নাই। ক্রমে জীব যতই উন্নত হইল, ততই অঙ্গ বিভাগের ও কর্ম্ম বিভাগের বাহুল্য হইল। উন্নতির মূল সূত্রই এই। সমাজের সম্বন্ধেও এই নিয়মের ব্যভিচার নাই। সামাজিক উন্নতির পথও ইহাই। প্রাথমিক সমাজে অঙ্গ বিভাগের এবং কর্ম্ম-বিভাগের বাহুল্য নাই। কিন্তু সমাজ যতই উন্নত হইবে, ততই তাহার অঙ্গ বিভাগের ও কর্ম্ম বিভাগের বাহুল্য হইবে। সাধারণতঃ এক অঙ্গ অন্য অঙ্গের কর্ম্ম করিবে না। কিন্তু এক অঙ্গ বিকল হইলে অন্যে যথা-সম্ভব পুষ্ট হইয়া তাহার অভাব পূরণ করিবে। এইরূপ কর্ম্ম বিভাগ সত্বেও সমাজের প্রত্যেক অঙ্গ সমাজের সমষ্টি জীবনের অনুকূল হওয়া চাই। অর্থাৎ সমাজের মোট লক্ষ্যের সহায়ক হওয়া চাই। মোট লক্ষ্য ধর্ম্মনীতিক উন্নতি; সুতরাং সমাজের প্রত্যেক অঙ্গই ধর্ম্মানুশীলনের, উন্নত ধর্ম্ম-ভাবের, উন্নত নৈতিক আদর্শের পরিপোষক হওয়া লওয়া আবশ্যক। এ আদর্শ কেবল এতদ্দেশীয়গণের পক্ষেই সঙ্গত, তাহা নহে। সমগ্র মানবমণ্ডলীরই এই এক আদর্শ। কেবল এতদ্দেশীয়গণের প্রকৃতির অধিকতর অনুরূপ হওয়ায় এই আদর্শ কার্য্যে পরিণত করা ইহাদিগের যেমন সহজসাধ্য, অপরের তদ্রূপ নহে, এইমাত্র প্রভেদ। বলিলাম যে, সমাজের প্রত্যেক অঙ্গই একমাত্র ধর্ম্মনীতিক লক্ষ্যের সহায়ক হইবে; ইহার অর্থ কি? এক কথায় ইহার অর্থ বলিতে হইলে "জীবন সংগ্রামের খর্ব্বতা" এই কথাই বলিতে হয়। জীবন-সংগ্রাম অল্পাধিক সকল জীবেই বিদ্যমান। কখন বা প্রকৃতির সহিত, কখন অপর শ্রেণীস্থ হিংস্র জীবগণের সহিত, কখন বা স্বশ্রেণীস্থ অথবা স্বসমাজের অন্য প্রাণিগণের সহিত, কখনও অতি নিকটবর্ত্তী রক্তসম্বন্ধ বিশিষ্টগণের সহিত। জীবনসংগ্রামে জয়ী না হইলে ইতর জীবগণ আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। ইহার ফলে যোগ্যতমের জয় হয় এবং অযোগ্য নির্ম্মূল হইয়া যায়। মানবে এ নিয়ম এখন আর সম্পূর্ণ কার্য্যকর হইতে পারে না।* মানব এখন সভ্যতায় এতদূর অগ্রসর হইয়াছে যে, সে অযোগ্যের নিধন সহ্য করিতে পারে না। তাহার সাক্ষী অসংখ্য চিকিৎসালয়, আতুরাশ্রম, অন্ধনিবাস, উন্মাদাবাস, মূকবধির বিদ্যালয় প্রভৃতি। মানব অযোগ্যকেও রক্ষা করে, নিধন করেনা। ইহা তাহার

*কিন্তু জড়প্রকৃতির সহিত সংগ্রামের শেষ নাই।

উচ্চপদবীর প্রধান গৌরব, ইহা সে কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইবে না। কেবল এই সকল অযোগ্যকে সে আর বংশবিস্তার করিবার অধিকার দিতে সম্মত নহে। ইহাদিগের দ্বারা পরবংশ গঠিত করিয়া পরিবর্ত্তিগণকে অধঃপতিত করিতে প্রস্তুত নহে। জীবন-সংগ্রামের যাহা ফল, (অর্থাৎ যোগ্যের প্রতিষ্ঠা, অযোগ্যের নিধন) তাহা উন্নত মানব সম্পূর্ণরূপে আর কখনই হইতে দিবে না। তাহা হইলে, জীবন-সংগ্রাম রাখিবে কেন ? কারণ রাখিবে, কার্য্য (অর্থাৎ ফল) পরিত্যাগ করিবে, ইহা কি সম্ভব ? জীবনসংগ্রাম থাকিলে অযোগ্যের নিধন-রূপ ফলও রাখিতে হয়। কিন্তু সেরূপ পশুত্বে সভ্য মানব স্বেচ্ছায় আর ফিরিয়া যাইতে পারিবে না। সুতরাং জীবনসংগ্রামও প্রায় উঠাইয়া দিতে হয়। যাহাতে উত্তরোত্তর জীবনসংগ্রাম পরিত্যক্ত হয়, তাহার উপায় করিতে হয়। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, সমাজে সমাজে সংঘর্ষ হইলে অথবা এক সমাজেই নানা কারণে প্রতিদ্বন্দ্বিতা উৎপন্ন হইলে, জীবনসংগ্রাম নিবৃত্ত হইবে না। সুতরাং এই সংঘর্ষের, এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার মূলে কুঠারাঘাত করিতে হয়। কবি বলিয়াছেন, "আত্মার পশুত্ব লাভ সমর-প্রাঙ্গণে।" ইহা ধর্ম্মযুদ্ধের সম্বন্ধে প্রয়োজ্য নহে সত্য, তথাপি অতিমাত্র জীবনসংগ্রাম মানবত্বের পূর্ণ বিকাশের, সভ্য সমাজের প্রকৃত উন্নতির বিঘ্নকর, সন্দেহ নাই। কিন্তু মানব যে ইতর জীব অপেক্ষা বহুগুণে অধিক বংশ বিস্তার করিতেছে। মানব যে সকল জীব অপেক্ষাই দ্রুতগতি ধরাতল ছাইয়া ফেলিল। আহারের অসদ্ভাব, স্থানের অসদ্ভাব তাহাকে নিত্যই অপরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবৃত্ত করিতেছে; অপরের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইতে উদ্যত করিতেছে; অপরের বাসস্থান আত্ম-ভবনে পরিণত করাইতেছে—এ সমস্যার উপায় কি? ইহার উপায় না হইলে জীবনসংগ্রাম যাইবে কেমন করিয়া? মানবের পশুত্ব অপনোদন হইবে কিসে? ইহার কি উপায় নাই ? উপায় আছে। মানবীয় উন্নতির পথ বন্ধ হয় নাই, বরং অধিকতর উন্মুক্ত হইয়াছে। ইতর জীবের সহিত মানবের প্রভেদ যে স্থানে, জীবন-সংগ্রাম পরিহারের উপায়ও সেই স্থানেই রহিয়াছে। উহাদিগের সহিত মানবের প্রভেদ কোথায়? ধর্ম্মে। তাই ধর্ম্মের উন্নতিই মানবকে জীবন-সংগ্রামের পশুত্ব হইতে মুক্তি প্রদান করিবে। শিক্ষা তাহার সহায়তা করিবে। শিক্ষা বলিতে এস্থলে প্রধানতঃ বিজ্ঞান শিক্ষাকেই লক্ষ্য করিতেছি। আহারের অভাব ও স্থানের অভাবকেই জীবন-সংগ্রামের কারণ

নির্দ্দেশ করিয়াছি। বিজ্ঞান বলে আহারের অভাব অদূর ভবিষ্যতে অল্পা-য়াসে এবং অল্পব্যয়ে পূর্ণ হওয়া সম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। গত রুস জাপান যুদ্ধে জাপানীরা রসদ বিভাগ অনেক কমাইতে সক্ষম হইয়াছিল। কৃষি বিজ্ঞান ও রসায়ন শাস্ত্রের যে পরিমাণ উন্নতি হইয়াছে, এবং ভবিষ্যতে হইবার আশা করা যায়, তাহাতে জীবন ধারণোপযোগী আহার্য্যবস্তু সুলভ হওয়া অতীব সম্ভব। সুতরাং জীবনসংগ্রামের মূল কারণ মানবকে আর দীর্ঘকাল বিধ্বস্ত করিতে পারিবে না, ইহা সাহস করিয়া বলা যায়। তা'রপর স্থানের অভাব। পৃথিবী এখনও মানব কর্ত্তৃক এতদূর পরিপূর্ণ হয় নাই যে, স্থানের প্রকৃত অভাব অনুভূত হইতে পারে। বনভূমি, পর্ব্বত শিখর, দ্বীপমালা এখনও মানবের পদাঙ্ক বহন করিবার নিমিত্ত উৎসাহের সহিত অপেক্ষা করিতেছে। সুতরাং এতদুভয় দিক দিয়া দেখিতে গেলেই মানব সমাজ ভবিষ্যতে জীবনসংগ্রামের হস্ত হইতে অনেকাংশে মুক্তি পাইবার আশা করিতে পারে। এস্থলে জাতিভেদ প্রথার প্রাচীন মূর্ত্তি স্মরণ করা অপ্রাসঙ্গিক নহে।

আমি ব্যক্তির সহিত সমাজের বহুবার তুলনা করিয়াছি। জীবন-সংগ্রাম সম্বন্ধেও সমাজ ব্যক্তির সহিত তুলনীয়। ব্যক্তির অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল পরস্প-রের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে না, তদ্রূপ সমাজ দেহেও বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে জীবন সংগ্রাম না থাকাই আদর্শ। সমাজের প্রত্যেক শ্রেণী অপর শ্রেণীর সহিত সাহানুভূতিতে এক হওয়া চাই। এক্ষেত্রে জীবন-সংগ্রাম অনিষ্টজনক। কিন্তু জীবন-সংগ্রামই মানব সমাজকে উন্নত করিয়াছে। আহার সংগ্রহ এবং আত্মরক্ষার নিমিত্ত মানব সমাজ-বদ্ধ হয়। তাহা হইতেই বিবিধ সদ্‌গুণ জন্ম-লাভ করিয়া মানবকে অলঙ্কৃত করিয়াছে। সমাজ-ধর্ম্মই সকল গুণের মূল, সকল নীতির জনক। সমাজে সমাজে সংঘর্ষ নিবৃত্ত করিবার উপায় নাই। আদিকাল হইতেই এক সমাজের সহিত অপর সমাজের সংঘর্ষ হইতেছে। তাহা হইতেই নির্দ্দিষ্ট সমাজ মধ্যে সামাজিক বন্ধন এবং সামাজিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই ঐক্যই বিবিধ সদ্‌গুণের আধার। সুতরাং জীবন-সংগ্রাম সমাজের পক্ষে আবশ্যকীয়। ইহা না থাকিলে সমাজ ক্রমে জড় ও হীনবল হয়, দেহ ও মনে পতিত হইয়া যায়। তবে জীবন-সংগ্রামকে প্রায় উঠাইয়া দিতে চাই কেন? তাহর কারণ আছে। জীবন-সগ্রাম চাই এবং চাই-ও না। অর্থাৎ স্ব-সমাজ মধ্যে জীবন-সংগ্রাম চাই না, কিন্তু অপর সমা-জের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলে জীবন-সংগ্রাম অত্যাবশ্যকীয়।

স্ব-সমাজে ঐক্য, এবং পর সমাজের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বীতা, ইহাই প্রকৃত সামাজিক বিধি। এইরূপে সমাজ আত্ম প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইলে অপর সমাজের শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিতে পারে। বিশ্ব মানবের সহিত "প্রেমালিঙ্গন" কথাটা শ্রুতিমধুর হইতে পারে, কিন্তু সম্ভবপর বোধ হয় না। হইলেও তাহার প্রথম উপায় স্ব-সমাজকে সু-প্রতিষ্ঠিত করা; অন্য উপায় নাই। অপর সমাজের প্রতিযোগীতা থাকিবেই, সুতরাং জীবন-সংগ্রামের আবশ্যকতা সেই স্থলে। স্ব-সমাজে জীবন সংগ্রাম ক্রমে উঠাইয়া দেওয়া কেবল বলসঞ্চয় পূর্ব্বক অপর সমাজের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিবার নিমিত্তই আবশ্যক, স্ব-সমাজ মধ্যে কলহ করিয়া বলক্ষয় করিবার নিমিত্ত নহে। সমাজের নেতৃবর্গের এই বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য।* কিন্তু মানুষ যতদিন মানুষ থাকিবে, ততদিন, বোধ হয়, স্ব-সমাজেও প্রতিযোগীতা সম্পূর্ণরূপে উঠাইয়া দেওয়া সম্ভব নহে। আর সর্ব্বদা ইষ্টজনকও নহে। তবে ইহা যথাসম্ভব হ্রাস করিয়া দিবার ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজনীয়, নচেৎ কোন সমাজই আভ্যন্তরীণ কলহের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে না। কলহে বলক্ষয় অনিবার্য্য। ইউরোপে ব্যবসা ভেদে জাতিভেদ নাই; স্ব-সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী। তথায় ধনী ও দরিদ্রে, জমিদার ও প্রজায়, মহাজনে ও কুলিতে সর্ব্বদাই লাঠালাঠি হইতেছে ও হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে। সমাজ মধ্যে শান্তি নাই। এ অবস্থা মঙ্গলজনক নহে।

কিন্তু, অনেক সমাজ স্ব-বশ নহে, তাহাদিগেরও কি অপর সমাজের সহিত প্রতিযোগীতার নিমিত্ত প্রস্তুত থাকা আবশ্যক? সমবেত কর্ম্ম প্রায় কিছুই তাহাদের স্ব-হস্তে থাকে না। তাহারা অপরের উপর সেই সকল কর্ম্মভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাইতে পারে। তাহাদিগের প্রতিযোগীতার আবশ্যক কি? যদি আবশ্যক না থাকে, তবে তাহাদিগের চির-নিদ্রাভিভূত হইবার অধিক বিলম্বও নাই। কর্ম্ম মানবের সহজ বৃত্তি, † ইহা স্বায়ত্ত না

* Their duty is to lessen, if not to suspend the internal struggle, that the nation may be strong externally.—National Life By K. Pearson 2nd Edition P. 56.

† One of the most important instincts is ... ... the instinct of workmanship. Lawyers, crimino-logists and philosophers imagine that only want makes man work. This is an erroneous view,—We are instinctively forced to be active in the same way as ants and bees. Loeb's Comparative Physiology of the Brain p. 197.

থাকিলে অধঃপতনের হস্ত হইতে অব্যাহতি নাই। ইহার অভাবে জড়ত্ব আসিবেই।

তবেই দেখা যাইতেছে যে, স্বসমাজ মধ্যে জীবন-সংগ্রাম হ্রাস হওয়া, এবং অপর সমাজের সহিত জীবন-সংগ্রামে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হওয়া, এতদুভয়ই সামাজিক উন্নতির পক্ষে অত্যাবশ্যক। সমাজ শুধু আপনার মধ্যে সুব্যবস্থিত হইলে চলিবে না। যে সকল সমাজ জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কীর্ত্তি স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহারা অপর সমাজের সংশ্রবে আসিয়াই জয়যুক্ত হইয়াছিল, নচেৎ আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হয় নাই। আমি কেবল যুদ্ধ বিগ্রহের কথাই বলিতেছি না। শান্তির রাজ্যেও গৌরব অগৌরব আছে। প্রাচীন ভারত বাণিজ্যে, ধর্ম্মপ্রচারে, জ্ঞান-বিস্তারে, এবং সভ্যতা বিকীরণ করতঃ যে গৌরব লাভ করিয়াছিল, তাহাতে অপর সমাজকে বিধ্বস্ত করিতে হয় নাই; তথাপি আত্ম প্রতিষ্ঠায় জয়যুক্ত হইয়াছিল। যাহা হউক, সমাজের আভ্যন্তরীণ প্রতিযোগীতা হ্রাস হওয়া আবশ্যক। সমাজের বিভিন্ন ভাগ পরস্পরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করে, স্বস্ব কার্য্য শান্ত ভাবে করিয়া যায়; এবং তদ্বারা সমষ্টি সমাজ লাভবান হয়, ইহাই উদ্দেশ্য। কিন্তু তাই বলিয়া গুণীর জয়, এবং নির্গুণের পরাজয়,—এ নিয়মের অন্যথা হইলেও সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যে সমাজে গুণের আদর নাই, যোগ্য অযোগ্য উভয়ই সমান, অথবা যে সমাজে অযোগ্যের আহার সংগ্রহ করিতে কিম্বা বংশ বৃদ্ধি করিতে কোনরূপ কষ্ট হয় না, সুযোগ্যেরও ঐ দুই বিষয়ে বিশেষ কোন সুবিধা হয় না, সে সমাজ অবনত হইয়া যাইবেই। কি রাজবিধি, কি সামাজিক বিধি, উভয়ই এরূপ হওয়া আবশ্যক যে, অকৃতি অপেক্ষা কৃতির, অযোগ্য অপেক্ষা যোগ্যের আদর অধিক হইতে পারে এবং সমাজিক কর্ম্মও তাহা-দিগেরই অধিক আয়ত্ত হয়। নচেৎ মোটের উপর যোগ্যের সংখ্যা কমিয়া যায়। তখনই সমাজ অবনত হইতে থাকে। এ পরিণাম অমঙ্গলজনক।

স্বাস্থ্যে, উপযোগীতায় এবং কর্ম্মে যাহারা যোগ্যতর, বর্ত্তমান অথবা ভবিষ্যৎ সমাজ তাঁহাদিগের দ্বারাই গঠিত হওয়া উচিত। বর্ত্তমান কালীয় সকল নরনারী মিলিত হইয়া পরবংশ গঠিত করে না। কোন দেশে প্রাপ্তবয়স্ক নরনারী সংখ্যার ষষ্ঠাংশ, কোথায় বা পঞ্চমাংশ * মিলিত হইয়া পরবর্ত্তী বংশের অর্দ্ধাংশ গঠিত করে। এই ষষ্ঠাংশ অযোগ্য হইলে, দেহে ও মনে

* এতদ্দেশে এই অনুপাত জানা যায় নাই, অনুসন্ধান হওয়া আবশ্যক।

অবনত হইলে, পরবর্ত্তী বংশও অযোগ্য হইবে, তখন সমাজ কিছুতেই উন্নত থাকিতে পারিবে না। যাঁহারা যোগ্য ও কৃতী, দেহে এবং মনে উন্নত, তাঁহারাই পরবর্ত্তী বংশ গঠিত করিবেন। এ নিমিত্ত প্রত্যেক জাতি মধ্যে যাঁহারা কৃতি, গুণী ও সুস্থ, তাঁহাদিগের নাম ধাম ইত্যাদি গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হইয়া ঘটক-দিগের প্রাচীন পুঁথির ন্যায় রক্ষিত হওয়া উচিত; সাধারণের অবগতির নিমিত্ত সেই সকল গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রচারিত হওয়া উচিত। পরবর্ত্তী বংশ গঠিত করিবার অধিকার ইঁহাদিগেরই অগ্রগণ্য। বিবাহ-ব্যাপারে কন্যাকর্ত্তা অথবা বর-কর্ত্তা ইঁহাদিগকেই সর্ব্বাগ্রে প্রার্থনা করিবেন। এই প্রথা প্রচলন করা বিশেষ কষ্টসাধ্য হয় না। একবার এই দিকে দৃষ্টি ও চেষ্টা আকৃষ্ট হইলে, বহু আয়াস ব্যতীত, অনেক ইষ্ট সাধিত হইতে পারে। অযোগ্যের বংশ বিস্তৃতি নিষেধ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই যোগ্যের বংশ বিস্তৃতির ব্যবস্থা হওয়া কর্ত্তব্য। অযোগ্যের হস্তে সামাজিক কর্ম্মভার ন্যস্ত করা নিষেধ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই যোগ্যের হস্তে কর্ম্মভার অর্পিত হওয়া উচিত। এইরূপে বংশ পরম্পরায় গঠিত হইলে সমাজকে উন্নত রাখা সম্ভবপর হয়, নচেৎ নহে।

পূর্ব্বে দেখিয়াছি, যেমন দেহ-গঠন বংশানুক্রমের নিয়ম সকল অনুসরণ করে, তেমনই ব্যক্তির যোগ্যতাও ঐ নিয়মানুসারেই বংশ পরম্পরায় সংক্রামিত হয়। গ্যাল্‌টন স্বীয় অমর গ্রন্থে ইহা সর্ব্বাগ্রে প্রদর্শন করতঃ অনুপাত স্থির করেন। সম্প্রতি অধ্যাপক কার্ল্‌ পিয়ার্স‌ন্‌ও গণনা দ্বারা বংশানুক্রমের অনু-পাত স্থির করিয়াছেন। যাহাকে স্বভাব বলে, তাহা বড়ই মিশ্র পদার্থ, ইহার অনুসন্ধান করা কঠিন। তথাপিও কোন কোন দোষগুণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পিয়ার্স‌ন্‌ দেখাইয়াছেন যে, পিতা মাতার সহিত পুত্রের প্রায় অর্দ্ধ-পরিমাণ মিল হয়; পিতামহ পিতামহীর সহিত ঐ অর্দ্ধের দুই তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ($\frac{1}{2} \times \frac{2}{3}$) মোটের এক তৃতীয়াংশ; প্রপিতামহ প্রপিতামহীর সহিত ঐ এক তৃতীয়াংশের দুই তৃতীয়াংশে ($\frac{1}{3} \times \frac{2}{3}$) অর্থাৎ পঞ্চমাংশ * মিল হয়। এইরূপে যতই ঊর্দ্ধতন পুরুষে উঠা যাইবে, তাহার দোষগুণ তদনুরূপ কম পরিমাণে সং-ক্রামিত হইবে। অন্ততঃ তিনপুরুষ অথবা পাঁচ পুরুষের দৈহিক ও মানসিক দোষ গুণ বিবেচনা করতঃ বিবাহ কার্য্য নিষ্পন্ন করা উচিত। কারণ ইহা-দিগের স্বভাব ও স্বাস্থ্য অপত্যে বিশেষ পরিমাণে সংক্রামিত হইতে পারে। অনেক স্থলেই দেখা যায় যে, পুত্র মাতৃ স্বভাব এবং কন্যা পিতৃ স্বভাব (এবং

* Pearson's National Life p. 93.

দেহ গঠনও) প্রাপ্ত হয়, কিন্তু এ বিষয় বহু পরীক্ষা ব্যতীত এখনও কিছু বলা যায় না। তবে, উপরে যে অনুপাতের উল্লেখ করা গেল, তাহা কোন নির্দ্দিষ্টক্ষেত্রে সত্য হইবে কিনা, বলা না গেলেও, বহু লোকের গড় ধরিলে অর্থাৎ মোট সমাজের সম্বন্ধে সত্য হইবে, ইহা বলা যাইতে পারে। এ নিমিত্ত সমাজ মধ্যে বিশেষ কোন গুণের বিস্তৃতি দেখিতে ইচ্ছা করিলে, তদ্রূপ গুণ-যুক্ত নরনারীকে যৌন সম্বন্ধে মিলিত করিলে, পরবংশে অন্ততঃ সেই গুণের অর্দ্ধাংশও প্রাপ্ত হইবার আশা করা যায়। তাহা না করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে যে সে নরনারীকে বিবাহ-বন্ধনে বদ্ধ করিলে সমাজ মধ্যে অযোগ্যগণই অধিক পরিমাণে বংশ বিস্তার করিবে, এবং পরবর্ত্তী বংশ সকল ক্রমেই অবনত হইয়া যাইবে। পূর্ব্ব পুরুষগণের গুণরাশি এইরূপে কালক্রমে একেবারেই লোপ হওয়া সম্ভব। প্রায় সকল দেশেই পূর্ব্ববৎ গুণী ব্যক্তি এখন আর দেখা যায় না। কিছু কিছু গুণের বিস্তৃতি হইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু পূর্ব্ব-বর্ত্তিগণের বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য গুণ থাকিলে তাহা যদৃচ্ছ বংশ-বিস্তারের ফলে লোপ পাইবার বিশেষ সম্ভাবনা।

গুণের অনুপাত না ধরিয়া জনসংখ্যার অনুপাত ধরিলে দেখা যায় যে, উন্নত শ্রেণীর ৫ জন গুণী পিতা হইতে যদি ১ জন গুণী পুত্রের উৎপত্তি হয়, তবে অনুন্নত শ্রেণীর ৮০০ জন পিতা হইতে তদ্রূপ একটী গুণী পুত্র পাওয়া যাইতে পারে। * এতদ্দেশীয় ধারণা অনুসারে বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, একটী উত্তম গুণবান পুত্র সদ্‌ব্রাহ্মণ বংশে জন্মিবার সম্ভাবনা যত, তদপেক্ষা হাড়ীদিগের বংশে জন্মিবার সম্ভাবনা অনেক কম। এমন কি, ১৫০। ২০০ গুণ কম হইতে পারে। এতদেশে গুণানুসারে জাতিবিভাগ হইয়াছিল বলিয়া অবগত হওয়া যায়; এই নিমিত্ত জাতির উল্লেখ করতঃ বক্তব্য বিষয় পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিলাম। নচেৎ বৈজ্ঞানিক হিসাবে তদ্রূপ করিবার প্রয়োজন ছিল না। যাহা হউক, সমাজ মধ্যে অকৃতি অযোগ্যের সংখ্যা অধিক হইলে যোগ্য এবং কৃতি ব্যক্তিকে লাভ করা বড়ই কঠিন হইয়া উঠে; এই নিমিত্তই বিচার পূর্ব্বক গুণী ও কৃতি-বংশের সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হওয়া কর্ত্তব্য। বাছিয়া বাছিয়া যোগ্য ব্যক্তির দ্বারা পরবর্ত্তী বংশের অধিকাংশ গঠিত করিতে না জানায় অথবা তাহাতে অক্ষম হওয়ায় অনেক প্রাচীন সমাজ বহু উন্নতি লাভ করিয়াও তাহা রক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই। তার-

* Essays in Eugenics. By Francies Galton p. 18.

গ্রীসগণ বহু জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছিলেন, আজি তাহা কোথায়? রোম বহু শক্তি সঞ্চয় করিয়াছিল, আজি তাহা কোথায়? ফিনিসিয়া বাণিজ্যে বহু বিভূতি লাভ করিয়াছিল, আজি তাহা কোথায়? মানুষ অবনত হইয়া গেলে কোন উন্নতিই স্থায়ী হয় না। এক পুরুষ দীর্ঘকালে যে উন্নতি লাভ করে, অযোগ্য বংশধর একদিনেই তাহা উড়াইয়া দেয়। তাই, সর্ব্বাগ্রে যোগ্য মানুষ লাভ করিবার পথ দেখিতে হয়, বিবাহ বিষয় আলোচনা করিতে হয়, বংশানুক্রমের নিয়ম সকল অনুশীলন করিতে হয়, পারিপার্শ্বিক অবস্থার ফলাফল অবগত হইতে হয়, সুশিক্ষার মূল তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে হয়, মানুষ গড়িবার প্রকৃত উপায় জ্ঞাত হইতে হয়, নচেৎ কিছুতেই কিছু হ ব না। সকলই ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় নিষ্ফল হইবে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রথমেই বলিয়াছি, জীবতত্ত্ব না বুঝিয়া সমাজতত্ত্ব বুঝা যাইতে পারে না। ব্যক্তির প্রথম কথা জন্ম, ইহা বংশানুক্রমের নিয়মাধীন। সমাজের পক্ষেও তাহাই। যে সমাজ যেরূপে উৎপন্ন হইয়াছে, সে সমাজের গতিও সেই দিকেই হইবে। ব্যক্তির দ্বিতীয় কথা বেষ্টনী অথবা পারিপার্শ্বিক অবস্থা। ব্যক্তি যে উপাদান লইয়া জন্মগ্রহণ করে, বেষ্টনী সেই জন্মগত মূলধনকে টানিয়া বাহির করে, অথবা নষ্ট করিয়া দেয়। সমাজেরও তাহাই। সমাজ যে অবস্থার মধ্যে পতিত হয়, তাহার গতিও সেই দিকেই যায়। ব্যক্তির তৃতীয় কথা কর্ম্ম। ইহা তাহার সেই মূলধনকে খাটাইয়া বৃদ্ধি অথবা নষ্ট করে। সমাজেরও তদ্রূপই। সমাজ যেরূপ কর্ম্ম করে, ফলও তদ্রূপই হয়। বংশানুক্রম, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও কর্ম্ম,* এই তিন ব্যক্তির ও সমাজের সম্বল। এই তিনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সমাজ পরিচালনা করা আবশ্যক।

এস্থলে এতদ্দেশীয় সমাজের দৃষ্টান্ত দ্বারা এই কথা পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিব। পূর্ব্বে বলিয়াছি, এতদ্দেশীয় হিন্দুসমাজ দ্রাবিড়ী, মঙ্গোলীয় এবং আর্য্যরক্তে গঠিত। যদি তাহাই হয়, তবে ইহাদিগের জন্মগত ভাব বুঝা যাইতেছে। জগতের এই তিন প্রধান জাতি সম্মিলিত হইয়া যদি এতদ্দেশীয় হিন্দু জাতিকে গঠিত করিয়া থাকে, তবে ইহার গতি ও প্রতিভা ক্ষীণ হইবার নহে। প্রতিকূল বেষ্টনী অথবা কর্ম্মহীনতা বশতঃ কিয়ৎকালের নিমিত্ত ম্লান হইলেও ইহাদিগের উন্নতির আশা আছে। ইহাদিগের জন্মগত সম্বল আছে। নচেৎ এত প্রতিকূল অবস্থাতেও ইহারা অত্যল্পকাল মধ্যে ঈদৃশ প্রতিভার ও উদ্যমের পরিচয় দানে সমর্থ হইত না। ইহাদিগের মূলধন আছে। বেষ্টনী ও কর্ম্ম অনুকূল হইলেই ইহারা উন্নত হইতে পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

যাহা হউক, মানবীয় উন্নতির প্রধান কারণই সমাজিক অবস্থা ও সামাজিক ভাব। সেই চিরাতীত কালে মানব যখন প্রায় পশুবৎ অসভ্য ছিল, তখনও মানব সম্পূর্ণ রূপে সমাজশূন্য ছিল না। সমাজ অতীব নিম্ন প্রাণীদিগের মধ্যেও দেখা যায়। যে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীট অণুবীক্ষণের সাহায্য ব্যতীত দেখাই

---

* Heredity, environment, ও function.

যায় না, তাহারাও সমাজের পূর্ব্বাভাস প্রদর্শন করে। বিভিন্ন জাতীয় কীটাণু এক পাত্রে মিশাইয়া রাখিলে প্রত্যেক জাতীয় কীটাণু সকল পৃথক পৃথক ভাবে অবস্থান করে। একজাতীয়গণ অপর জাতিগণ হইতে পৃথক হয়, এবং উহারা এক পৃথক স্থানে আসিয়া সমবেত হয়।* ইহাকে সমাজিকতা বলি না, ইহা জড়শক্তি বশতঃ হইতে পারে, কিন্তু বোধহয় ইহা সমাজ বন্ধনের মৌলিক অবস্থা। তারপর মৎস্য ও পক্ষী মধ্যে ঠিক সমাজ দৃষ্টি-গোচর না হইলেও উহারা দলে দলে ভ্রমণ করে এবং পরস্পরের প্রতি প্রচুর সহানুভূতি দেখাইয়া থাকে। এক মৎস্যের ডিম্ব অন্য মৎস্যে রক্ষা করে; ছানা গুলিকে সন্তরণ শিক্ষা দেয় ইত্যাদি। পক্ষীরাও একের বিপদে অন্যে কোলাহল করে, তাহাকে উদ্ধার করিতে যত্নবান হয় এবং তাহার শুশ্রুষাও করিয়া থাকে। স্তন্যপায়ীগণ মধ্যে আমাদিগের নিকটবর্ত্তী কোন কোন বানরগণও সমাজবদ্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং মানব যে প্রথম হইতেই সমাজবদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। বুদ্ধির উন্নতিই সমাজের উন্নতির প্রধান কারণ। পিপীলিকা, মধুমক্ষিকা ইত্যাদির মস্তিষ্ক উন্নত। সুতরাং ইহারা সমাজের উপকারীতা অনুভব করিতে বিলক্ষণ সক্ষম হইয়াছিল। মৎস্য. কাক, বানরাদির বুদ্ধি তাদৃশ উন্নত নহে; উহারা সামাজিক বৃত্তি পোষণ করিলেও সমাজ গঠনে উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। যাহা হউক, নিম্নপ্রাণী হইতে বংশানুক্রমে মানব আত্মরক্ষা বৃত্তি, দয়াবৃত্তি, অপত্যপালন বৃত্তি, হিংসা, দ্বেষ, সাহস, বিচার-শক্তি ইত্যাদি যে সকল বিবিধ বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে আত্মরক্ষা, অপত্যরক্ষা, আহার সংস্থান. দাম্পত্য-ভাব ইত্যাদি কারণ বশতঃ সামাজিক উন্নতি হইবেই। ঐ সকল বৃত্তি, বিশেষতঃ আত্মরক্ষা এবং আহারান্বেষণ, এই দুই কারণ বুদ্ধির উন্নতির সহিত মিলিত হইলে সামাজিক উন্নতি সিদ্ধ করিবেই। ফলেও সামাজিক বন্ধন যে সকল বৃত্তির ফল, তাহারা সামাজিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই ক্রমশঃ উন্নত হইয়াছে; এবং বর্ত্তমানকালে সেই সকল উন্নতি মানব নামের প্রধান গৌরব হইয়াছে।

নিম্ন জীব সমাজ-বদ্ধ হইলেও প্রকৃতির দাস। উহারা প্রতিকূল প্রকৃতির সহিত দ্বন্দ্বে জয়ী হইতে হইলে শারীরিক পরিবর্ত্তন ভিন্ন অন্য উপায়ে সমর্থ

*Microbes are capable of discriminating between their own kind and other microbes for they generally live in colonies. Micro-organisms p 120.

হয় না। তাই, উহারা প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের এত অধীন। কিন্তু মানব অতি-অসভ্য অবস্থার পর হইতেই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের দাসত্বশৃঙ্খল মোচন করিতেছে। এখন আর সে কোন মতেই ঐ নিয়মের অধীনতা করিতে সম্মত হইবে না। প্রকৃতি যদি বলেন "তুমি মর", মানব বলে "আমি মরিব না"। * কিন্তু উত্তমের নির্ব্বাচন না হইলে উন্নতিও সুদূরপরাহত হয়। এ নিমিত্ত সামাজিক নির্ব্বাচন দ্বারা প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ন্যায় কর্ম্ম করাইয়া লওয়া আবশ্যক। তাহা অতি সামান্য পরিমাণে হইতেছেও। যখন কন্যাকর্ত্তা কন্যার বিবাহ দিতে এক বর উপেক্ষা করত অন্য বরে কন্যা সম্প্রদান করেন, যখন বরকর্ত্তা এক কন্যা গ্রহণ না করিয়া অপর কন্যা মনোনীত করেন, যখন প্রভু একটা কর্ম্মচারীকে উপেক্ষা করতঃ অপর কর্ম্মচারীকে নিযুক্ত করেন, তখন সামাজিক নির্ব্বাচনই করা হয়। কিন্তু তাহাতে অনেক সময় যোগ্য, অথবা সুস্থ, অথবা কৃতিও উপেক্ষিত হইতেছে; অযোগ্য, অসুস্থ, অথবা অকৃতি গৃহীত হইতেছে। এরূপ নির্ব্বাচন প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ন্যায় সুফল তো দেয়ই না, বরং সমাজের অনিষ্টজনক হইয়া থাকে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যাহারা সুস্থ ও কৃতি, তাহারাই পরপর বংশ গঠিত করিবে। কেবল তাহাই নহে। সামাজিক কর্ম্মেও তাহাদিগেরই উচ্চ আসন থাকা চাই। এ নিমিত্ত সামাজিক নির্ব্বাচনের দ্বারা প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের অভাব দূর করিতেই হইবে, তাহাতে গত্যন্তর নাই।

সমাজ সম্বন্ধে এইরূপ নির্ব্বাচন উপরের লিখিত ত্রিবিধ উপায়ে † সিদ্ধ হইতে পারে। বংশানুক্রম সম্বন্ধে এইমাত্র স্মরণ রাখিলেই যথেষ্ট হয় যে, যোগ্য ব্যক্তি ভিন্ন, দেহে ও মনে অধঃপতিত ব্যক্তিদ্বারা পরবংশ গঠনের সহায়তা করা অত্যন্ত অসঙ্গত। তৎপরে বংশানুক্রমের ‡ সে সকল নিয়ম পূর্ব্বে ইঙ্গিত করা হইয়াছে, তদনুসারে এবং অন্যান্য নির্দ্দিষ্ট বিধানানুসারে সমাজের মঙ্গলজনক কার্য্যে ব্রতী হওয়া উচিত। জন্ম ও মৃত্যু বংশানুগত; আয়ুষ্কাল প্রধানতঃ বংশানুগত। সুতরাং সমাজকে জনবলে পুষ্ট রাখিতে হইলে, অতিরিক্ত মৃত্যুর হার হ্রাস করিতে হইলে, যৌনসম্বন্ধ নির্দ্ধারণ সময়েই সতর্ক হইতে হয়, পরে প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে অনুকূল করিতে যত্ন-

*Kingdom of man—Ray Lankester.

† বংশানুক্রম বেষ্টনী এবং কর্ম্ম।

‡ বংশানুক্রম নামক পৃথক গ্রন্থ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

বান হওয়া কর্ত্তব্য। পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা বেষ্টনী যাহাতে স্বাস্থ্যকর, মনোরম এবং আনন্দদায়ক হয়, তৎপক্ষে দৃষ্টি রাখা উচিত। পরিষ্কার জলবায়ু, উত্তম মৃত্তিকা, সূর্য্যের আলোক—এ সকল মানব সমাজের অত্যাবশ্যক। এ সকলের উন্নতি অবনতির সহিত সমাজের উন্নতি অবনতি জড়িত। তা'রপর, পারিপার্শ্বিক অবস্থা বলিতে শিক্ষাকেও বুঝিতে হয়। শিক্ষা উপযুক্তরূপে দিতে হইলে দেহ ও মন উভয়কেই লক্ষ্য রাখিতে হয়। দেহ সুস্থ ও সবল না থাকিলে মন সুস্থ ও সতেজ থাকিতে পারে না। ইহাই এ বিষয়ের প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা এই যে, শিক্ষা জ্ঞানদায়িনী ও কর্ম্মকরী। অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই প্রথমোক্ত শিক্ষার অধিকারী। সাধারণের পক্ষে কর্ম্মকরী শিক্ষাই যথেষ্ট। তাহাদিগের জীবনের কর্ম্ম সুচারুরূপে নিষ্পন্ন হইতে পারে, তাহারা সুস্থ ও সবল থাকিতে পারে, এইরূপ শিক্ষাই তাহাদিগের উপযোগী। * উচ্চশিক্ষার তাহারা অধিকারীও নহে এবং তাহাতে কৃতকার্য্যও হইবে না। বৃথা কাল-হরণ অপেক্ষা তাহাদিগকে এরূপভাবে শিক্ষিত করিতে হয় যে, তাহারা সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে; সুতরাং ব্যবসায়-মূলক শিক্ষাই তাহাদের পক্ষে প্রশস্ত। এ বিষয়ে পূর্ব্বেও কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইয়াছে। শিক্ষা সম্বন্ধে এই দুইটী গুরুতর কথা। তৎপর প্রতিকূল জৈব বেষ্টনীর হস্ত হইতেও সমাজকে রক্ষা করিতে হয়। পীড়া-প্রবর্ত্তক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবাণু হইতে বিপক্ষ মানব অথবা মানবসমূহ,—সকলেই সমাজকে বিধ্বস্ত করিতে সক্ষম হয়। সুতরাং সর্ব্বপ্রযত্নে ইহাদিগের পীড়ন হইতে আত্মরক্ষা করা আবশ্যক। ইহাতে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, মনের তেজ, এবং শারীরিক সুস্থতা—সকলই প্রয়োজন হয়। কিন্তু প্রতিকূল মানব-সমাজের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে কেবল এ সকলেই কৃতকার্য্য হওয়া যায় না। অনেক সময় অর্থবল এবং উদ্যোগই প্রধান হইয়া উঠে। যাহা হউক, জড় ও জীব—উভয়বিধ বেষ্টনীকেই সমাজের অনুকূল করিয়া লইতে হয়, নচেৎ উন্নতির আশা করা যায় না।

তৃতীয় ও শেষ কথা কর্ম্ম। এ বিষয়েও পূর্ব্বে কিছু ইঙ্গিত করিয়াছি। সমাজের মধ্যস্থ কর্ম্ম ও বাহিরের কর্ম্ম, এই দুই প্রভেদ সর্ব্বাগ্রে স্মরণ রাখা আবশ্যক। সমাজ মধ্যে জীবন সংগ্রাম যথাসম্ভব কম থাকা উচিত। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রতিদ্বন্দ্বীতার ভাব যত কম হয়, ততই ভাল। তা'রপর সামাজিক

* বোধ হয় ইহাই এতদ্দেশীয় প্রাচীন আদর্শ। cf. Ran toul, Race culture.

কর্ম্ম সকল দেহ ও মনের অনিষ্টজনক না হয়। এরূপ ব্যবসা অথবা চাকরী নিষিদ্ধ হওয়া উচিৎ, যাহাতে দেহ ও মন ভাঙ্গিয়া যায়। এতদ্দেশীয় মধ্যবিত্ত ভদ্রসন্তানগণ প্রায় সকলেই কেরাণীগিরি অথবা তত্তুল্য কর্ম্ম করিতেছেন। ইহাতে অলস ভাবে রুদ্ধ হইয়া একস্থানে বসিয়া বসিয়া বৈচিত্র্যহীন কষ্টকর কর্ম্ম করিতে হয়। প্রতিভার স্ফূর্ত্তি নাই, মনের আনন্দ নাই, শ্রমের বিরাম নাই, বরং অনেক সময়েই লাঞ্ছনা এবং অবসাদ অপরিহার্য্য। যাঁহারা সমাজের মেরুদণ্ড স্বরূপ, তাঁহারাই ঈদৃশ প্রাণ-মন-দেহ-ক্ষয়কর কর্ম্মে নিরত থাকিলে সমাজ নানা প্রকারেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ব্যবসায়ও এমত হইতে পারে, যাহা স্বাস্থ্য-হানিকর; সে সকল বর্জ্জন করিতে হইবে। সমাজের মধ্যস্থ সকল কর্ম্মই স্বায়ত্ব থাকা অত্যাবশ্যক। কর্ম্ম পরায়ত্ব হইলেই সমাজে জড়তা আসিয়া উপস্থিত হয়। উহা সমাজের মধ্য হইতেই নিষ্পন্ন হওয়া চাই এবং সমাজের কোনও প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত হওয়া চাই। বাহিরের কর্ম্ম অপর সমাজের সহিত সংশ্রব রাখে বলিয়া কিয়দংশে পরের মুখাপেক্ষা করিতে হয়। কিন্তু অপর সমাজের সহিত স্বসমাজের অত্যাবশ্যক কর্ম্ম সম্বন্ধে সংশ্রব রাখা নিরাপদ নহে। এ নিমিত্ত এই শ্রেণীর কর্ম্ম, অর্থাৎ যাহার উপর সমাজের জীবন মরণ নির্ভর করে, তাহা সাধ্যমত পরায়ত্ব হইতে দেওয়া উচিত নহে। এতদুভয় শ্রেণীর কর্ম্মই এরূপ ভাবে অনুষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক যে, তাহাতে সামাজিক নির্ব্বাচনের সাহায্য করে, নতুবা প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের অভাব পূর্ণ হয় না। যে যোগ্য, তাহাকে উপেক্ষা করতঃ অযোগ্যের হস্তে কর্ম্মভার প্রদান করা; যে সুস্থ ও সবল, পরবংশ গঠন করিবার উপযুক্ত, তাহার গ্রাসাচ্ছাদনের সুবিধা না করিয়া দিয়া তদ্বিপরীত ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণের সুবিধা করিয়া দেওয়া; ইত্যাকার বহুকর্ম্ম ও চেষ্টা সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। ইহা নির্ব্বাচন বিধির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। যদি কেহ স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য অপর সমাজ মধ্যে অযোগ্যকে পুরস্কৃত করিবার লক্ষণ প্রকাশ করে, তখনই তাহাকে দমন করা আবশ্যক। নচেৎ সমাজ রক্ষা হয় না।

স্থূলতঃ বংশ, বেষ্টনী, ও কর্ম্ম, এই তিনকে এরূপ ভাবে নিয়মিত ও পরিচালিত করিতে হয় যে, তাহাতে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের অভাব পূর্ণ হইতে পারে এবং যোগ্যতমের জয় হওয়া সম্ভব হয়। নচেৎ সমাজমধ্যে যদ্যপি কোনরূপ নির্ব্বাচনই ক্রিয়া করিবার অবসর প্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে সমাজকে অধঃপতনের হস্ত হইতে রক্ষা করা অসম্ভব।

যেখানে ভাল মন্দ, উপযুক্ত, অনুপযুক্তের মধ্যে নির্ব্বাচন নাই, সেখানে ভাল অথবা উপযুক্ত কালে নষ্ট হইয়া যায়। সব মিশিয়া এক হইয়া যায়। তাহাতে উভয়ের মাঝামাঝি একটা গড়িয়া উঠে। † এ নিমিত্ত সমাজকে উন্নত রাখিতে হইলে, অর্থাৎ অধঃপতন নিবৃত্ত করিতে হইলে কোনরূপ নির্ব্বাচন প্রণালী সমাজমধ্যে অনুষ্ঠিত হওয়া অত্যাবশ্যক। মানব, সম্পূর্ণ না হইলেও, অনেক অংশে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের অধীনতায় ইতর-জীব-সমাজ নিয়মিত হইতেছে, কিন্তু মানব আর সে অধীনতায় ফিরিয়া যাইবে না। কাজেই তাহাকে সামাজিক নির্ব্বাচন-বিধি আশ্রয় করতঃ, যাহারা উপযুক্ত, তাহাদিগকে পোষণ এবং তাহাদিগের দ্বারাই পরবংশ গঠন করিতে হইবে। অনুপযুক্তকে বাদ দিতেই হইবে।

কিন্তু উপযুক্ত অনুপযুক্ত বলিতে পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিতে হয়। সমাজের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ অবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই উপযুক্ত অনুপযুক্ত, ভাল মন্দ স্থির করিতে হয়। যে সমাজ যেরূপ অবস্থায় পতিত হইয়া যেরূপ লক্ষ্য স্থির করে, তদুপযোগী হইলেই উপযুক্ত হইল। ইহাতে ভবিষ্যতের প্রতি লক্ষ্য রাখা অধিকতর প্রয়োজনীয় হইতে পারে।

মানব সামাজিক জীব। মানব কোন কালেও সমাজবদ্ধ না হইয়া ছিল না; এরূপ বিবেচনা করিবার সঙ্গত কারণ আছে। গোষ্ঠী আদিম অবস্থার প্রাথমিক সমাজ। বিভিন্ন গোষ্ঠীর স্বার্থ-সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়া তৎকালেও জীবন-সংগ্রামকে বাড়াইয়া তুলিয়াছিল। তাহাতে যে গোষ্ঠী দৈহিক ও মানসিক বলে যোগ্যতর ছিল, তাহারই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অপ্রধান হয়ত নির্ম্মূল হইয়াছে, নচেৎ প্রধানের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। এইরূপ মিশ্রণের ফলে কখনও বা অপ্রধানের পৃথক অস্তিত্ব লুপ্ত হইয়াছে, কখনও বা তাহারা নিম্নস্তরে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। এই শেষোক্ত প্রণালীতেই ভারতীয় শূদ্র জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। যাহা হউক, উপরের বর্ণিত রূপে গোষ্ঠীর বিস্তৃতি ক্রমে বাড়িয়া জাতিতে পরিণত হইয়াছে। এ যুগের জীবন-সংগ্রাম জাতিতে জাতিতে। এক জাতিস্থ সকলেই আত্মীয়, অপর জাতিয়েরা পর, ইহাই এ যুগের মূলসূত্র। এযুগ অদ্যাপিও চলিতেছে। ইহাতেও দৈহিক ও মানসিক বলই উপযোগীকে প্রাধান্য দেয়। কিন্তু দৈহিক বল আদিম অবস্থার ন্যায় এযুগে কার্য্যকর হয় না। মানসিক বল এযুগে অনেকাংশে দেহের বলকে

† Galton's law of regression towards mediocrity.

পরাজিত করে। এ সকলই প্রাকৃতিক ও সামাজিক নির্ব্বাচন বিধির ফল। মানবীয় উন্নতি ইহা হইতেই উদ্ভূত ও পুষ্ট হইয়াছে। দেহ ও মন উভয়ই ইহাদিগের নিকট ঋণী। ব্যক্তি হইতে গোষ্ঠী, তাহা হইতে দল, তাহা হইতে সমাজ, ইহাই সামাজিক বিবর্ত্তন; আর সে বিবর্ত্তন আদিম অবস্থায় প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের, অবশেষে সামাজিক নির্ব্বাচনের ফল। জাতীয় চরিত্র বিবর্ত্তন মূলেই জাত ও বিকশিত হইয়াছে। ডারুইন হইতে পিয়ার্সন্ পর্য্যন্ত জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ দেখাইয়াছেন যে, দৈহিক বংশানুক্রম এবং মানসিক অথবা চরিত্রগত বংশানুক্রম প্রায় তুল্যই। * বরং শেষোক্তের মাত্রাই প্রথমোক্তের অপেক্ষা কিছু অধিক। সুতরাং জাতীয় চরিত্র যোগ্য হউক অযোগ্য হউক, বংশানুক্রমেরই ফল। ইহা ব্যক্তি হইতে ক্রমে সমাজে উৎপন্ন হইয়াছে। একদিকে বংশানুক্রম, অন্যদিকে পারিবারিক ও সামাজিক বেষ্টনী, জাতির দেহ ও মন নিয়মিত করিতেছে। পরিবার ও সমাজ মধ্যে, একটী ক্ষুদ্র অন্যটী বৃহৎ কর্ম্মক্ষেত্র। সুতরাং সমাজের দাবী পরিবার অপেক্ষাও বেশী, কাজেই ব্যক্তির অপেক্ষা বেশী ত হইবেই। † আজি কালিকার দিনে এ কথা প্রায় কেহ স্বীকার করিতে ইচ্ছা করেন না। অন্যত্র হইতে আমরা শিখিয়াছিলাম, ব্যক্তিত্ব। যেন ব্যক্তির দাবী সকল অপেক্ষাই বড়। ব্যক্তির সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম বিরাম, স্বার্থ ও স্বাধীনতা, সমাজের সুখাদি অপেক্ষাও এতদিন বড় বলিয়া বুঝিয়াছিলাম। কিন্তু জীবতত্ত্ব সেই ভ্রম ক্রমেই দূর করিতেছে। সমাজকে ব্যক্তির অপেক্ষা প্রধান বিবেচনা না করিলে কোন সমাজই টিকিতে পারে না। ‡ সমাজকে ভাল বাসিতে হয়, ভক্তি করিতে হয়, সমাজের উন্নতিকে

---

* To sum up there appears no doubt that good and bad physique, the liablility to and the immunity from disease, the moral characters and the mental temperament are inherited in man and with much the same intensity'—Karl Pearson's—The Scope and Importance to the state of the Science of national Eugenics. p. 33.

† Each of the greater steps of progress is in fact associated with an increased method of subordination of individual competition to reproductive or social ends, and of inter-specific competition to co-operative association.

Geddes and Thomson—
The Evolution of sex.

p. 311, London, 1898.

‡ Ibid p. 2

আপনার উন্নতির সহিত একচক্ষেই দেখিতে হয়—নচেৎ তাহার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া যায় না, তাহার উন্নতি বিধান করাতো দূরের কথা। জাতীয় অবসাদ নিবারণ করিতে হইলে জাতীয় গৌরব হৃদয়ে পোষণ করিতে হয়। কিন্তু সে বৃথা আস্ফালন নহে; কর্ম্মের প্রবর্ত্তক এবং উৎসাহপ্রদ গৌরব হৃদয়ে প্রকৃতরূপে পোষণ করা আবশ্যক। সমাজ ও ব্যক্তির সংঘর্ষে সমাজের কথাই অগ্রগণ্য হওয়া উচিত। কিন্তু তাই বলিয়া ব্যক্তিকে পদদলিত করিলে কোন সমাজই টিকিতে পারে না। অযোগ্য ব্যক্তির কথা পৃথক্, কিন্তু যোগ্যব্যক্তির দীর্ঘজীবন এবং অপত্যোৎপাদন সমাজের অশেষ মঙ্গলকর। সকল যোগ্য-ব্যক্তিরই এইকথা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, তাঁহার যোগ্যতা, বংশানুক্রম এবং সামাজিক বেষ্টনী হইতেই জাত হইয়াছে। তিনি সমাজের নিকট ঋণী, সমাজের মঙ্গল কামনাই সে ঋণ শোধ করিবার একমাত্র পথ। ইহা তাঁহার ধর্ম্ম। ব্রহ্মজ্ঞান পৃথক কথা; কিন্তু সামাজিক ধর্ম্মই সমাজস্থিতির মূল। সামাজিক ধর্ম্ম, সামাজিক ধর্ম্মাচরণ, প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ত্তব্য কর্ম্ম। সমাজদ্রোহ প্রধান অধর্ম্ম, সমাজদ্রোহিকে দণ্ডিত করা অত্যাবশ্যক।

দণ্ড পুরস্কার।—কিন্তু সে দণ্ড দিবার একমাত্র উদ্দেশ্য এই যে, সমাজদ্রোহিগণ আর অনিষ্ট করিতে না পারে। অনিষ্ট দ্বিবিধ, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ। বর্ত্তমান অনিষ্টকারীদিগকে সংশোধন করা অতীব দুঃসাধ্য। পিয়ার্সন বলিতেছেন, সংশোধন অসাধ্য। ডাক্তার রেন্টুল ও অধ্যাপক টমসন্ প্রভৃতিও এই মত সমর্থন করেন। সচ্চরিত্রের ন্যায় দুশ্চরিত্রও বংশানুগত। সুতরাং অপরাধীদিগকে সংশোধন করা অসাধ্য হউক আর নাই হউক, দুঃসাধ্য—তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহাদিগকে সমাজ ধর্ম্মে দীক্ষিত করা যায় ভালই, কিন্তু সমাজ হইতে দূরে রাখাই প্রকৃষ্ট পন্থা। ভবিষ্যৎ সমাজ তাহাদিগের দ্বারা গঠিত হওয়া কখনই কর্ত্তব্য নহে; বর্ত্তমান সময়েও তাহাদিগকে সমাজের সহিত যত অসংসৃষ্ট রাখা যায়, ততই মঙ্গল। তাহাদিগকে গুরুতর দণ্ড দেওয়া বর্ব্বরতা মাত্র; নিতান্তই নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক, তাহাতে সন্দেহ নাই। অধ্যাপক লেবের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, "গুরুতর দণ্ড বিধান নীচ শ্রেণীর সভ্যতার নিশ্চিত চিহ্ন।*

* "Cruelty in the Penal Code and the tendency to exaggerate punishments are sure signs of a low civilisation and an imperfect educational system." Comparative Physiology of the Brain. P. 234.

সমাজদ্রোহিগণ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ঐ রূপ হয় নাই, তাহাদিগের জন্মগত স্বভাব, তাহাদিগের শিক্ষা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাহারা নিজে বিধান করে নাই। সুতরাং তাহাদিগকে দণ্ডিত করিবার পক্ষে কোনই যুক্তি নাই। † তবে তাহারা সমাজের যে সকল অমঙ্গল করে, তাহা হইতে আত্মরক্ষা করিবার অধিকার সমাজের অবশ্যই আছে। সুতরাং তাহাদিগকে সমাজের সংস্রব হইতে দূরে রাখিলেই যথেষ্ট হইল। তাহার অধিক কিছু করা নিষ্প্রয়োজন।

কিন্তু অপরাধী কাহাকে বলি? সামাজিক বিষয় আলোচনায় সামাজিক অপরাধকেই অপরাধ বলা যায়। যাহা স্বসমাজের অমঙ্গলকর, তাহাই সামাজিক অপরাধ। একজন জাল দলিল সৃষ্টি করিয়া একটী বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, তাহার স্ব-সমাজকে ধনে ও বলে সমৃদ্ধ করিবার প্রধান কারণ হইয়াছিল। তাহার স্বসমাজস্থ ব্যক্তিগণ তাহাকে অসাধারণ সম্মান প্রদর্শন করিয়াছে। ইহা সামাজিক ধর্ম্ম কিন্তু ইহা ব্যক্তিগত দুর্নীতি। ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ এরূপ ভাবে সম্বদ্ধ যে, যাহা একের অমঙ্গলজনক, তাহা পরিণামে সকলেরই অমঙ্গলজনক হইতে পারে। ব্যক্তিগত অমঙ্গল পারিবারিক ও সামাজিক অমঙ্গলের মূল হইতে পারে; কিন্তু সর্ব্বত্রই হইবে কি না, তাহা পরীক্ষা-সাপেক্ষ। কেবল অনির্দ্দিষ্ট পূর্ব্ব-সংস্কার অবলম্বন করিয়া এ বিষয় নিশ্চিত রূপে কিছুই বলা যাইতে পারে না। কেবল একটী মাত্র কথাই বলা সম্ভব যে, নীতিমান, চরিত্রবান, উন্নতমনা ব্যক্তিগণের সংখ্যা যে সমাজে অধিক হয়, পরিণামে সেই সমাজের মঙ্গলই অধিক আশা করা যাইতে পারে। ক্ষণিক সমৃদ্ধির উপর দৃষ্টি না করিয়া পরিণামকে লক্ষ্য করাই উচিত।

সামাজিক দণ্ডবিধানের যে উপায় উল্লেখ করিলাম, তাহাও সামাজিক নির্ব্বাচনেরই অন্যতর পথ। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে যেমন অযোগ্যদিগকে দূরীভূত করে, তেমনই অপরাধিগণকে সমাজের সংস্রব হইতে দূরে রাখাই সামাজিক নির্ব্বাচন। এ নির্ব্বাচনের ফলে যাহারা সমাজের শুভেচ্ছু, কেবল তাহারাই সামাজিক কর্ম্ম করিবার অবসর প্রাপ্ত হয়। সুতরাং ইহাও নির্ব্বাচনের উদাহরণ; এ কথা কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলেই প্রতীয়মান হইতে পারে।

---

† No man is responsible for his own being and nature and nurture over which he had no control, had made him the being he is, good or evil·
The Scope and Importance P. 37.

ঈদৃশ নির্ব্বাচনের আর এক প্রণালী, পুরস্কার। যাঁহারা বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সমাজের মঙ্গলজনক কার্য্য করেন, তাহাদিগকে পুরস্কৃত করা সমাজের কর্ত্তব্য-কর্ম্ম। যাঁহারা সুস্থ, সবল, বুদ্ধিমান অপত্য উৎপাদন করতঃ সমাজের স্থায়ী মঙ্গল বিধান করেন, যাঁহারা দেহে ও মনে উন্নত নরনারীর বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপন করতঃ সমাজহিতৈষিতার পরিচয় দেন, যাঁহারা শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি প্রভৃতি কার্য্যের উন্নতিসাধন করতঃ সমাজের অন্ন সংস্থান করেন, যাঁহারা বিবিধ বৈজ্ঞানিক অনুশীলন দ্বারা সমাজের দেহ ও মনের উন্নতি বিধান পক্ষে সহায়তা করেন,—এ সকলকেই সমাজের পুরস্কৃত করা অত্যাবশ্যক। কিন্তু দণ্ডিত অথবা পুরস্কৃত করিবে কে? সমাজ করিবে বলিলে প্রায় কিছুই বলা হইল না। যাহা দশের কাজ, তাহা যেন কাহারই কাজ নহে। সুতরাং সমগ্র সমাজের বলে বলীয়ান, সমগ্র সমাজের ধনে ধনবান এমন এক বস্তুর অথবা সত্তার আবশ্যক, যাহা হইতে সমষ্টি সমাজের কর্ম্ম অনায়াসে নিষ্পন্ন হইতে পারে এবং যাহার আদেশ সমাজের সর্ব্বত্র প্রতিপাল্য।

এ বস্তু কি? ইহাই রাজশক্তি। ব্যক্তির দেহে যেমন আত্মা, সমাজ দেহে তেমনি রাজশক্তি। যাহারা সমাজের ইষ্টকারক, তাহাদিগকে পুরস্কৃত করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। সমাজের কল্যাণ ভিন্ন রাজার অন্য কোনরূপ স্বার্থ নাই, এবং থাকা উচিত নহে। থাকিলে, সেই স্বার্থের অনুরোধে তিনিও সমাজদ্রোহী হইতে পারেন। রাজার প্রধান ধর্ম্ম, প্রধান কর্ত্তব্য এবং সমাজের প্রধান ধর্ম্ম, প্রধান কর্ত্তব্য একই হওয়া উচিত। তাহা কি? তাহা মানুষ গড়া; দেহে ও মনে যোগ্য মানব প্রস্তুত করা।* আমরা দেখাইয়াছি, সমাজের প্রধান সম্পত্তিই মানুষ। মানুষ অবনত হইয়া গেলে আর কিছুতেই সমাজকে ধ্বংসের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারে না। সমাজের ও রাজার কার্য্যই মানুষ তৈয়ারী করা। যে মানুষ প্রধানতঃ সেই সমাজের,—কেবল সেই সমাজের, হিতচিন্তা ও মঙ্গল অনুষ্ঠান করিবে, সেই মানুষ প্রস্তুত করা। এ হিসাবে বিবাহ বিষয়ক বিধি নিষেধ প্রণয়ন সমাজের ও রাজার প্রধান কার্য্য। অপর সমাজের বিবিধ প্রকার আক্রমণ হইতে রক্ষা করা, এবং যৌন সম্বন্ধের

* Taking the word sanity in its broadest sense of health and soundness, the primary purpose of statecraft is to insure that the nation as a whole possess sanity. it must be sound in body and sound in mind,

The Scope and Importance P. 9.

উৎকর্ষজনক বিধি প্রণয়ন ও পরিচালিত করা, আর গ্রাসাচ্ছাদনের সুযোগ বিধান করা, ইহাই রাজার প্রধান কর্ত্তব্য। তৎপর যাহাতে সামাজিক নির্ব্বাচন প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ন্যায় ফলোৎপাদন করতঃ সমাজকে উন্নতির পথে লইয়া যায়, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। অনেকে মনে করেন, শান্তি স্থাপনই রাজার ও সমাজের প্রধান কর্ম্ম। শান্তি স্থাপন সামাজিক উন্নতির উপায় বিবেচিত হইতে পারে সত্য, কিন্তু সমাজের মূল উদ্দেশ্য হইতে পারে না। বিশেষতঃ প্রত্যেক সমাজেই, (এবং ব্যক্তির জীবনেও) এমন এক একটা সময় আসিয়া উপস্থিত হয়, যখন শান্তি, অলসতা ও জড়তার নামান্তর মাত্র হইয়া উঠে। তখন শান্তি অধঃপতনের কারণ হইতেও পারে। বরং যেরূপ অশান্তি সমাজকে ধ্বংস করে না, তদ্রূপ অশান্তিতেই সে সকল সময়ে ব্যক্তিত্বের নানারূপ বিকাশ হইয়া থাকে। সে সকলের মধ্য হইতে নির্ব্বাচন বিধি অনুসারে মঙ্গলজনক বিকাশই স্থায়ীত্ব লাভ করিয়া, সমাজকে উন্নত করিয়া তুলে।* শান্ত গতিহীন বিলের জল দূষিত হইতে পারে, কিন্তু স্রোতস্বিনী সচরাচর তদ্রূপ হয় না।

গ্রীশের জগদ্বিখ্যাত উন্নতি অশান্তিমূলক; অর্থৎ জীবন-সংগ্রামের ফল। রোমের অধঃপতনের অন্যতর কারণ শান্তি † এবং সম্ভবতঃ বিলাসিতা। কর্ম্মহীন শান্তির অপর নাম জড়ত্ব। জীবন সংগ্রাম কেবল দেহের নহে, আধ্যাত্মিক উন্নতিরও কারণ। কিন্তু পূর্ব্বে বলিয়াছি, ইহার প্রকোপ স্ব-সমাজকে বিধ্বস্ত করিবার নিমিত্ত নহে, আত্মরক্ষার নিমিত্তই পরিচালিত হওয়া কর্ত্তব্য।

পুনরাবৃত্তি।

সমাজের তিন কথা—উৎপত্তি, স্থিতি ও উন্নতি। যে সকল ব্যক্তি দ্বারা সমাজ

---

* A time of unrest, social, moral and political, seems after all to be likely to beget individnal power of all kinds.

Harvian Oration, October, 1909 p 4.

† I now see a direct association between the achievements of Greece, and the intensity of its intertribal struggles. The Pax Romana did not provide the Greek spirit with an atmosphere as bracing to either bodily or spiritual developement as the instability and storm which accompanied the earliar conditions.

The Scope and Importance. &c, p. 22.

গঠিত তাহারা মূলে কোন্ জাতীয়, সর্ব্বাগ্রে ইহাই বিবেচ্য। তাহাদের অতীত ইতিহাস হইতে প্রবৃত্তি ও স্বভাব বুঝা আবশ্যক। কারণ তাহাদিগকে সাধারণত তদনুরূপ পথেই চালিত করিতে হইবে। জীব বিবর্ত্তন আকস্মিক প্রণালী, ক্রমিক নহে।* কিন্তু আকস্মিক বিবর্ত্তন সর্ব্বদাই ঘটিতেছে, এরূপ নহে। অনেক সময় জীবের উন্নতি বন্ধ থাকে, আবার অকস্মাৎ আরম্ভ হয়। সমাজেরও তাহাই। জন্মগত প্রবণতা অনুসারেই সমাজ সচরাচর চালিতে হইবে, কিন্তু কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন, কোন বিশেষ উন্নতি অকস্মাৎ হওয়া ভিন্ন, ক্রমে হইবার আশা বিরল, নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহাতে পূর্ব্বের সাম্য (equilibrium) নষ্ট হয় সত্য, কিন্তু আকস্মিক পরিবর্ত্তন প্রায় সর্ব্বদাই চঞ্চলতার মধ্য হইতে সাম্য গড়িয়া তুলে। যাহা হউক, এরূপ দৃষ্টান্ত অধিক নহে। সাধারণতঃ সমাজকে ব্যক্তিগণের স্বভাব অনুসারেই পরিচালিত করা কর্ত্তব্য। সমাজস্থ জনগণ মানব জাতির কোন্ শাখা ভুক্ত; অতীত কালে তাহাদিগের উন্নতি অবনতি কোন্ পথে ধাবিত হইয়াছে, ইতিহাস ও লোকতত্ত্ব তাহা বুঝাইয়া দিবে; তৎপর সমাজ সাধারণত সেই পথেই পরিচালিত হইবে। অন্যপথে চালিত হইবেও না, তন্নিমিত্ত চেষ্টা করিলেও কুফল উৎপন্ন হইবে। উৎপত্তি সম্বন্ধে এই কথা।

স্থিতি সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা এইঃ—স্থিতির প্রথম কথাই জনসংখ্যা। মানুষ না থাকিলে সমাজ কিসের? যাহাতে জনসংখ্যা দেশের আয়তনের এবং আহার সংস্থানের অনুপাতে কিছু বেশী হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়। উপযুক্ত নরনারীর পবিত্র পরিণয় হইতে যে জন-সংখ্যা গঠিত হয়, তাহাই সমাজের মঙ্গলকর। রুগ্ন, বিকৃতমনা অথবা অন্য প্রকারে যাহারা অযোগ্য, তাহাদিগের দ্বারা জনসংখ্যা যে পরিমাণ বর্দ্ধিত হয়, যোগ্য ব্যক্তিগণের দ্বারা তাহার অধিক পুষ্ট হওয়া অবশ্যক। আমার জনৈক শ্রদ্ধেয় বন্ধু লিখিয়াছেন যে, কবি কাউপার রুগ্ন ছিলেন; তাই বলিয়া কি তাঁহার অপ-

---

* That the form has been slowly acquired * * * this is the Darwinian view which we reject, Thomson's Evolution and Adaptation p, 348.

The current belief assumes that species are slowly changed into new types. In contradiction to this conception the theory of mutation assumes that new species and varieties are produced from existing forms by sudden leaps.

Species and Varieties, De Vries p, VII.

ত্যোৎপাদন করা অসঙ্গত হইত? আমি বলি, হইত। তাঁহার দ্বারা কিম্বা তাঁহার পুত্রগণের দ্বারা তদীয় সমাজ যে পরিমাণে লাভবান হইত, তদপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইত, সন্দেহ নাই। জর্ম্মানি দেশে একটী স্ত্রীলোক ছিল, তাহার কথা অনেক গ্রন্থেই উল্লেখ আছে। তাহার পুত্র-পৌত্রাদি তদীয় সমাজকে নানারূপে বিশেষ উৎপীড়িত করিয়াছিল। তাহাদিগের জন্য ৭০।৭৫ বৎসরে সমাজ প্রায় ৪০০০০০০ চল্লিশ লক্ষ টাকা পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল।‡ পণ্ডিতগণ গণনা দ্বারা যে পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিয়াছেন, তাহাতে এখন একথা বলা যাইতে পারে যে, যাহারা দেহে ও মনে বংশানুক্রমিক পীড়ায় উৎকট পীড়িত এবং অনুন্নত, তাহাদিগের সন্তানসন্ততি দ্বারা প্রায়ই সমাজের উপকার বেশী কিছু হয় না। আর যদিও বা দুই এক ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যভিচার দেখা যায়, তাহাতেও এ কথা বোধ হয় প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, ঐ সন্তান সন্ততি দ্বারা সমাজের উপকার অপেক্ষা অপকারই অধিক হইয়া থাকে। এতদ্দেশে এবিষয় গণনা দ্বারা স্থির করা হয় নাই; কিন্তু যতদূর দেখা যাইতেছে, তাহাতে ঐরূপ বিবেচনা করিবার কারণ আছে।

স্থিতি সম্বন্ধে দ্বিতীয় কথা শিক্ষা। অন্ন সংস্থান, স্বাস্থ্য, বংশ বৃদ্ধি, এ সকল বিষয়েই বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ভিন্ন বিশেষ ফল লাভ করা যায় না। জীবতত্ত্ব, জড়তত্ত্ব সকলই আলোচ্য। আগে শিক্ষণীয়তা, পরে শিক্ষা। যাহার শিক্ষণীয়তা নাই, তাহাকে শিক্ষা দেওয়া যায় না। সাধারণের শিক্ষা ব্যবসায়গত এবং অল্প সংখ্যকের শিক্ষা জ্ঞানমূলক (theoretical) হওয়া আবশ্যক।

বংশ বৃদ্ধি স্থিতির একটী প্রধান অঙ্গ। বংশের ক্ষয় অথবা সাম্যাবস্থা, উভয়ই সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক। বিলাসিতা বংশ ক্ষয় করে,* ম্যালেরিয়া প্রভৃতি কতিপয় পীড়া বংশ ক্ষয় করে., অতিরিক্ত অর্থোপার্জ্জন বংশক্ষয়কর, বাল্যবিবাহাদিও বোধ হয় পরিণামে বংশ-ক্ষয়কর। এ সমস্তই সমাজের স্থায়ীত্বের বিঘ্নজনক।

তারপর কর্ম্ম। সামাজিক কর্ম্ম স্ববশে না থাকিলে সমাজ টিকিতে পারে না। সমাজস্থ বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তিগণের মধ্যে সহানুভূতি না থাকিলে মঙ্গল-

‡ Pearson's National life p. 102.

* The next influence to be considered is that of healthy homes. These and a simple life certainly conduce to fertility. They also act indirectly by preserving lives that would otherwise fail to reach adult age,

Essay in Eugenics, Galton, P, 27

অনেক কর্ম্মে উৎসাহ বা প্রবৃত্তি হয় না। বিভিন্ন স্তর গুলিও পরস্পরের প্রতিযোগী বা প্রতিদ্বন্দ্বী না হয়; অথচ সমষ্টি সমাজের ইষ্টজনক হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। স্তরগুলির মধ্যে নিম্ন হইতে উচ্চে, উচ্চ হইতে নিম্নে, গুণ ও কর্ম্মানুসারে, উঠা পড়া হওয়া চাই। উঠা অল্প লোকের ভাগ্যেই হইবে, কিন্তু তথাপি তাহার ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক।

উৎপত্তি বা স্থিতির পর উন্নতির কথা স্মরণ করা কর্ত্তব্য। এসম্বন্ধেও প্রধান কথা বিবাহ-বিধির উপর নির্ভর করে। যাঁহাদিগের দ্বারা সমাজ কোন না কোন রূপে উপকৃত হইয়াছে, অর্থাৎ যাহারা গুণী ও যোগ্য, সামাজিক উন্নতি করা তাঁহাদিগেরই অধিকার, অন্যের নহে। তাঁহাদিগের বংশধরগণ উন্নতির প্রধান হেতু। তাঁহাদিগের সন্তান সন্ততি দ্বারাই সমাজের জন সংখ্যা অধিক গঠিত হওয়া উচিত। নীতিমান, চরিত্রবান, একাগ্র ব্যক্তি সমাজ মধ্যে অধিক জাত হওয়া উচিত। অসৎ ও সমাজদ্রোহীদিগের বংশবৃদ্ধি যথাশক্তি হ্রাস করা উচিত। সামাজিক নির্ব্বাচন এস্থলে অবশ্য অবলম্বনীয়। গুণী ও যোগ্য বংশ, অসৎ ও অযোগ্য বংশ, সাধারণের জানা থাকা আবশ্যক। প্রথমোক্তগণেরই কর্ম্মক্ষেত্রে ও বিবাহ ক্ষেত্রে প্রাধান্য স্থাপিত হওয়া উচিত। সামাজিক স্থিতি ও উন্নতির প্রধান শত্রুই মানব। মানবের ন্যায় মানবের শত্রু আর দ্বিতীয় নাই। অধার্ম্মিক কি পশুভাবাপন্ন মানব চিরদিনই মানবসমাজকে বিধ্বস্ত করিয়া আসিতেছে, এবং এখনও বিধ্বস্ত করিতেছে। ইহাদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া প্রধান কর্ম্ম। ধর্ম্ম ব্যতীত সমাজ টিকিতেই পারে না। সমাজের মঙ্গলেচ্ছাই সামাজিক ধর্ম্মের মূল। ইহার নিমিত্ত সমস্ত ত্যাগ স্বীকার করিতে অভ্যস্ত হইতে হইবে। সমাজের সর্ব্ববিধ অমঙ্গলের মূল যে স্থানে তাহা বুঝিতে হইবে। সমাজের দেহে ও মনে জড়তা, ভীরুতা, নিরুদ্যম, কর্ত্তব্য জ্ঞানের অভাব ইত্যাদি কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। ত্যাগে অনিচ্ছা, স্বার্থসিদ্ধিতে আসক্তি কিরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল, তাহা উপলব্ধি করিতে হইবে। তৎপর সমাজের মঙ্গল সাধন করা সম্ভব। সমাজকে প্রকৃতপক্ষে ভালবাসিতে হইলে, সমাজের কল্যাণকেই ধর্ম্ম বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করিতে হইবে। তাহা হইলে ত্যাগ অতি সহজ ব্যাপার বলিয়া প্রতিভাত হইবে। সমগ্র মানব-সমাজকে ভালবাসিতে হইলে অগ্রে স্ব-সমাজকে প্রেম করিতে হয়। অগ্রে স্ব-সমাজের মঙ্গল ইচ্ছায় আপাদ-মস্তক অনুপ্রাণিত হইতে হয়। তাহাকে জগতের শ্রদ্ধার পাত্র করিয়া তুলিতে

হয়। তাহা হইলে তৎকর্ত্তৃক বিশ্ব-মানবকে উন্নত করিবার পথ প্রশস্ত হইয়া উঠে। সমস্ত মানব সমাজ যাহাকে শ্রদ্ধা করিতে না পারে, সে কখনই মানব সমাজের উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হয় না। তাই স্ব-সমাজের কল্যাণ সাধন রূপ উপায় অবলম্বন করিয়া ধর্ম্ম পথে অগ্রসর হইতে হয়। সকল ধর্ম্মের মূলেই সংযম, অর্থাৎ ত্যাগ; তাই ধর্ম্মনীতিক উন্নতি ত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত। ধর্ম্ম উন্নত হইলে সামাজিক উন্নতি; আবার সামাজিক উন্নতি না হইলেও ব্যক্তির উন্নতি সুদূরপরাহত। এচক্র বুঝিতে হইলে ব্যক্তিকে বিশেষ ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। ব্যক্তি সমাজকে উন্নত করে, আবার সমাজও ব্যক্তিকে উন্নত করে। যে "ব্যক্তি" সমাজকে উন্নত করে, সে মহা পুরুষ। তাহার সংখ্যা কোন সমাজেই অধিক নহে। তাঁহার আবির্ভাবে সমাজ উন্নত হয়। আর তখনই সমাজ ইতর-সাধারণকেও হস্তে ধরিয়া উন্নতির পথে লইয়া যায়। এ রহস্য অতীব চমৎকার, অতীব বিস্ময়জনক। ইহা বুঝিতে হইলে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে হইবে যে, আমরা প্রত্যেকেই মহাপুরুষ, প্রত্যেকেই অনন্ত শক্তির আধার। বিকাশের অভাবে মেঘাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছি। আমাদিগের ভাবে ও কর্ম্মে এই বিশ্বাস যেন সর্ব্বদা ফুটিয়া উঠে, মেঘ বিদূরিত হইবে। আমরা ও সমাজ কৃতার্থ হইব।

সপ্তম অধ্যায়।

ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক, তাহা বুঝিলাম ও বলিলাম; কিন্তু শিক্ষণীয়তা না থাকিলে শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব। গুরু প্রাজ্ঞবালক ও জড় বালককে তুল্যরূপেই বিদ্যা বিতরণ করিতেছেন, কিন্তু একে লাভবান হইতেছে, অপরে পারিতেছে না *। সুযোগ্য পিতামাতার অপত্য অন্যাপেক্ষা অধিক মাত্রায় শিক্ষণীয়তা প্রাপ্ত হইতে পারে। তার পর, সামাজিক প্রবন্ধে ধর্ম্ম বলিতে সমাজ হিতকর কর্ম্মকে লক্ষ্য করি; ইহা পূর্ব্বেও বলিয়াছি। এতদ্দেশে ধর্ম্ম বলিতে চিরদিনই কর্ম্ম বুঝায়। এখানে ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসা পৃথক ভাবে পূর্ব্ব মীমাংসায় ও উত্তর মীমাংসায় আলোচিত হইয়াছে। যদিও এতদুভয় পরস্পরের সহিত জড়িত, সন্দেহ নাই, তথাপি সামাজিক জীবের বিশেষতঃ মনুষ্যের সামাজিক কর্ম্মই প্রধান ধর্ম্ম। সমাজ-হিতকর কর্ম্ম করা এবং সমাজের অনিষ্টকর কর্ম্ম না করা, ইহাই সামাজিক ব্যক্তির প্রধান কর্ম্ম। কর্ম্ম ভাবজ এবং অনুকরণজাত। কিন্তু শেষোক্ত কর্ম্মে স্থায়ীফল লাভ করা অসাধ্য। ভাবজ কর্ম্ম বুদ্ধিপূর্ব্বক নিষ্পন্ন করাই সামাজিক উন্নতির প্রধান উপায়। ভাব বলিতে সদ্ভাবকে লক্ষ্য করিতেছি। ভাব স্নায়ুমণ্ডল ও মস্তিষ্ক হইতে জন্মগ্রহণ করে এবং সৎ সঙ্গে বিকাশ প্রাপ্ত হয়। স্নায়ুমণ্ডল ও মস্তিষ্ক বংশ পরম্পরাগত, সুতরাং মূলে সেই ধর্ম্মপরায়ণ পূর্ব্বপুরুষগণের উপরেই ভাব নির্ভর করিতেছে। একদা হজরত মহম্মদকে একজন শিষ্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "বালকের উপযুক্ত শিক্ষা কি বয়সে আরম্ভ হওয়া উচিত?" সূক্ষ্মদর্শী প্যাগম্বর সাহেব বলিলেন "তাহার জন্মিবার শতবর্ষ পূর্ব্বে।" এই প্রবাদ বাক্য হইতেও আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, সেই তত্ত্বদর্শী মহাজন পূর্ব্ব পুরুষকেই লক্ষ্য করিতেছেন। সুতরাং বুঝা গেল যে, সদ্বংশ-জাত অপত্যই সমাজধর্ম্ম প্রতিপালন করিবার অধিকতর অধিকারী। সদ্বংশ বলিতে উচ্চ নীচ জাতি বলা আমার

---

* বিতরতি গুরু প্রাজ্ঞে বিদ্যাং যথৈব তথা জড়ে,
নচ খলু তয়ো জ্ঞানে শক্তিং করোত্যপহন্তি বা,
ভবতি চ পুনঃ ভূয়ান্ ভেদঃ ফলং প্রতি তদ্যথা,
প্রভবতি শুচি র্বিম্বোদ্গ্রাহে মণি র্ন মৃদাং চয়ঃ॥ উত্তর-রামচরিত।

উদ্দেশ্য নহে ; যোগ্য অযোগ্য বংশ বলাই আমার উদ্দেশ্য। তবে এতদ্দেশে উচ্চ জাতি মধ্যে যোগ্য ব্যক্তি অধিক পাওয়া যাইবে বলিয়া বিশ্বাস করি।

সামাজিক ধর্ম্ম অর্থাৎ কর্ম্ম যদি সদ্বংশের উপরেই নির্ভর করিল, তবে এক্ষণে বিবাহ-বিধির কথা আলোচনা করা আবশ্যক হইতেছে। এ আলোচনা পূর্ব্বেও কিছু করিয়াছি ; এস্থলে এইমাত্র উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি যে, যোগ্য ও অযোগ্য বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হইলে অপত্য যোগ্যতায় হীন হওয়াই সাধারণ বিধি। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ন্যায় দাম্পত্য নির্ব্বাচন সমাজ মধ্যে অনুষ্ঠিত না থাকিলে সমাজ ক্রমে অধোগামী হওয়াই সম্ভব। পূর্ব্বে বলিয়াছি, যেখানে যোগ্য অযোগ্যের নির্ব্বাচন নাই, সেখানে যোগ্যতা দীর্ঘ কাল রক্ষিত হয় না। ডারুইন ও গ্যাল্টন ইহা বিশেষরূপে বুঝাইয়াছেন। যোগ্যতার দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া যে-সে নরনারীকে বিবাহ সূত্রে সম্বদ্ধ করিলে ক্রমে যোগ্যতার মাত্রা হ্রাস হওয়াই সম্ভব। সমাজ হিতৈষী, সুযোগ্য নরনারীকে বিবাহ সম্বন্ধে মিলিত করিবেন। এতদ্দেশে জাতিভেদে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামাজিক গণ্ডী উৎপন্ন হইয়াছে, পরিণয় কর্ম্ম কেবল তাহাতেই সীমাবদ্ধ করিলে অনেক সময় সুযোগ্য নরনারী পাওয়া কঠিন হইয়া উঠে। পাওয়া যায়, ভালই ; না পাওয়া গেলে অন্য গণ্ডী হইতেও সুযোগ্য নরনারী সংগ্রহ করা অত্যন্ত আবশ্যক। এতদ্দেশীয় অধিকাংশ জাতিই তুল্যরূপে উৎপন্ন ; সেই আর্য্য, দ্রাবিড়ীয় এবং মঙ্গোলীয় সংমিশ্রণ-জাত। প্রায় সকলেই একই রক্ত, একই মাংস ; এক্ষেত্রে বঙ্গীয় হিন্দু এবং বঙ্গীয় মুসলমানেও উৎপত্তি বিষয়ে মৌলিক প্রভেদ নাই। তবে দীর্ঘ কাল স্ব স্ব গণ্ডীতে অন্তর্জাতীয় বিবাহ প্রচলন করায়, ধাতুগত বিবর্ত্তন বশতঃ বিভিন্ন জাতি মধ্যে দৈহিক ও মানসিক কিছু কিছু প্রভেদ উৎপন্ন না হইয়াছে, এমত নহে। এ হেতু কোন সম্প্রদায় মধ্যে সুযোগ্য কর্ম্মী আবির্ভাব হওয়া প্রকাশ পাইলে তাঁহাদিগের দ্বারা পর পর বংশ গঠিত করিয়া লওয়া সৎপরামর্শ। উৎকৃষ্টকে পৃথক রাখা অবনতি নিবারণ পক্ষে আবশ্যক।* সে উৎকৃষ্ট এক অথবা বিভিন্ন জাতি হইতেও নির্ব্বাচন করা আবশ্যক হইতে পারে। অন্তর্জাতীয় বিবাহ পূর্ব্বে এতদ্দেশে অনেক মঙ্গল সাধন করিয়াছে, সন্দেহ নাই। ইহাতে চরিত্রের স্থায়ীত্ব দেয় এবং দিয়াছে, কিন্তু এই দিক্ হইতে বিবেচনা করিলে এ প্রথা সমাজের অনেক অমঙ্গল করিতেছে, তাহাতেও সন্দেহ নাই। এ

* Cf Romans' Darwin and after Darwin Vol, III. Isolation. pp 1-40.

প্রথা যোগ্য অযোগ্য বাছিবার সাবকাশ দেয় না, অথবা অল্পই দেয়, সুতরাং সামাজিক উৎকর্ষ কালে রক্ষিত হয় না। আমাদিগের বর্ত্তমান অবনতির ইহাও এক অন্যতম কারণ।

অন্তর্জ্জাতীয় বিবাহ চরিত্রের স্থায়ীত্ব দেয়, তাহা বলিয়াছি; কিন্তু এক রক্ত পুনঃ পুনঃ সম্মিলিত হইলে, কালে যোগ্যতা সংরক্ষিত হয় না। এ নিমিত্ত ঐ শ্রেণীর বিবাহ দীর্ঘকাল সমাজ মধ্যে প্রচলিত থাকিবার পর বহির্জ্জাতীয় বিবাহও প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে, কারণ তাহাতে সমাজ মধ্যে নূতন রক্তের সহিত নবশক্তি সঞ্চারিত হয়। †

অন্তর্জ্জাতীয় এবং বহির্জ্জাতীয় বিবাহ যথা ক্রমে সমাজ মধ্যে প্রচলিত করিতে পারিলে, সমাজ নূতন বলে বিবর্দ্ধিত হইবার অবসর পায়, নতুবা ক্রমে নির্জ্জীব হইয়া পড়াই সম্ভব। কিন্তু এই স্থলে একটী কথা উল্লেখ করা আবশ্যক। বহির্জাতীয় বিবাহ-সূত্রে সমাজ মধ্যে নবশক্তি প্রবর্ত্তিত করিতে হইলে মনে রাখা আবশ্যক যে, যে বিভিন্ন নরনারীকে মিলিত করিতে যাইতেছি, তাহাদিগের ধাতু নিতান্ত বি-সম না হয়। যে দুইটী পৃথক জাতিকে বিবাহ সূত্রে মিলিত করিবার কল্পনা করিলাম, তাহারা বিভিন্ন প্রকৃতির হইলেও সম্পূর্ণ বিভিন্ন হওয়া অমঙ্গলজনক। ইহার দৃষ্টান্ত স্থলে ভারতীয় মেটে ফিরিঙ্গাগণ, আফ্রিকা ও আমেরিকার মুলেটোগণ এবং আরও অনেক অনেক সঙ্করজাতির উল্লখ করা যাইতে পারে। তাহারা অধঃপতিত, কারণ তাহাদিগের পিতৃমাতৃ-কোষ মধ্যে অত্যন্ত অধিক বিসমতা ছিল। পাঞ্জাবী, বাঙ্গালী ও মহারাষ্ট্রীয়গণের মধ্যে তাদৃশ বিসমতা নাই। বর্ণতত্ত্ব ও লোকতত্ত্বের আলোচনায় বংশরক্ষক কোষের সমতা ও বিসমতা স্থির করা যাইতে পারে; এবং স্থির হইলে বিভিন্ন প্রকৃতি অথবা ধাতু, অথচ অতি মাত্রায় বি-সম নহে, এইরূপ বর্হিজাতীয় বিবাহই সমাজের মঙ্গলকর হইয়া থাকে; যথা স্যাক্সন্, নরম্যান, ডেনস্, প্রভৃতির সংমিশ্রণে সুযোগ্য ও কর্ম্মঠ ইংরেজ জাতি। অত দূরেই বা যাই কেন? বাঙ্গালী জাতি যে বিদ্যা, বুদ্ধি ও শারীরিক বলে

---

† The establishment of a successful race or stock requires the alternation of inbreeding (endogamy) in which characters are fixed, and periods of out-breeding (exogamy) in which by the introduction of fresh blood new variations are produced. Thomson's Heredity, Page 537.

ইতিহাসে বিখ্যাত হইয়াছিল, তাহারও অন্যতম কারণ সঙ্করতা। কিন্তু নানা কারণে তাহার বিশেষত্ব রক্ষিত হইল না। সে সকল কারণ বিস্তৃতরূপে উল্লেখ করা নিরাপদ নহে। যাহা হউক, সামাজিক ধর্ম্মবলে বলীয়ান হইতে হইলে উপযুক্ত পিতৃমাতৃ নির্ব্বাচন আবশ্যক, একথা বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে।

বিবাহের সামাজিক প্রয়োজন উৎকৃষ্ট অপত্য উৎপাদন। বিবাহ যে কেবল ব্যক্তিগত ব্যাপার নহে, উৎকৃষ্ট অপত্যলাভ যে ইহার এক গুরুতর লক্ষ্য, তাহা প্রাচীনকাল হইতেই স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। মনু বলেন,—

যাদৃশং ভজতে হি স্ত্রী
সুতং সূতে তথাবিধং।
তস্মাৎ প্রজা বিশুদ্ধ্যর্থং
স্ত্রীয়ং রক্ষেৎ প্রযত্নতঃ॥ ৯।৯

প্রজা অর্থাৎ অপত্যের বিশুদ্ধিহেতু স্ত্রীকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবে। কিন্তু অপত্য বিশুদ্ধ হইবে কেমন করিয়া? "যেরূপ স্ত্রী হইবে, অপত্য তদ্রূপ হইবে।" শুধু পিতার উপর নহে, মাতার উপরও অপত্যের ধাতু নির্ভর করিতেছে। সুতরাং ভার্য্যা উত্তমা হওয়া আবশ্যক। কেবল সুশিক্ষাগুণে উত্তম স্বভাবা হইলেই হইবে না। কারণ শিক্ষালব্ধ গুণ বংশ-পরম্পরাগত হইবে না। এক পুরুষে যে শিক্ষালাভ করে, পর পর পুরুষগণকেও তাহা যত্নতঃ শিক্ষা করিতে হয়। বিনা যত্নে স্বভাবতঃ তাহা লাভ করে না। অন্ততঃ শিক্ষা-লব্ধ উৎকর্ষ বংশ-পরম্পরাগত চলিয়া আসার কোন বিশ্বাসজনক প্রমাণ নাই।* সুতরাং বংশগুণে উত্তমা স্ত্রী এবং উত্তম পতি মিলিত না হইলে উত্তম অপত্য লাভের আশা করা যায় না। কিন্তু অপত্য ধাতুগত উৎকর্ষ লইয়া জন্মিলেই হয় না, শিক্ষা গুণে তাহার উত্তমতার বিকাশ হওয়া আবশ্যক। ধাতুগত যোগ্যতা না থাকিলে শিক্ষা দেওয়াই যায় না সত্য, কিন্তু শিক্ষা না দিলেও ধাতুস্থ যোগ্যতার বিকাশ হয় না, উহা ধাতুস্থই রহিয়া যায়। এ নিমিত্তই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে হয়। সকলেই জানেন, অপত্য প্রথম বয়সে মাতা কর্ত্তৃক পালিত হয়।

---

* We may fairly sum up our position in regard to the theory of the inheritance of acquired character in the verdict of "non proven."

—Morgan's Evolution and Adaptation. P 260

মাতার মনোবৃত্তি সকল অনুন্নত, অথবা অপরিস্ফুট থাকিলে তিনি অপত্যকে উত্তম শিক্ষা দিতে সক্ষম হইবেন না, সুতরাং স্ত্রীগণেরও শিক্ষিত হওয়া অত্যাবশ্যক। এ বিষয় বিস্তৃত আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন, কারণ ইহা এক্ষণে সকলেই স্বীকার করেন। তবে কিরূপ শিক্ষা স্ত্রীগণের উপকারী, তাহা লইয়া এখনও সভ্য সমাজে মতভেদ চলিতেছে। স্ত্রী ও পুরুষের প্রকৃতিগত ভেদ অনেক আছে, একথা বিজ্ঞান সম্মত। শারীরিক ও মানসিক প্রভেদ বশতঃ স্ত্রী-পুরুষের সমাজিক উচ্চ নীচতাও চিরকালই চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদিগের সামাজিক উচ্চ নীচতার অন্য কারণ নাই, এমত নহে। পুরুষগণ চিরদিন তাহাদিগকে অকারণ পীড়ন করিয়া আসিতেছে, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। দীর্ঘকালের অধীনতায় এবং উৎপীড়নে দেহের ও মনের কিরূপ অধোগতি হয়, তাহা এ যুগে আর বলিয়া দিতে হইবে না। স্ত্রীগণ পুরুষের অধীন হইয়া পড়িয়াছে, ইহা বোধ হয় প্রাকৃতিক কারণেই অনিবার্য্য। এরূপ হইতই, এবং হইবেই। ইচ্ছাতেও হইত, অনিচ্ছাতেও হইত। কিন্তু তাহাদিগের শারীরিক মানসিক বিকাশের বহুবিধ অন্তরায় নিজ হস্তে গড়িয়া দিয়া পুরুষগণ নিজের পায়েই কুঠারাঘাত করিয়াছেন, এবং সমাজকেও ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। যদি স্ত্রীগণকে শিক্ষা দেওয়া সঙ্গত হয়, তবে সে শিক্ষা কি কেবল "প্রথম পাঠ ?" না হয় দ্বিতীয় পাঠই বা হইল। কিন্তু শুধু পুঁথিগত বিদ্যাই কি প্রকৃত শিক্ষা? সংসারক্ষেত্রে দশজনের সহিত নানাবিধ সংশ্রবে আসিলে, নানা সময়ে নানারূপ দুঃখ সুখে পতিত হইলে, বিপদ আপদ মাথার উপর দিয়া নানাভাবে বহিয়া গেলে, মানুষ যে শিক্ষালাভ করে, তাহার তুলনায় কেবল পুস্তকাবদ্ধ শিক্ষা শিক্ষাই নহে, একথা বোধ হয় অনেকেই স্বীকার করিবেন। নানাদেশ, নানা সমাজ, নানা অবস্থা, দেখিলে ও শুনিলে যে বহুদর্শিতা ও আত্মপ্রসার লাভ হয়; যে বিনয়, যে আত্মনির্ভরতা, যে দৃঢ়তা ও যে জ্ঞানলাভ হয়, কূপ-মণ্ডুক (অথবা গ্রাম্য ভাষার বলিলে "মাচির তলের ইঁদুর") তাহা কখনই লাভ করিতে সমর্থ হয় না। এ সকল কথা স্বীকার করেন অনেকেই; কিন্তু যাঁহাদিগের উপর মানবজাতির শিক্ষা প্রথম হইতে নির্ভর করিতেছে; যে মাতা, এবং যে ভার্য্যা পুরুষগণের জীবনের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করিতেছেন, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে এই সরল সত্যকে প্রয়োগ করিতে বলিলে অনেকেই নারাজ হইবেন। এ সত্য প্রকৃত-

পক্ষে ব্যক্তির ও জাতির জীবনে প্রয়োগ করিতে হইলে, স্ত্রী ও পুরুষের শিক্ষা সম্বন্ধে কোন প্রভেদই করা চলে না। তাহাদিগকে সমাজের ও জগতের সংশ্রব হইতে পৃথক করিয়া "মাচির তলে" পুঁতিয়া রাখা চলে না। কেবল পুঁথিগত শিক্ষা দিলেও চলে না। শারীরিক ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়াও অত্যাবশ্যক হয়। কারণ নিয়তঃ বদ্ধ বায়ুতেই শ্বাস প্রশ্বাস করিলে, কখনও মুক্ত বায়ুতে না আসিলে, সূর্য্যের আলোক ও তাপ সম্ভোগ করিবার সুবিধা না পাইলে, চলাফেরা ও অঙ্গপ্রত্যাদি পরিচালন করিতে না পারিলে, কখনই শারীরিক স্বাস্থ্য রক্ষা করা যায় না। আর শারীরিক স্বাস্থ্য রক্ষিত না হইলে মনোবৃত্তিও উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে না। সুস্থ শরীর না থাকিলে সুস্থ মন থাকে না। পুরুষগণ অতিরিক্ত শ্রমে ও চিন্তায় এবং স্বকৃত অত্যাচারে, এবং স্ত্রীগণ উপযুক্ত ব্যায়ামের অভাবে এবং দীর্ঘকালের অধীনতা বশতঃ মন ও দেহ বিনষ্ট করিয়া ফেলিতেছে। একদেশে নয়, প্রায় সর্ব্বত্রই এইরূপ হইতেছে। ইহাতে মানব সমাজ উচ্চাসন হইতে ক্রমেই অধঃপতিত হইতেছে। সর্ব্বত্রই মানবের দেহ আর পূর্ব্ববৎ বলিষ্ঠ নাই, মনও পূর্ব্ববৎ সতেজ নাই। "ভীষ্ম দ্রোণ, ভীমার্জ্জুন" যে কেবল এতদ্দেশেই আর জন্মিতেছে না, তাহা নহে; সর্ব্বত্রই ঐ এক কথা। তাই সূক্ষ্মদর্শী জীবতত্ত্ববিৎ হাক্সিলি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন যে, স্ত্রীগণের শিক্ষা ও সৎসঙ্গ লাভের কোনরূপ বিঘ্ন উপস্থিত করা কর্ত্তব্য নহে; * পুরুষগণের ঐ সকল যত প্রয়োজনীয়, স্ত্রীগণের ও তদ্রূপই। সুতরাং তাহাদিগের দেহ ও মনের উন্নতি বিধায়ক সর্ব্বপ্রকার যত্ন ও চেষ্টা করিতে সমাজ বাধ্য। কিন্তু আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জন সাধারণের পক্ষে পুঁথিগত শিক্ষা মঙ্গলজনক নহে; সে কথার সহিত এই মতের বিরোধ হইতেছে না।

শিক্ষা—শিক্ষা প্রসঙ্গে আরও কয়েকটী কথা বিবেচনা করা অত্যাবশ্যক। পূর্ব্বে এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু আরও কয়েকটী কথা বিস্তৃতভাবে বলা সঙ্গত। শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তো বুঝিলাম, কিন্তু কি শিখিব? উত্তর—সবই শিখিব। পূর্ব্বে বলিয়াছি, উচ্চ শিক্ষা প্রধানতঃ জ্ঞানমূলক এবং সাধারণ শিক্ষা কর্ম্মমূলক হওয়া উচিত। জ্ঞান সাধারণের আয়ত্ত হইবেও না, তাহার ব্যর্থ চেষ্টায় ক্ষতি ভিন্ন লাভও নাই। কিন্তু যে

* So far from imposing artificial restrictions upon the acquirement of knoweldge by woman' throw every facility in their way, &c &c—Lecture and Lay sermons P, 118

সকল ভাগ্যবান ব্যক্তি জ্ঞান চর্চ্চার অধিকারী, তাঁহারাই বা অনন্ত বহির্জগতের এবং অনন্ত অন্তর্জগতের অসংখ্য বিষয় মধ্যে কিসের আলোচনা করিবেন? সকল বিষয়ের আলোচনাতেই বুদ্ধি মার্জ্জিত হয়। "Mental gymnastics" অর্থাৎ মানসিক ব্যায়াম মাত্র করিতে হইলে সকল আলোচনাতেই মনের জড়তা ও শ্লথতা দূর হয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু তন্মধ্যে কোন্ আলোচনা অগ্রগণ্য? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে, উদ্দেশ্য স্মরণ রাখা আবশ্যক। সকল সময়ে সকল সমাজের পক্ষে একই নিয়ম খাটিতে পারে না; সুতরাং এক উত্তর সকল স্থলে দেওয়া যায় না। কিন্তু একথা সর্ব্বকালে সর্ব্বসমাজের পক্ষেই সত্য যে, মানবের পক্ষে মানবই প্রধান আলোচ্য। মানবের দেহ ও মনের বিকাশ, উন্নতি অবনতি, মানব সমাজের মঙ্গল অমঙ্গল, ইহাই আমাদিগের প্রধান লক্ষ্য।* কিন্তু আজি আমাদিগের যাহাতে মঙ্গল হইতেছে, কালি তাহাতে না হইতে পারে; অথবা আজিই তোমাদিগের তাহাতে মঙ্গল না হইতে পারে। এই নিমিত্ত দেশকাল পাত্র বিবেচনায় কিসে মঙ্গল, কিসে অমঙ্গল হয়, তাহা স্থির করা উচিত। একটী দেশ এবং তদ্দেশবাসিগণকে কল্পনা করুন। মনে করুন, ঐ দেশ জঙ্গলাকীর্ণ হইতেছে; খাল গর্ত্তে পূর্ণ হইতেছে। নদী সকল শুখাইয়া যাইতেছে, পচা দুর্গন্ধময় জলে পল্লীগ্রাম ঘিরিয়া ফেলিল; মহামারী, জ্বর, উদরাময় প্রভৃতিতে দলে দলে নরনারীসকল জীর্ণ ও মৃত হইতেছে, গ্রাম সকল জনহীন হইতেছে; জন্ম সংখ্যা হইতে মৃত্যু সংখ্যা বাড়িতেছে, দুর্ভিক্ষ পুনঃ পুনঃ হইতেছে, তাহাতেও অনেক সময় বহুলোক মরিয়া যাইতেছে; বহুলোক অর্থহীন, সংসারই চলেনা-এইরূপ একটী দেশ এবং তদ্দেশবাসিগণকে কল্পনা করিলে, তদ্দেশ, তৎকাল ও তৎপাত্র বিবেচনায় তাহাদিগের মুখ্য প্রয়োজন কি বলিবেন? এত হইয়াছে, তথাপিও তাহাদিগের জননহীনতা উপস্থিত হয় নাই। এইটুকু উপস্থিত হইলেই সেই দেশবাসিগণ পৃথিবী হইতে চিরতরে বিলুপ্ত হইতে পারে। ঐ একটু মাত্র আশার আলোক এখনও দেখা যাইতেছে। এস্থলে ঐ দেশের উচ্চাধিকারীগণের পক্ষে কি আলোচনা করা মুখ্য কল্প? গৃহে অগ্নি লাগিলে গৃহস্থের মুখ্য কর্ত্তব্য কি? এক্ষেত্রেও তদ্রূপ। ইহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না যে, ঈদৃশ দুর্দ্দশাপন্ন জাতির পক্ষে প্রধান আলোচ্যই মানব-তত্ত্ব ও সমাজ-তত্ত্ব, বস্তু-তত্ত্ব, শক্তি-তত্ত্ব, অর্থশাস্ত্র ও নীতি শাস্ত্র। মানব সমাজের উন্নতি অবনতি

* We are of more interest to ourselves than any study can be.
Hadd-on, The study of man. p xxiv.

কিসে হয়, বংশ উন্নত অবনত কেন হয়, অর্থ কেমন করিয়া প্রাপ্ত হওয়া যায়, উদরান্নের সংস্থান কিরূপে করা যায়, পীড়া সকলকে কিরূপে আয়ত্তে আনা যায়, জনপদগুলির উন্নতি বিধান করিবার উপায় কি, ইহা না জানিলেই চলেনা। যে সকল শাস্ত্র আলোচনায় এই বিষয়ক জ্ঞান লাভ করা যাইতে পারে, এবং ইহা কার্য্যে পরিণত করার সুবিধা হয়, সেই সকল শাস্ত্র মুখ্য আলোচ্যরূপে গৃহীত না হইলে জগতে তদ্দেশবাসিগণের আর স্থানই হইবে না। ধরিত্রী তাহাদিগের অস্থিপঞ্জরে নিজ বিশাল উদরগহ্বর অচিরেই পূর্ণ করিবেন। যাহারা জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে উপস্থিত হইয়াছে, তাহাদিগের পক্ষে পুরাতন, কুণ্ডল অথবা কেয়ূরের সৌন্দর্য্য, প্রাচীন প্রস্তর অথবা ইষ্টকের নেত্র-বিনোদন শোভা সিংহাসনাসীন লম্পটগণের প্রধান উপপত্নীর অঙ্গ-মাধুর্য্য, ইত্যাদি আলোচনা, বর্ণনা অথবা উপভোগ করিয়া মূল্যবান সময় হেলায় নষ্ট করতঃ মরণের পথ প্রশস্ত করা অতীব গর্হিত কর্ম্ম। আলোচ্য বিষয় লইয়া এরূপ নিষ্ঠুর সাহিত্যক্রীড়া করা অধর্ম্ম, ইহা আমি নিঃসঙ্কোচে বলিতে সাহস করি। ঐ সকল বিষয় যদি কেহ আলোচনা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে চাহি না। তবে ও-সকলও সমাজের হিতকর ভাবে আলোচনা করা যায়, সেই ভাবেই আলোচনা করিতে অনুরোধ করি। কুণ্ডল অথবা কেয়ূর কিরূপে গঠিত হইয়াছিল, তাহার উৎকৃষ্টতা সম্পাদনের উপায় কি? ইহাই আলোচনা করতঃ ঐ সকল দ্রব্যের বাণিজ্য অনুষ্ঠিত করিতে পারিলে, সৌন্দর্য্যের আদর্শে হৃদয়কে উন্নত করিয়া আরও সুন্দরতর গঠন প্রচলিত করিতে পারিলে, বিচিত্র ইষ্টক অথবা প্রস্তরের পদার্থ-জ্ঞান, তাহার সংস্থান ও রচনা প্রণালী, তাহার কারুকার্য্য ইত্যাদি আলোচনা করতঃ সমাজকে ধনে ধান্যে লাভবান করিতে পারিলে সে ভাবে ওসকলও আলোচনার যোগ্য বিষয়, সন্দেহ নাই। যে ভাবে হাক্‌স্লি একখণ্ড চা-খড়ির ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন, সে ভাবে সকলই আলোচ্য। আর তাহা না পারিলে কেবল মাত্র কাষ্ঠ চর্ব্বণ অথবা সৌন্দর্য্য উপভোগের লালসায় কিছুই আলোচ্য নহে। ব্যক্তিগত ও জাতিগত হিসাবে যে নির্ম্মূল হইতে বসিয়াছে, তাহার প্রধান আলোচ্যই এই হওয়া উচিত যে, বাঁচি কিসে? খাই কি? জাতীয় উপকারের দিকে, উপস্থিত সাংঘাতিক অবস্থা হইতে রক্ষা পাইবার দিকে, দৃষ্টি রাখিয়াই সর্ব্ববিষয়ে আলোচনা করিতে হয়।* মরণোন্মুখ জাতির সাহিত্য-ক্রীড়া করা চলে না।

* It seems desirable that our mental training should take as its problems those which are actually demanding solution in practical life—

তাই উপরের লিখিত শাস্ত্রাদিই ঈদৃশ সমাজের মুখ্য আলোচ্য বিষয় রূপে স্বীকৃত হওয়া অত্যাবশ্যক। ফ্রান্স পতিত হইল কেন? জার্ম্মানই বা উত্থিত হইতেছে কেন? স্পেন এবং হল্যাণ্ড পৃথিবীর উচ্চ সিংহাসন হইতে অধুনা সম্পূর্ণ অধঃপতিত হইবার কারণ কি? এ সকল প্রশ্নের উত্তর কোন্ শাস্ত্রে পাই? এই ভারতভূমি জগতের রাজ্ঞী ছিল, ভিখারিণী হইল কেন? তাহা কে বলিয়া দিবে? গ্রীস্ এবং রোম নিবিয়া গিয়াছে কেন? এ তথ্য কাহার নিকটে শুনিতে পাইব? এসকল তো বৃহৎ কথা। আমার পিতামহের গাড়ুটী আমি তুলিতে পারিনা কেন? প্রকাণ্ড লাঠিখানি হাতে করিতে পারি না কেন? তাঁহার মত ৭১ বৎসর বয়সে ৬ ঘণ্টায় ৮ ক্রোশ হাঁটিতে পারি না কেন? মোটা চাউলের তো কথাই নাই, অতি পুরাতন মিহি চাউলও ভাল করিয়া হজম করিতে পারি না কেন? সাহস, সত্য-নিষ্ঠা সরলতা ও ধর্ম্ম-ভাব কি কারণে ফুরাইতে বসিয়াছে? কোন্ ঐতিহাসিক, কোন্ প্রত্ন-তত্ত্ববিৎ, কোন্ দার্শনিক, এ সকল অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয় বলিয়া দিবেন? অথবা বলিয়া দিবার যোগ্য? মানুষকে জানিতে হইবে, মানব সমাজকে বুঝিতে হইবে, তাহা-দিগের জন্ম, বৃদ্ধি, জরা, মরণ; তাহাদিগের বংশানুক্রম ও দেহমনের পরিবর্ত্তন চিরাতীত কাল হইতে যে সকল নিয়মে পরিচালিত হইয়া আসিয়াছে, তাহা বুঝিতে হইবে, নচেৎ মুমূর্ষুকে বাঁচাইবার উপায়ান্তর নাই।

বাঁচি কিসে? খাই কি? জানি, মানুষ কেবল মুখ ও উদর-সর্ব্বস্ব নহে; কিন্তু এই দুইটার কর্ম্মই অগ্রে, নচেৎ প্রাণবায়ু দেহে থাকিতেই সম্মত হন না। তাহার উপায় কি? আর যদি উচ্চতম, গভীরতম বিষয়ের আলোচনা করিয়া মনোবৃত্তি সকলকে উন্নত করিবার ইচ্ছাই প্রবল হইয়া থাকে, তাহা হইলেও বিজ্ঞান শাস্ত্রের ন্যায় উচ্চতম চিন্তা, উন্নত ভাব-প্রবাহ কোথায় পাওয়া যাইবে? একটী তৃণ, একবিন্দু ধূলিকণা, অথবা একটী ক্ষুদ্র জীবকোষ হইতে আরম্ভ করিয়া অত্যুচ্চ পর্ব্বতরাজি, গভীর অরণ্যানী, অথবা দিগন্তবিস্তৃত গ্রহ নক্ষত্র মণ্ডল পর্য্যন্ত যাহা কিছু আলোচনা করা যায়, তাহাতেই মানবমন উন্নত ও বিস্তৃত হইয়া থাকে; তাহাতেই অনন্তের ভাব-মাধুর্য্য মানবের হৃদয়কে সসীমের অব-রোধ হইতে মুক্ত করিতে সমর্থ হয়। এমন শিক্ষা, এমন আনন্দ, এমন সৌন্দর্য্য আর কোথায় আছে, যাহা বিবিধ বিজ্ঞানালোচনায় হৃদয়কে ভাব সম্পদে ছাইয়া

Pearson, The scope aud importance to the state of the Science of National Eugenics, p. 8.

ফেলে। যে দিক দিয়াই দেখ, বিজ্ঞান শাস্ত্র ইহকাল ও পরকালের বন্ধু।

যাহাকে চিনিতে চাই, তাহার কর্ম্ম জানা আবশ্যক। মানব জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য, শ্রীভগবান্‌কে চিনা। ব্যক্তাব্যক্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার বিরাট কর্ম্ম। বিজ্ঞান শাস্ত্র তাহাই আলোচনা করে। এ নিমিত্তই বলিয়াছি, বিজ্ঞান ইহকালের এবং পরকালেরও বন্ধু।

অষ্টম অধ্যায়।

এক্ষণে জাতির কথা আলোচনা করিব। জাতিভেদ সমাজ-বদ্ধ জীব মধ্যে সর্ব্বত্রই প্রচলিত। সমাজ-বদ্ধ নিম্ন জীব ও উচ্চ জীব, সকলের মধ্যেই জাতি-ভেদ আছে। সুতরাং ইহার কারণ মৌলিক। ইহা জীব বস্তুর অনন্যসাধারণ ধর্ম্ম। প্রকৃত পক্ষে ইহা তথা-কথিত চেতন অচেতন সকল বস্তুরই ধর্ম্ম, সকলের মধ্যেই জাতিভেদ আছে। লৌহ অনেক প্রকার, অঙ্গারও অনেক প্রকার। রৌপ্য ছয় প্রকার, অম্লজান অন্ততঃ দুই প্রকার। অচেতন পদার্থও অনেক পরিবারে এবং জাতিতে বিভক্ত; অর্থাৎ কতক গুলির সাদৃশ্য এত নিকট যে একজাতি বলা হয়, অপরগুলির সাদৃশ্য তত নিকট নহে, তথাপিও আছে। তাহারা একজাতি না হইলেও এক পরিবারভুক্ত। যেমন ক্লোরিণ, ব্রোমিন, আইওডিন্ এক পরিবার-ভুক্ত, বিভিন্ন জাতি; যবক্ষার, ফস্ফরাস্ আর্সেনিক, বোরণ, সিলিকনকেও এক পরিবারভুক্ত বিভিন্ন জাতি বলা যাইতে পারে। এস্থলে অধিক সাদৃশ্যে জাতি এবং অল্পসাদৃশ্যে পরিবার ধরা হইল। সমস্ত জীব এক পরিবার-বিবেচনা করিলে, বিভিন্ন উদ্ভিদ ও জন্তু বিভিন্ন জাতি; আর প্রত্যেক জন্তুকে এক একটী পরিবার ধরিলে, তাহার বিভিন্ন প্রকারকে বিভিন্ন জাতি বলা যাইতে পারে। জীবের শ্রেণীবিভাগে বৈজ্ঞানিকগণ ইহা অপেক্ষা সংকীর্ণ অর্থে পরিবার ও জাতি শব্দ ব্যবহার করেন, কিন্তু আমরা এস্থলে মোটামুটি বলিতেছি। সমস্ত মানবকে এক পরিবার বলিলে, মঙ্গোলীয়, ককেসীয় প্রভৃতি জাতি। আর ককেসীয়গণকে এক পরিবার ধরিলে, বাঙ্গালী, ইংরাজ প্রভৃতি জাতি; এবং বাঙ্গালী সমস্তকে এক পরি-বার বলিলে ব্রাহ্মণ কায়স্থ ইত্যাদি জাতি। পরিবার অথবা জাতি বিভাগ কাল্প-নিক, ইহা অসংখ্য প্রকারে কল্পনা করা যায়। কিন্তু ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে অল্পাধিক প্রভেদ, যাহা নিম্ন উচ্চ সকল জীবেই আছে, তাহাই ঈদৃশ বিভাগের মূল কারণ। কালক্রমে ব্যক্তিগত প্রভেদ বৃদ্ধি হইয়াই প্রকার, জাতি, গণ ও পরিবার গঠিত হইয়াছে। এ সকল নাম অল্প বা অধিক ব্যক্তিগত প্রভেদ বুঝাইবার নিমিত্ত কল্পিত। সে প্রভেদ জন্মগত এবং কর্ম্মগত; তাহাতে জীবজড়, চেতন অচেতন ভেদ নাই।

মানুষ সম্ভবতঃ মূলে এক প্রকারই উৎপন্ন হইয়াছে। জীব-বিবর্ত্তনের মৌলিক বিধানে একবিধ মানব জাত হওয়াই অধিকতর সম্ভব। কালক্রমে তাহা হইতে প্রধানতঃ তিন প্রকার মানব উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু এই তিন প্রকার প্রধান ভেদ উৎপন্ন হইতে আরও অন্ততঃ দুই প্রকার ভেদ উৎপন্ন হইয়াছিল। শ্বেত কৃষ্ণ ও পীত, মানরের মধ্যে এই প্রধান তিনটী বর্ণ-ভেদ।* কিন্তু এই তিনের প্রত্যেক দুইটীর মধ্যে আরও বর্ণ আছে; যেন একটী হইতে ক্রমে অপরটী জাত হইয়াছে। কাফ্রিগণ গাঢ়কৃষ্ণ, আর্য্যগণ শ্বেত; কিন্তু মালেয়াগণ (সম্ভবতঃ মিশ্র জাতি না হইয়াও) অল্পকৃষ্ণ এবং কিছু শ্বেতাভ। আমেরিকার লোহিত মানব যেন শ্বেত আর্য্য ও পীত মঙ্গোলিয়গণের মধ্যবর্ত্তী। যাহা হউক, একপ্রকার মানব, (সম্ভবতঃ কৃষ্ণবর্ণ), হইতেই কালে বহু প্রকার মানব হইয়াছে। ইহার কারণ জৈবিক। কিন্তু একপ্রকার মানব মধ্যেই ব্রাহ্মণ কায়-স্থাদি বিভিন্ন জাতি উৎপন্ন হওয়ার কারণ ঠিক্ জৈবিক নহে। এ ভেদের কারণ অনুসন্ধান করিলে সংক্ষেপে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, ঐ কারণ প্রধানতঃ সামাজিক। কিন্তু সামাজিক কারণও জৈবিক নহে, এরূপ বলা যায় না। এক অর্থে ইহাকেও অংশতঃ জৈবিক বলা যাইতে পারে।

সমাজকে ব্যক্তির সহিত বহুবার তুলনা করিয়াছি। সমাজের বিবর্ত্তন জীববিবর্ত্তনের ন্যায়। প্রাথমিক জীবের ক্ষুদ্র একটী কোষ মধ্যে অঙ্গ প্রত্য-ঙ্গের ভেদ নাই, জীব বস্তুরও বিশেষ প্রভেদ নাই। কিন্তু সেই জীববস্তু কালে পৃথক্‌ভাবে বিবর্ত্তিত হইয়া অস্থি, মাংস, শিরা, পেশী প্রভৃতিতে পরিণত হইয়াছে। এক জলবৎ অথচ পিচ্ছিল জীব বস্তুর ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র অণু নানারূপে বিবর্ত্তিত হইয়া ঐ সকল রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে। যে ক্ষুদ্র কোষস্থ জীব-বস্তু নিম্ন প্রাণিগণের জীবন ধারণোপযোগী সমস্ত কর্ম্মই করিত, তাহা বিভক্ত হইতে হইতে বহু-প্রকার অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি গঠিত করিয়াছে এবং ইহারা একে অন্যের কার্য্য করে না। এক বস্তুর বহু প্রকার-ভেদ হইতে কর্ম্মভেদ উৎপন্ন হইয়াছে। অবশেষে মানবীয় দেহে অঙ্গভেদের বাহুল্য এতই জটিল হইয়াছে যে, কর্ম্মভেদও ঐ জটিলতার অনুরূপ হইয়া উঠিয়াছে।

কর্ম্মভেদ এবং অঙ্গভেদ অতীব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত। ভেদই জগতের মূল নিয়ম; সমতা হইতে ভেদ, আবার ভেদ হইতে সমতা; ইহাই ব্রহ্মাণ্ড-চক্র। মৌলিক সমতা অব্যক্তাবস্থা, শেষের সমতাও তাহাই। কেবল মধ্যবর্ত্তী ব্যক্তাবস্থাই

* বর্ণভেদের সঙ্গে সঙ্গে আকৃতি ভেদও আছে।

কর্ম্মজগৎ। ইহা ভেদের উপরই প্রতিষ্ঠিত। জড়বস্তু, জীববস্তু এক; কিন্তু উহারা ভেদ-গত হইবেই। এ নিমিত্ত মানবে মানবে এত ভেদ। দেহগত সুতরাং মনোগত ভেদ এত। ব্যক্তি ভেদমূলক হইলে সমাজও ভেদ-মূলক হইবে, সন্দেহ নাই; কারণ প্রত্যেক সমাজই ব্যক্তিপূর্ণ। প্রাথমিক জীবকোষস্থ অণু সকলের ন্যায় প্রাথমিক সমাজেও সকল কর্ম্মই সকলে করে; কিন্তু উন্নত জীবের ন্যায়, উন্নত সমাজের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিভিন্ন কর্ম্ম করে; সাধারণতঃ একে অন্যের কর্ম্ম করে না। এই হেতু সমাজে বিভিন্ন জাতির উৎপত্তি সর্ব্বত্রই হইয়াছে। এতদ্দেশে উহা যে বিশেষ আকার ধারণ করিয়াছে, তাহার মূল কারণও জীব প্রকৃতিতে নিহিত। সে কথা পরে বলিতেছি।

মানব যখন প্রথমে মানব পদবাচ্য হইয়াছিল, তখনকার ঘোর অসভ্য অবস্থাতেও সমাজ ছিল। নিম্ন জীবগণেরও সমাজ আছে। কিন্তু সকল সমাজই ক্রমে উন্নত হইয়াছে এবং হইতেছে বলিয়া বিশ্বাস করি। প্রথমে সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই মানবও ইতর প্রাণীর ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়াছিল। ইতরপ্রাণীদিগের দল দেখিলেই ইহা বুঝা যায়। ঐ সকল দল অবশ্যই নিয়মের অধীন ছিল। দলপতির আদেশ এবং ক্রমাগত ব্যবহার তখনও নিয়মের ন্যায় কার্য্য করিত। কিন্তু তখন বোধ হয় নির্দ্দিষ্ট দলপতি গঠিত হয় নাই। তখন যে ব্যক্তি শারীরিক ও মানসিক-বলে দলের অভীষ্ট সাধনের অধিকতর উপযোগী হইত, সে-ই দলপতি হইত। দলপতি একাধিক ব্যক্তিও হইতে পারিত। এইরূপে বিভিন্ন দল গঠিত হইলে কালক্রমে বিভিন্ন দলস্থ ব্যক্তিগণের শারীরিক ও মানসিক প্রভেদও উৎপন্ন হইয়াছিল। এই সকল দল অতিরিক্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে, আহারের অসদ্ভাব হেতু এবং স্ত্রী সংগ্রহার্থ ইহাদিগের মধ্যে কলহ বিবাদ, যুদ্ধ বিগ্রহও অবশ্যই সময় সময় উপস্থিত হইত। ইহার বর্ত্তমান দৃষ্টান্তস্থল বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ ও আমেরিকার যুক্ত রাজ্য। একই জাতি দুই ভিন্ন স্থানে বাস করায় শারীরিক পরিবর্ত্তনও হইতেছে, মানসিক পরিবর্ত্তনও হইতেছে, উভয়ে যুদ্ধ বিগ্রহও হইয়া গিয়াছে। এই উন্নত যুগেও যখন এ সকল দেখা যাইতেছে, তখন অতীত কালে যে এই প্রকার ঘটনা অনেক সময় ঘটিয়াছে, তাহা সাহস করিয়া বলা যায়। এই সকল যুদ্ধ বিগ্রহের ফলে কখনও বা পরাজিত দল স্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে; কখনও বা জেতৃগণের সহিত মিলিয়া গিয়া স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারাইয়াছে, কখনও বা জেতৃগণের একদল ভুক্ত হইয়াও একরূপ পৃথক

ভাবে অর্দ্ধ স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিয়াছে। যদি জেতা ও জীতগণ মধ্যে শারীরিক ও মানসিক প্রভেদ অধিক থাকে, তবে উহারা সম্পূর্ণ এক হইতে পারে না। ইংলণ্ডীয় আদিম অধিবাসিগণ জেতৃগণ সহ এক হইয়াছে; কারণ উহারা উভয়েই প্রায় একরূপ ছিল। ভারতবর্ষে তাহা হইতে পারে নাই, যুক্ত রাজ্যেও পারে নাই। যুক্তরাজ্যে কৃষ্ণবর্ণ অথবা লোহিত-বর্ণ ব্যক্তিগণ শ্বেত-গণের সহিত রাষ্ট্রনীতিতে প্রায় এক হইলেও সমজে নীতিতে এক হইতে পারে নাই, পৃথকই আছে। ভারতে শ্বেতবর্ণ জেতৃগণ কৃষ্ণবর্ণ জীতগণের অনেককেই স্বসমাজ-ভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন; যাহারা সম্মত হয় নাই, তাহার পর্ব্বত সমূহে আশ্রয় লইয়াছিল; কিন্তু কালে তাহারাও আর্য্য শ্বেতাঙ্গগণের বিধি নিয়মের অধীনে আসিতেছিল। যাহারা এইরূপে জেতৃগণের সহিত এক সমাজ-ভুক্ত হইয়াছিল, তাহারাও সম্পূর্ণ একতা প্রাপ্ত হয় নাই। শ্বেতাঙ্গগণ, যাঁহারা বিদ্যাবুদ্ধি * বাহুবল † এবং অর্থবলে ‡ বলীয়ান ছিলেন, তাঁহারা এক ভাবে, আর জীতগণ (যাহারা শারীরিক ও মানসিক বিধানে অনেক পৃথক ভাবাপন্ন ছিল, তাহারা) অন্য ভাবে সমাজ মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইল। বলা বাহুল্য, জীত অপেক্ষা জেতৃগণই উচ্চস্থান পাইলেন। ¶ তখন সমাজে এই দুই বিভাগই প্রধান। এইরূপে ভারতীয় বিশাল শূদ্র জাতির উৎপত্তি হওয়া বিশ্বাস করি। শূদ্রেরা তখন সমস্তই এক। এ পার্থক্য দীর্ঘকাল রক্ষিত হইতে পারে নাই। আর্য্যগণ ও শূদ্রগণ মধ্যে বিবাহাদি চলিতে লাগিল; অন্য প্রকারেও উভয়ের রক্ত মিশিয়া যাইবার অনেক সুবিধা উপস্থিত হইয়াছিল। তখন অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহে অনেক মিশ্রজাতি উৎপন্ন হইতে লাগিল। এইরূপে হিন্দু সমাজে অনেক জাতি উদ্ভূত হইয়াছে। আবার কোন কোন জাতি অতীব কাল্পনিক ভাবে উৎপন্ন। এক জাতিই বঙ্গদেশে বিভিন্ন ব্যবসায় অবলম্বন করায় কালে বৈদ্য ও কায়স্থ এই বিভিন্ন জাতিতে পরিণত হইয়াছে। রামপুর

* ব্রাহ্মণ।

† ক্ষত্রিয়।

‡ বৈশ্য।

¶ ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োবৈশ্যস্ত্রয়োর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ এক জাতিস্ত শূদ্রো নাস্তিতু পঞ্চমঃ॥
মনুসংহিতা ১০।৪

বোয়ালিয়ার বাগদী সম্প্রদায় একই ; আকৃতিতে, ব্যবহারে, ধর্ম্মে, পান ভোজনেও একই। কিন্তু একদল মৎস্যজীবী, অন্যদল পালকী-বাহক। এইভাবে উহারা ব্যাবসায় ভেদ বশতঃ এক্ষণে পৃথক দুই জাতিতে পরিণত হইতে চলিয়াছে। এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় একত্রে পান ভোজন হয় না, বিবাহও হয় না। সুতরাং জেতৃ জীত সম্বন্ধ হইতে, কর্ম্মভেদ হইতে, বৈষম্য হইতে—এইরূপ নানা কারণ হইতে জাতিভেদ উৎপন্ন হইয়াছে। শ্বেতবর্ণ জেতৃগণ পূর্ব্ব হইতেই কর্ম্মভেদ বশতঃ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য জাতিতে বিভক্ত হইয়াছিলেন। পরে জীতগণকে শূদ্র নামে সমাজভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। আর তৎপর অনুলোম প্রতিলোমাদি বিবাহ বশতঃ এবং কাল্পনিক কারণে আরও জাতি উৎপন্ন হইয়াছিল। বিবাহ বশতঃই শ্বেত কৃষ্ণ বর্ণভেদ স্থায়ী হইতে পারে নাই। শ্বেতগণ মধ্যেও কৃষ্ণবর্ণ এবং কৃষ্ণবর্ণগণ মধ্যেও শ্বেতবর্ণ অপত্যজাত হইয়া উভয়ের বর্ণ মিশ্রিত করিয়া লইয়াছে। কিন্তু ইহাতে মেণ্ডেলের বিধান (Mendel's Law)* কতদূর রক্ষিত হইয়াছে, তাহা বলা যায় না।

যাহা হউক, সমাজ অনেক দূর উন্নত হইলে পরে এই প্রকার জাতিভেদ উৎপন্ন হয়। কিন্তু সমাজ উন্নত হইতে কতিপয় জৈবিক প্রক্রিয়া তাহার সহায়তা করে। পূর্ব্বে যে মানবীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের কথা বলিয়াছি, ঐ দল স্ত্রী পুরুষ দ্বারা গঠিত। তাহাদিগের অপত্য-শ্রেণী ক্রমে ঐ দল পুষ্ট ও রক্ষিত হইত। কিন্তু মানবীয় অপত্য অতি উপায়হীন অবস্থায় জন্ম গ্রহণ করে। উহারা তিন চারি মাস বয়স পর্য্যন্ত স্ববশে কিছুই করিতে সক্ষম হয় না। এমন কি, পাঁচ ছয় বৎসর বয়স না হইলে, উহারা সামান্য সামান্য বিপদ হইতেও আত্ম-রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। কতিপয় ইতর প্রাণীর অপত্য জন্মিবার পর হইতেই অল্লাধিক আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হয়। সুতরাং উহাদিগকে দীর্ঘকাল প্রতি-পালন করিবার প্রয়োজন হয় না। তাই তাহাদিগের মধ্যে দল থাকিলেও সাধারণতঃ পরিবার গঠন দেখা যায় না। মধুমক্ষিকা ও পিপীলিকাগণের মধ্যে এক একটী বাসায় যতগুলি জীব থাকে, তাহাদিগকে এক অর্থে পরিবার বলা যায়, সত্য ; কিন্তু সে কেবল স্ত্রী ও অপত্য পালন নিমিত্ত। উহাদিগের বাসায় এক একটী স্ত্রী থাকে, তাহারা ডিম্ব প্রসব করে এবং ক্লীবগণ সেই ডিম্ব সকলকে এবং তাহাদিগের মাতাকে পালন করে। ডিম্ব না ফাটা পর্য্যন্ত এই-

* পিতৃ মাতৃ লক্ষণ প্রথম বংশে মিশ্রিত হইয়া পর পর বংশে নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে পৃথক হওয়া।

রূপ নিয়মে কার্য্য হয়। তৎপর ডিম্ব হইতে অপত্য জাত হইলে আর তাহা আবশ্যক হয় না। অথবা, স্ত্রী জাতীয়টীর ডিম্ব প্রসব বন্ধ হইলে কিম্বা স্ত্রী মরিয়া গেলে পরিবারও ভাঙ্গিয়া যায়। তৎপর বানরগণের কথা উল্লেখ করিব। মানব-শিশুর ন্যায় তাহাদিগের অপত্যও অতি অসহায় অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয় এবং কিয়ৎকাল লালন পালনের অপেক্ষা করে। অথচ তাহাদিগের মধ্যে পিপীলিকাদিগের ন্যায় পরিবার গঠনের পূর্ব্বভাস পর্য্যন্ত দেখা যায় না। পিপীলিকাগণ অতীব বুদ্ধিমান; তাহাদিগের মস্তিষ্ক পদার্থের এক একটী অণুকে ডারুইন অতীব আশ্চর্য্যজনক বস্তু বলিয়া বিবেচনা করিতেন। † বানরের বুদ্ধিবৃত্তি উহাদিগের ন্যায় উন্নত নহে। তাহাদিগের অপত্য পালন করিতে হয় বটে, কিন্তু মস্তিষ্ক তাদৃশ উন্নত নহে। আমি বিবেচনা করি যে, অপত্য পালনের আবশ্যকতা এবং বুদ্ধি বৃত্তির উন্নতি একাধারে থাকিলে, সে জীব পরিবার গঠন করিবেই; তবে তাহা মানবীয় পরিবারের ন্যায় না হইতে পারে। কিন্তু কোন না কোনরূপ পরিবার গঠন করিবেই। আর সে পরিবারের প্রধান কেন্দ্রস্থল স্ত্রী জাতিই হইবে। যেমন পিপীলিকাদিগের মধ্যে হইয়াছে। মানবেরও প্রথম অবস্থায় (সে বড় বেশী দিনের কথা নহে) মাতৃত্ব মূলক পরিবার বিধান ছিল। ভারতীয় নায়ারগণ মধ্যে এখনও প্রায় তদ্রূপ আছে। এ সমাজে উত্তরাধিকারীত্ব পিতার দিক হইতে না হইয়া মাতার দিক হইতে হইয়া থাকে। যাহা হউক, পরিবার গঠন মাতৃত্বমূলক, সন্দেহ নাই। এ অবস্থায় স্ত্রীগণ দেশের সাধারণ সম্পত্তিবৎ ব্যবহৃত হইত। বহু-পতিত্ব তখন দোষাবহ ছিল না। কিন্তু বহু পতিত্বে অপত্যের সংখ্যা হ্রাস হয়, কারণ উহাতে ক্রমে জননহীনতা আনয়ন করে। একারণ এবং ঈর্ষাদি স্বাভাবিক বৃত্তি বশতঃ বিবাহ প্রথা অর্থাৎ একপতিত্ব সমাজ মধ্যে প্রচলিত হওয়া সম্ভব বোধ হয়। পরিবার একবার গঠিত হইলে বহু পরিবারের একতা সূত্রে অনায়াসেই প্রকৃত সমাজ গঠিত হয়। বহু পরিবারের স্ব স্ব প্ররোজন সিদ্ধির নিমিত্ত, নানাবিধ আদান প্রদানের সুবিধার নিমিত্ত, পরস্পরের আত্মরক্ষার ও কর্ম্ম সংশ্রবের নিমিত্ত, তাহাদিগের সংমিশ্রণে সমাজ আপনা হইতেই গঠিত

---

† The brains of the ant is one of the most marvellous atoms of matter in the world.

Descent of Man, 1906, page 81.

হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রথমে দল, তৎপরে জাতি, তৎপরে পরিবার, অবশেষে সমাজ উৎপন্ন হইয়াছে।*

কিন্তু সমাজ গঠনের মূল জৈবিক কারণ এখনও বলা হয় নাই।

এক কারণ অতি নিম্ন শ্রেণীস্থ জীব হইতে চলিয়া আসিতেছে। অতি ক্ষুদ্র এক-কোষ † জীবাণু হইতেও, সমাজ না হউক, অন্ততঃ দল বাঁধিবার প্রবৃত্তি দেখা যায়। উহাদের সমশ্রেণীস্থগণ অপর হইতে পৃথক হইয়া একত্রে অবস্থান করে। বিভিন্ন শ্রেণীস্থ কীটাণুদিগকে একপাত্রে পালন করিতে চেষ্টা করিলে দেখা যায় যে, যাহারা সমশ্রেণীর, তাহারা অপর হইতে পৃথকস্থানে সরিয়া যায় এবং একত্রে একস্থানে থাকে। ‡ গ্রিফিথস্ মনে করেন যে, উহারা আপন জাতিকে অন্য হইতে পৃথক বলিয়া বুঝিতে পারে। একথা সত্য হইলেও বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কারণ নাই। কিন্তু অতদূর অনুমান না করিলেও এ কথা বলা যাইতে পারে যে, ঐ ক্ষুদ্র জীবাণুগণের দেহেও জৈব বা রাসায়নিক * পদার্থের মধ্যে আকর্ষণ বিকর্ষণ আছে। যাহাদিগের দেহপদার্থে পরস্পরকে আকর্ষণ করে, তাহারা একদল হইয়া অপরের নিকট হইতে পৃথক হয়; পৃথক দলের দেহ পদার্থ সম্ভবতঃ পরস্পরকে বিক্ষিপ্ত করে। এইরূপ রাসায়নিক (অথবা বৈদ্যুতিক) আকর্ষণ বিকর্ষণের ফলে অতি নিম্ন জীব মধ্যে স্বতঃই দল উৎপন্ন হইতে পারে। কালক্রমে জীব যতই উন্নত হইতে লাগিল, তাহার দেহ গঠনের মূলীভূত জীব-বস্তুও † ততই বিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। এই সময়ে উক্ত আকর্ষণ বিকর্ষণের ফল অভ্যাসে পরিণত হইল; উহা-

* Elie Reclus এলি রেক্লাস্ এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা গ্রন্থে ৮ বালাম ৬১৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন যে, "Science is no longer of opinion that tribes and nations evolved from the family" অর্থাৎ পরিবার হইতে নেসন্ উৎপন্ন হয় নাই। তাহা সত্য হইলেও পরিবার হইতে সমাজ উৎপন্ন হয় নাই—এই কথা বলা যায় না। কারণ নেসন্ ও সমাজ একার্থবাচক নহে। এক নেসনে বিভিন্ন সমাজ থাকিতে পারে, এবং আছে। আমার মতে পরিবার হইতে নেসন না হইলেও, পরিবার হইতেই সমাজ হইয়াছে। কিন্তু tribe অথবা দল পরিবারের পূর্ব্ববর্ত্তী।

† Unicellular.

§ Grifith's micro-organisrms p. 120.

* Bio-chemical.

† Protoplasm.

দিগের ক্রিয়া জীববস্তুতে অঙ্কিত হইয়া গেল। ইহাই জীবের স্মৃতির মূল। এই বৃত্তি বংশানুক্রমে অন্যান্য উচ্চ বৃত্তি সকল আনয়ন করিল; ‡ সুতরাং যাহা প্রথমে আকর্ষণ মাত্র ছিল, তাহা উচ্চ জীবে প্রবৃত্তি রূপে পরিণত হইল। তখন ইহা ইন্দ্রিয়ের সহিত স্নায়ুমণ্ডলে অঙ্কিত হইয়া বংশপরম্পরাগত হইয়া উঠিল। এই মতের পোষকতায় পিপীলিকা আদি জীবের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। উহাদিগের দল তো আছেই। সমাজবন্ধনও আছে বলিয়া বিশ্বাস করি। এক এক দল অথবা সমাজ এক এক বাসায় বাস করে। বিভিন্ন বাসার পিপীলিকাগণ মধ্যে সর্ব্বদাই বিবাদ বিসম্বাদ, যুদ্ধ বিগ্রহাদিও হইয়া থাকে। এক দলের পিপীলিকা ধরিয়া অন্য দলের বাসায় রাখিলে ঐ দলের পিপীলিকারা তৎক্ষণাৎ উহাকে আক্রমণ ও বধ করে; কিছুতেই থাকিতে দেয় না। কিন্তু যদি ঐ দলের বাসার একটী পিপীলিকার গায়ের রস প্রথমোক্ত পিপীলিকাটীর গায়ে মাখাইয়া দেওয়া যায়, এবং তৎপরে উহাকে ঐ দলের বাসায় ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে উহারা আক্রমণও করে না, বধও করে না। বরং নিজ দলের বলিয়া বিবেচনা করতঃ সাদরে গ্রহণ করে। এ কথা অনেক বার পরীক্ষিত হইয়াছে। আমরা জানি, পিপীলিকার ঘ্রাণশক্তি অধিক। সুতরাং ইহা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে, স্ব-দলের দেহস্থ রসের গন্ধ দ্বারাই উহারা আপন চিনিয়া লয়। অন্যদলের পিপীলিকার দেহে উহারা পৃথক্ গন্ধ অনুভব করে; তাই অন্যদলের পিপীলিকাকে আক্রমণ করে। দেহের রাসায়নিক উপকরণের গন্ধ দ্বারা আপন পর চিনিয়া লওয়া, এইরূপে সাধ্য হয়। কুকুর, ব্যাঘ্র প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর জীবগণেরও ঘ্রাণশক্তি প্রবল; তদ্দ্বারা তাহারা আপন পর বুঝিয়া লইয়া সাবধান হইতে পারে। কুকুর, মেষ, গো প্রভৃতি নানা জাতীয় প্রাণীকে একত্র মিশাইয়া রাখিলেও স্ব-জাতীয়গণ একত্রে ও পর-জাতীয়গণ পৃথক অবস্থান করে। মানুষের মধ্যেও এ নিয়মের ব্যভিচার নাই। মানুষ মানুষের সহিত একত্র থাকিতে ইচ্ছা করে, ইতর-প্রাণীর সহিত বাস করিতে ইচ্ছা করে না। এমন কি, এক জাতীয় মানবেরা সেই জাতীয় মানবের নৈকট্য ভালবাসে, অপর জাতীয়ের নৈকট্য তাদৃশ ভালবাসে না। ইংরাজ ইংরাজের সহিত, বাঙ্গালী বাঙ্গালীর সহিত, চীনা চীনার সহিত থাকিতে ইচ্ছা করে। ইহার ব্যতিক্রম একবারেই হয় না, তাহা নহে। আমি গরুকে ও হাঁসকে একত্রে খেলা করিতে দেখিয়াছি; অনেকেই ইংরাজ ও বাঙ্গালীর

‡ Macnamara's Evolution and function of living purposive matter.

বিবাহ হইতে দেখিয়াছেন। এ সকল ব্যতিক্রম সত্ত্বেও সাধারণ নিয়ম এই যে, যাহারা সম-ভাবাপন্ন, তাহারাই একত্র থাকিতে অধিক ভালবাসে। এ প্রবৃত্তি কীটাণু হইতে মানব পর্য্যন্ত সকল জীবেরই দেখা যায়। উদ্ভিদগণ মধ্যেও সম-শ্রেণীর একত্র অবস্থানই সাধারণ বিধি। এই সকল কারণে আমার বিবেচনা হয় যে, সমাজবন্ধনের মূল জীব-জড় * উভয়ের প্রকৃতি মধ্যে নিহিত। কীটাণু মধ্যে যাহা রাসায়নিক ক্রিয়া মাত্র, পিপীলিকাদি মধ্যে তাহা ইন্দ্রিয় এবং মনে যুক্ত হইয়াছে; আর মানব মধ্যে উহাই ইন্দ্রিয় মন অতিক্রম করিয়া আধ্যাত্মিকভাবে পরিণত হইয়াছে। শুধু সঙ্গ হইতে আসঙ্গ-লিপ্সা, তাহা হইতে প্রেম। সমাজ-গঠনের ইহাই জৈবিক ইতিহাস। যদিও সমাজ উৎপন্ন হইবার পর হইতে উন্নত হইতেছে, তথাপি এখনও এই মূল প্রকৃতি ছাড়িয়া উঠিতে পারে নাই। এখনও যাহারা সমধর্ম্মী, তাহাদিগের উপরই প্রেম, প্রীতি, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা প্রবল; অপরের উপর তেমন নহে। ইংরাজ ইংরাজ-সমাজের সহিত যেরূপ প্রীতিপূর্ণ কর্ত্তব্যানুষ্ঠান করিবে, অন্যের উপর তদ্রূপ করিবে না। তেমনই প্রায় প্রত্যেক সমাজেরই ভাব অদ্যাপি লক্ষিত হইয়া থাকে।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, সমাজমধ্যে জাতি উৎপন্ন হইবার কারণ পরম্পরা এই :—সর্ব্বপ্রথমে জীবরাজ্যের নিম্নস্তরে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ; ইহার মূল সমধর্ম্মিতা এবং অসম-ধর্ম্মিতা। দ্বিতীয় কারণ সঙ্গ, যাহা প্রথমের ফল। তৃতীয় কারণ সহানুভূতি, যাহা সঙ্গের ফল। চতুর্থ কারণ কর্ম্ম অর্থাৎ কর্ম্মের সাদৃশ্য অথবা অসাদৃশ্য। ইহার প্রবর্ত্তক কারণ পরস্পরের সহানুভূতি ও প্রয়োজনসিদ্ধি! ইহা হইতে বিবিধ প্রকার সামাজিক গুণ জাত হইয়াছে। চতুর্থ কারণ প্রতিযোগিতা, বিবাদ, যুদ্ধবিগ্রহ এবং পরিণামে অল্লাধিক সংমিশ্রণের চেষ্টা। ইহার প্রবর্ত্তক কারণ অভাব, বাস্তবিক ও কাল্পনিক অভাব।

এই সকল প্রধান কারণ; আনুষঙ্গিক আরও কারণ আছে। ইহাদিগের মধ্যে কোনটী জন্মগত, কোনটী কর্ম্মগত। সুতরাং গুণ কর্ম্ম বিভাগবশতঃই যে জাতির উৎপত্তি হইয়াছে, এ কথা সত্য। জাতি শব্দের নানা অর্থ, কিন্তু যে অর্থই গ্রহণ করা যাউক, এ কথা অত্যন্ত সত্য।

---

* জড় সম্বন্ধে কিছু পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি।

নবম অধ্যায়।

মানব নিম্নতম জীব হইতে বিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমানে উচ্চ পদবী প্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং তাহার সকলই বিবর্ত্তনের ফল। তাহার খাদ্য, আবাস, পরিচ্ছদ, অলঙ্কার, দ্রব্যাদি, অস্ত্র-শস্ত্র, যান বাহন, আচার ব্যবহার এবং ধর্ম্ম বিশ্বাসও যুগে যুগে পরিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। তাহার সমাজবন্ধনও তদ্রূপই হইবে, ইহা সহজেই প্রতীয়মান হয়। সমাজবন্ধন প্রধানতঃ মনের অবস্থার উপর নির্ভর করে। মন, দেহের ন্যায়, বিবর্ত্তনের অধীন; দেহের ন্যায়ই পূর্ব্ব পুরুষ হইতে প্রাপ্ত অর্থাৎ বংশানুগত। দেহ ও মন আদিম কাল হইতেই পরির্ত্তনের অধীন হইয়া আসিতেছে। সুতরাং সমাজ-বন্ধনও তদ্রূপ হইবে, ইহা অন্য প্রমাণ ব্যতীতও অনুমান করা যাইতে পারে।

কিন্তু কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিবার আবশ্যকতা নাই। ইহা প্রত্যক্ষের বিষয়। আজি ধরাতলে বহু মানব বাস করিতেছে, ইহাগিকে পণ্ডিতগণ প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; শ্বেত, পীত ও কৃষ্ণ। সকলের মধ্যেই সভ্য অসভ্য, দুইই আছে। তথাপিও শ্বেতকায়গণ অধিকাংশই সভ্য, পীতগণও প্রায় তদ্রূপই, কিন্তু কৃষ্ণকায়গণ মধ্যে অধিকাংশ মানব অসভ্য, অল্পাংশ সভ্য। ইহাদিগের সংমিশ্রণে যে সকল মানব জাত হইয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে বিবিধ বর্ণই লক্ষিত হয়, এবং সভ্য অসভ্য উভয় প্রকারই দেখা যায়। নানা প্রকার মনেবের খাদ্য পরিচ্ছদাদিও নানাবিধ! ব্যাঙের ছাতা, গুগলি হইতে চাউল গধুম পর্য্যন্ত, আম মাংস হইতে সুপক্ক সুস্বাদু অন্ন পর্য্যন্ত, সকলই মানবের খাদ্য। দিগ্বসন হইতে পত্র বল্কল, চর্ম্ম, কার্পাস, রোম, রেশম, সকলই তাহার পরিচ্ছদ। অলঙ্কারও নানারূপ গঠিত হইতেছে; পত্র, পুষ্প, অস্থি, করোটী, শঙ্খ, শম্বুক, ধাতু দ্রব্য, হীরক, মণি, মুক্তা সকলই তাহার অলঙ্কার। গোযান হইতে মোটর গাড়ী ও এরোপ্লেন পর্য্যন্ত, মানবের যান; গো, অশ্ব, মহিষ, গর্দ্দভ, উষ্ট্র প্রভৃতি সকলই তাহার বাহন। আচার ব্যবহারও বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন প্রকার, ইহা প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। ধর্ম্ম-বিশ্বাসও মানব সমাজে বিভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে। ভূত, প্রেত, সাপ, ব্যাঙ, পশু, পক্ষী, গাছ পালা, পাহাড় পর্ব্বত, নদী-নালা, চন্দ্র সূর্য্য, গ্রহ নক্ষত্র হইতে অদ্বিতীয় অরূপ নিষ্কল

ব্রহ্ম পর্য্যন্ত সকলই মানব ঈশ্বর বোধে পূজা করিয়া থাকে। ঈশ্বরকে কেহবা খামখেয়ালী উপদ্রবকারী মাত্রই মনে করে, কেহবা ভাল মন্দ মিশাইয়া হিতকারী এবং অহিতকারী উভয় প্রকারই মনে করে; কেহবা নিয়ত মঙ্গলময় বিবেচনা করে। আবার কোন মানব মঙ্গলের এক ঈশ্বর, অমঙ্গলের অন্য ঈশ্বর কল্পনা করিয়া থাকে। এই সকল মতই পরিবর্ত্তনশীল, সুতরাং একরূপ হইতে সহজেই অন্যরূপে চলিয়া যায়, আবার এই সকল মত মিলিয়া মিশিয়া একটা অনির্দ্দিষ্ট ভাবও ধারণ করে; ইহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। পৃথিবীর নানাস্থান হইতে অস্ত্র, পরিচ্ছদ, অলঙ্কার, দ্রব্যজাত, ভূত প্রেতের মূর্ত্তি, দেব মূর্ত্তি ইত্যাদি অনেক সংগৃহীত হইয়াছে। সে সকল আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, মানব-সমাজ কোন বিষয়েই অপরিবর্ত্তিত নহে; সকল বিষয়েই যুগ যুগান্তর হইতে পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া চলিয়া আসিয়াছে, এবং এখনও পরিবর্ত্তিত হইতেছে।

এমন কোন সভ্য সমাজ নাই, যাহার মধ্যে প্রাচীন অসভ্য যুগের চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান নাই। সুসভ্য হিন্দুসমাজ সময়বিশেষে এখনও কলার ডোঙ্গা ভোজনপাত্র স্বরূপ ব্যবহার করেন, এবং কাষ্ঠ ঘর্ষণে অগ্নি উৎপাদন করিয়া থাকেন। এমন কোন সভ্য সমাজ নাই, যাহার অস্ত্র পরিচ্ছদাদি এখনও পরিবর্ত্তিত না হইতেছে। ঐ সকল ক্রমোন্নতির অধীন। সমাজ কখনই চিরদিন এক ভাবে থাকে না, উন্নতি অবনতি তাহার চির সহচর।

মানব, সুতরাং মানব সমাজ ত্রিবিধ সম্বন্ধের অধীন, (১) বাহ্য প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ, (২) অন্যান্য মানবের সহিত সম্বন্ধ, (৩) অতিপ্রাকৃতের সহিত সম্বন্ধ। সামাজিক বিবর্ত্তনের দিক হইতে এই কয়েকটী বিষয়ই সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

(১) বাহ্য প্রকৃতির সহিত মানবের প্রথম সম্বন্ধ খাদ্য বিষয়ে; পরে বাসগৃহ, দ্রব্যজাত, পরিচ্ছদ, যান বাহন ইত্যাদি যথাক্রমে মানবের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে।

খাদ্য। প্রাথমিক অবস্থায় মানব যখন কোন বস্তুই প্রস্তুত অথবা রন্ধন করিয়া আহার করিতে জানিত না, তখন উদ্ভিদ এবং প্রাণিগণের সঞ্চিত পদার্থ, * যাহা সহজেই সংগ্রহ হইতে পারিত, তাহাই তাহার আহার ছিল। সুসভ্য খ্রীষ্টান সমাজে এখনও পঙ্গপাল এবং বন্য মধুই সনাতন পবিত্র আহার বলিয়া

* যথা মধু।

গণ্য হয়। কিন্তু এরূপ আহার অতিশয় অনিশ্চিত, ইহার উপর নির্ভর করিয়া জীবনধারণ করা যায় না। তখন চেষ্টা পূর্ব্বক প্রাণী বধ করিয়া আহার সংগ্রহ করা আবশ্যক হয়। এই যুগ মৃগয়া-প্রধান। কিন্তু মৃগয়া নিরস্ত্রের কর্ম্ম নহে। অস্ত্রনির্ম্মাণ ব্যতীত এ উপায়ে সকল সময় আহার মিলে না; সুতরাং অস্থি, প্রস্তর, কাষ্ঠ ও ধাতু-নির্ম্মিত অস্ত্র যথাক্রমে উদ্ভাবিত হইল। অস্থি-প্রস্তর দ্বারা সূচ্যগ্রবৎ সর্কী, বল্লম, লাঠি, গদা প্রভৃতি অস্ত্র নির্ম্মাণ করা এবং পরবর্ত্তীকালে তাহার উপর নানাবিধ চিত্র অঙ্কিত অথবা খোদিত করা এত নিপুণ-হস্তের কার্য্য, এমন কৌশলের এবং মনোযোগের ফল, এরূপ একাগ্রতার পরিচায়ক এবং এতদূর সৌন্দর্য্য-বোধের পরিণাম যে, অসভ্যগণ তাহা কোথায় পাইল, ভাবিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। যাহা হউক, মানব মৃগয়া-যুগে এই সকল অস্ত্রদ্বারা পশু পক্ষ্যাদি বধ করতঃ কোনরূপে জীবন ধারণ করিত। কিন্তু এ উপায়েও সকল সময়ে ক্ষুন্নিবৃত্তির আশা করা যায় না। কোন দিন শিকার জুটিল, কোন দিন জুটিল না। তখন কিরূপে দেহ রক্ষা হইবে, ঈদৃশ চিন্তায় এবং শিকারে সাহায্য পাইবাব আশায়, মানব পশু পক্ষী ও উদ্ভিদগণকে গৃহপালিত করিতে আরম্ভ করে। ঐ সকল গৃহে সঞ্চিত থাকিলে অভাব-সময়ে ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য আর ব্যাকুল হইতে হয় না। মৃগয়া-যুগে মানব সর্ব্বদা একস্থানে বাস করিতে পারে নাই, শিকার পাইবার নিমিত্ত নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। অদ্যাপিও তদ্রূপ মানব-সমাজ দেখা যাইতেছে। কিন্তু যেদিন হইতে মানব উদ্ভিদকে গৃহপালিত করিতে আরম্ভ করে, সেইদিন কৃষিযুগের সূত্রপাত হয়। তাহার সমক্ষে গাছ হইতে মাটীতে বীজ পড়িয়া অন্য গাছ উৎপন্ন হইত, পতিত জমিতে পশুপক্ষীরা বীজ আনিয়া ফেলিলে গাছ জন্মিত। এ সকল সে সর্ব্বদাই দেখিত। তাহা হইতে কৃষিকার্য্যের মূল উত্তেজনা পাইতে অধিক দিন আবশ্যক হয় নাই। যাহা হউক, মানব যখন কৃষিকার্য্যে মনোযোগ দিতে আরম্ভ করিল, তখন হইতে আর পূর্ব্বের ন্যায় সর্ব্বদা বাসস্থান পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক হইল না; কৃষিকার্য্যের প্রয়োজন বশতঃই নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসবাস করিতে হইল। তখন হইতেই অবসর সময় জ্ঞান-চর্চ্চায় নিযুক্ত করা সম্ভব হইয়া উঠিল। এইরূপে মানব ক্রমে সভ্যতায় উন্নত হইতে লাগিল। কিন্তু যে কৃষিকার্য্য একদিকে মানব সমাজের উন্নতির প্রধান কারণ, তাহাই আবার কালক্রমে তাহাদিগের পতনেরও অন্যতর কারণ হইয়া উঠিল। কৃষক তাহার কর্ম্মের প্রয়োজন বশঃতই স্থিরস্বভাব বিশিষ্ট হয়; সুতরাং উদ্যম, সাহকিতা ও

পরিবর্ত্তনের স্থল কম হইয়া যায়। অভাব কমিয়া গেলে এ সকলই কম হয়। মৃগয়াপ্রিয় ব্যক্তি স্বভাবত উদ্যমশীল, সাহসী ও পরিবর্ত্তনে অক্ষুণ্ণ। কিন্তু কৃষক অন্য কোন গুরুতর কারণে বিশেষ উত্তেজিত না হইলে তাহার উত্তেজনার সম্ভাবনা থাকে না। অভাব কমিবার সঙ্গে সঙ্গেই জীবন-সংগ্রামও কমিয়া আসে, সুতরাং উন্নতি স্থায়ী হইতে পারে না। কৃষিকার্য্য-প্রধান সমাজ প্রথমে ক্রমেই উন্নত হয়, কিন্তু সেই উন্নতি হইতেই কাল সহকারে নিরুদ্যম ও জড়তা আসিয়া উপস্থিত হয়, ইহা বর্ত্তমান সভ্য সমাজ সকলের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলেই হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে।

আবাস। শীতাতপ ঝড়বৃষ্টি হিংস্রজন্তু ইত্যাদি হইতে আত্মরক্ষা ও অপত্যরক্ষা করিবার নিমিত্ত, খাদ্য দ্রব্যাদি সঞ্চয় করিবার নিমিত্ত, বাসগৃহ আবশ্যক হইয়াছিল। কিন্তু প্রথমে মানব স্বয়ং তাহা নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হইত না। প্রকৃতি-নির্ম্মিত পর্ব্বতগুহা, বৃক্ষকোটর বা বৃক্ষশাখা প্রভৃতি তাহার প্রথমাবাস। পরে প্রস্তর, বংশদণ্ড, পত্রপল্লব, কাষ্ঠ, ইষ্টক, ধাতু, কাচ, স্ফটিক প্রভৃতি দ্বারাও আবাস নির্ম্মিত হইতেছে। সৌন্দর্য্য-বোধ ও বিলাসিতা যতই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, আবাসও ততই নানাবিধ মনোরম আকার ধারণ করিতেছে। সৌন্দর্য্যবোধ অতি নিম্নশ্রেণীর জীবেও দেখা যায়, সুতরাং মানবেও প্রথম হইতেই বর্ত্তমান ছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই।

দ্রব্য। মানব যখন প্রথমে দ্রব্য ব্যবহার করা আবশ্যক বোধ করিয়াছিল, তখন প্রকৃতির নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করা ভিন্ন উপায়ান্তর ছিল না; কারণ তখন তাহার নিজের নির্ম্মাণ-কৌশল ছিল না বলিলেই হয়। তাই, লাউয়ের বস্, কুমড়ার ত্বক্, সুপারীর খোলা, কলার ডোঙ্গা, গাছের গুঁড়ির খোল, বাঁশের চোঙ্গা ইত্যাদি উদ্ভিদজাত পদার্থ, অথবা জন্তুর ত্বক্, অস্থি স্নায়ু, শিরা প্রভৃতি প্রাণীজাত পদার্থ, কিম্বা প্রস্তর খণ্ড, মাটীর ঢিপি প্রভৃতি পার্থিব পদার্থ তাহার প্রথম অবস্থার দ্রব্য ছিল। যখন সে চেষ্টা পূর্ব্বক দ্রব্যাদি নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করে, তখন হইতে প্রস্তর, মৃত্তিকা, অস্থি, কাষ্ঠ, ধাতু ইত্যাদির দ্বারা বিবিধ দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে। অসভ্যগণ অনেকস্থলে বৃক্ষত্বকে কিম্বা মৃণ্ময়দ্রব্যে যেরূপ চিত্র ও অন্য প্রকার শিল্পকার্য্য করে, তাহা দেখিলে তাহাদিগকে আর অসভ্য বলিতে ইচ্ছা হয় না।

পরিচ্ছদ। সৌন্দর্য্য বোধ হইতেই পরিচ্ছদের উৎপত্তি, শীতাতপ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য নহে। মানব অলঙ্কার-স্বরূপেই প্রথম পরিচ্ছদ

ব্যবহার করে; শীতগ্রীষ্মের সহিত পরিচ্ছদের গুরুতর সম্বন্ধ নাই; অন্ততঃ প্রথম অবস্থায় নিশ্চয়ই ছিল না। ফিউজিয়ানগণ অত্যন্ত শীত-প্রধান তুষারাবৃত দেশে বাস করে, তথাপিও তাহারা প্রায় সম্পূর্ণ উলঙ্গ। বুসমেন্, টুরেগ, নিলো-টীক্ জাতি সমূহ গ্রীষ্ম প্রধান আফ্রিকা দেশে পুরুষ-পরম্পরায় বাস করিতেছে, উহারাও প্রায় উলঙ্গ। পরিচ্ছদ শীতাতপ নিবৃত্তির নিমিত্ত উদ্ভাবিত হয় নাই।* যে সৌন্দর্য্য-বোধ অতি নিম্ন জীবেরও আছে, প্রাথমিক মানব সেই প্রবৃত্তির উত্তেজনাতেই দেহের কতিপয় স্থান লতা, পাতা, উদ্ভিদ তন্তু, জন্তুর রোঁয়াল, পক্ষ, পালক, দন্ত, কপাল, শঙ্খ, শম্বুক ইত্যাদি উদ্ভিদজাত এবং প্রাণীজাত পদার্থ-দ্বারা সজ্জিত করিয়া আসিতেছে। হস্ত, পদ, বক্ষঃ, পৃষ্ঠ, কটি ও তন্নিম্ন স্থান এবং মস্তক অলঙ্কারেরও স্থান, প্রথমিক পরিচ্ছদেরও স্থান। বোধ হয়, সর্ব্ব-প্রথম পরিচ্ছদ মস্তকেই ব্যবহৃত হয়। যে অসভ্যের সমস্ত দেহ নগ্ন, তাহাদিগের মধ্যেও কতিপয়ের মস্তকে পক্ষ, পালক অলঙ্কারের কার্য্য করে এবং নানাবিধ বীভৎস মুখোশ অথবা শিরস্ত্রাণ অলঙ্কার এবং পরিচ্ছদ, উভয়েরই কার্য্য করিয়া থাকে। অসভ্যগণ বৃক্ষপত্র অথবা বল্কল প্রথমতঃ অলঙ্কার, পরে আবরণ রূপে কটিতে এবং তন্নিম্নে ধারণ করে। ইহা হইতেই ক্রমে একটা লজ্জাশীলতার ভাব আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন নানাবিধ পরিচ্ছদ উদ্ভাবিত হয় এবং কাল-ক্রমে বিবিধ কারণবশতঃ তাঁহার অনেক উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে। শীতাতপ হইতে আত্মরক্ষা করাও এই সকল কারণের অন্যতর।

কিন্তু মানবজাতি লজ্জা নিবৃত্তির সহিত স্বাস্থ্য-বিধান ও সৌন্দর্য্যের মিলন করিয়া, উত্তম পরিচ্ছদ ধারণ করিতে অদ্যাপি শিক্ষা করে নাই। সভ্য মানব বর্ত্তমান সময়ে যদিও শীতাতপ, বৃষ্টি প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া পরিচ্ছদ রচনা করিবার নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছে, কিন্তু স্বাস্থ্য অথবা লজ্জাশীলতার দিকে এখনও বিশেষ দৃষ্টি পড়ে নাই। কোন কোন দেশে সভ্য সমাজেও নৃত্যগীত, নৈশভোজ ইত্যাদি ব্যাপারে লজ্জাশীলতা পরিত্যাগ করাই যেন পরিচ্ছদ ধার-ণের প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া উঠিয়াছে। এখনও মানবসমাজ পরিচ্ছদ ধারণ করিতে সৌন্দর্য্যের দিকে যত দৃষ্টি রাখে, অন্য দিকে তাদৃশ নহে।

---

* From the immense variety of objects attached as ornaments to the head and body arose clothing* * * climate naturally has a certain influence in determining the development of clothing. but it is not the paramount cause Ibid p. 25.

পরিচ্ছদে কার্য্যোপযোগীতাও লক্ষ্য রাখা হয়। সৈনিকের পরিচ্ছদ একরূপ, কৃষকের অন্যরূপ। কিন্তু এই কারণ অতি সামান্য মাত্র ফলোৎপাদন করে, তাহাও সাময়িক মাত্র।

যান বাহন। প্রথমে কি নিমিত্ত যান বাহন উদ্ভাবিত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে। আমার বোধ হয়, মৃগয়া-যুগে একস্থান হইতে অন্যস্থানে বাস পরিবর্ত্তন উপলক্ষে, শিশু সন্তানদিগকে এবং দ্রব্য সম্ভার বহন করিবার নিমিত্ত গৃহপালিত পশু প্রথমে বাহন স্বরূপে ব্যবহৃত হয়। এই কারণবশতঃই পরবর্ত্তী সময়ে প্রথম যান নির্ম্মিত হইয়াছিল। তৎপর শিকার বহন, শস্য বহন, অবশেষে প্রাপ্ত বয়স্কদিগের গতায়াতের নিমিত্তও ইহা ব্যবহৃত হইতেছে। ইহা এখন নিত্য নূতন প্রকার গঠিত হইতেছে। বাষ্পীয় ও বৈদ্যুতিক শকট, বাষ্পীয় পোত এবং এরোপ্লেন, বাইওপ্লেন প্রভৃতি নিত্যই নূতন রূপ নির্ম্মিত হইতেছে! কালক্রমে পদযুগল থাকা না থাকা সমান হইয়া উঠিতে পারে; এরূপ আশঙ্কা করিবার কারণ উপস্থিত হইয়াছে।

(২) এক্ষণে অন্যান্য মানবের সহিত সংশ্রবের কথা আলোচনা করা আবশ্যক। বর্ত্তমান কালের অসভ্য এবং সভ্য সমাজ, উভয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, বুঝা যায় যে, এক বীজ পুরুষের সন্তান সন্ততিগণ সংখ্যায় যতদিন অল্প থাকে, ততদিন একত্রে বাস করিতে পারে, কিন্তু কালে সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় পৃথক হইয়া যায়। ইহাতেই বহু গোষ্ঠী উৎপন্ন হয়। এই সকল গোষ্ঠী হইতে ক্রমে দল, জাতি, পরিবার ও সমাজ কিরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। যাহা হউক, কাল ক্রমে এক-বীজ পুরুষের কথা ভুলিয়া গিয়া বিভিন্ন গোষ্ঠী বিভিন্ন ভাবের উৎপত্তি কল্পনা করে। যাহারা প্রকৃতপক্ষেই বিভিন্ন বীজপুরুষ হইতে জাত, তাহারা তো তদ্রূপ কল্পনা করিবেই! কিন্তু এই সকল কল্পনার মধ্যে এক আশ্চর্য্য-জনক ভাব সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। প্রাথমিক সমাজ, কি জানি কি অবোধ-গম্য কারণে, মানবেতর উৎপত্তি-কল্পনা করিতেই ভালবাসে। সর্ব্বত্রই অসভ্যসমাজে মানবতের জন্মবাদ * শুনিতে পাওয়া যায়। বন্ধুবর রমাপ্রসাদ চন্দ এবং আমি "বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির" কার্য্যোপলক্ষে কতিপয় সাঁওতালকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তাহারা কেহবা হংস হইতে জাত, কেহবা হরিণ হইতে জাত, ইত্যাদি বলিয়াছিল। গোদাগাড়ী ও মালদহ-প্রদেশে সাঁওতালের সংখ্যা বেশী নহে; তাহারই মধ্যে আট নয়

* Totemism.

দলের সন্ধান পাইলাম। ইহাদিগের একদলও নিজদিগকে মানুষ বীজপুরুষ হইতে জাত বলিয়া বিশ্বাস করে না। প্রথম অবস্থায় মানব পশু পক্ষী, গাছ পাথর, গ্রহ নক্ষত্র হইতেই উৎপন্ন হওয়া বিশ্বাস করে। এই অদ্ভুত বিশ্বাসের ফলে এই হয় যে, যাহারা এক বীজ-পদার্থ হইতে জাত বলিয়া আত্মপরিচয় দেয়, তাহাদিগের মধ্যে প্রায়ই বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়া যায়, এবং বীজপদার্থ অভক্ষ্য হয়। যে হরিণ হইতে জাত, সে হরিণ খায়না; যে হাঁস হইতে জাত, সে হাঁস খায় না; এইরূপ। কিন্তু এইরূপ স্থলে বিবাহ-নিষিদ্ধ সর্ব্বত্র দেখা যায় না। কোন কোন স্থলে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির নিমিত্ত আগ্রহ-সহকারে এক-বীজের সন্তান সন্ততি মধ্যেও বিবাহ হইয়া থাকে। যাহারা একবীজোদ্ভূত বলিয়া বিবাহ নিষিদ্ধ মনে করে, তাহারাই কালে যখন গোত্র গঠিত করে, তখন এক গোত্র মধ্যেও ঐ নিষেধ-প্রচলন করিয়া থাকে। স্বগোত্র বিবাহ নিষিদ্ধ হইবার মূলে মানবেতর জন্মবাদ আছে বলিয়া বোধ হয়। ভক্ষ্যাভক্ষ্য নির্ণয়ের মূলেও একবারেই নাই, তাহা নহে। ভিন্ন দল হইতে স্ত্রীসংগ্রহ করিবার প্রথাই কখন কখন আসুর অথবা পৈশাচ বিবাহে পরিণত হয়। কারণ যখন সহজে স্ত্রী সংগ্রহ হয় না, তখন বলপূর্ব্বক কাড়িয়া আনিতে হয়। মানবধর্ম্ম-শাস্ত্র প্রণয়নকালেও ইহার পরিচয় পাওয়া যায়।*

পূর্ব্বে বাহ্য-প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ আলোচনার সময়ে পরিচ্ছদ অলঙ্কারাদি বিষয়ে দেখাইয়াছি যে, ঐ সকল মানবের সৌন্দর্য্য বোধ হইতেই প্রধানতঃ উৎপন্ন হইয়াছে। এস্থলে বলা আবশ্যক যে, সৌন্দর্য্য-বোধ দাম্পত্য ভাবেরই সহায়ক। নর-নারী পরস্পরকে আকর্ষণ করিবার নিমিত্তই প্রধানতঃ সুন্দর দেখাইবার চেষ্টা করে। সুতরাং এ সকলও বিবাহের সহিতই সংসৃষ্ট। পরিচ্ছদ অলঙ্কারাদি (১) প্রথম বিভাগে আলোচনা করিয়াছি, (২) দ্বিতীয় বিভাগেও আলোচিত হইতে পারিত।

যাহা হউক, স্ত্রী সংগ্রহ এবং আহার-সংগ্রহের নিমিত্তই মানবীয় একদল অন্যদলের সহিত সংশ্রবে আসিয়াছিল। কোন দেশে বহু দল বাস করিতে করিতে কালক্রমে আহার্য্য-সমগ্রীর অভাব অনুভব করে। কালে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হইলে এ ফল হইবেই। সুতরাং একদলের সহিত অন্য দলের আহার্য্য লইয়া বিবাদ বিসম্বাদ হওয়া অনিবার্য্য। এখনও যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রধানতঃ বাণিজ্য-মূলক। কিন্তু সেকালে স্ত্রী সংগ্রহার্থেও যুদ্ধ বিগ্রহ কম হয় নাই।

---

* মনুসংহিতা ৩।২১

ব্যক্তি। প্রাথমিক সমাজে ব্যক্তির স্থান কোথায় ছিল, ও তাহার প্রভাব কিরূপ ছিল, তাহা এক্ষণে বিবেচনা করা আবশ্যক। আমরা দেখিয়াছি, ঐ সমাজ আহার ও স্ত্রী সংগ্রহার্থ কলহ-বিবাদ, যুদ্ধ-বিগ্রহ করিতে বাধ্য হইত। এ নিমিত্ত দলপতির সম্পূর্ণ আজ্ঞাধীন থাকা প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ত্তব্য কর্ম্ম ছিল। বিগ্রহ-প্রধান সমাজে দলপতির আজ্ঞা বিনা-বিচারেই আশু প্রতিপাল্য। এখনও যুদ্ধকালে সেনাপতির আদেশ ঐ ভাবেই পালন করিতে হয়, নচেৎ কঠিন দণ্ড ব্যবস্থা হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় ব্যক্তি নগণ্য, সমাজই প্রভু; সমাজের হিতার্থে দলপতিই সর্ব্বেসর্ব্বা। দলের পরকালে পরিবার ও সমাজ জাত হইয়াছে; সুতরাং পরিবারের কর্ত্তা এবং সমাজের প্রভু * এতদুভয়েও দলপতির ন্যায় মাননীয় হইয়াছেন। ইঁহাদিগের আদেশও বিনা-বিচারে অবশ্য পালনীয় হইয়াছে। প্রথমাবস্থায় দলপতির বিবর্ত্তনে কর্ত্তা ও রাজা, এইরূপই হওয়া স্বাভাবিক। বর্ত্তমান যুগে উভয়েরই আরও বিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে। ইঁহাদিগের আজ্ঞা এখন আর বিচারের বহির্ভূত নহে, বিনা বিচারে তৎক্ষণাৎ পালনীয় বলিয়া স্বীকৃত হইতেছে না। কোথাও বা কর্ত্তা অথবা রাজার লোপ হইয়াছে। যেখানে এজমালী পরিবারে বহুব্যক্তি একত্র বাস করার প্রথা উঠিয়া গিয়াছে, সেখানে পূর্ব্ববৎ কর্ত্তা আর নাই। যে দেশে রাজশক্তি ব্যক্তিগত নাই, তথায় উহা সমাজ মধ্যে বিস্তৃত হইয়াছে, রাজপদ লুপ্ত হইয়াছে। এইরূপে ব্যক্তিত্বের প্রসার বৃদ্ধি হইতেছে এবং দলপতির, পারিবারিক কর্ত্তার ও সমাজপতি-রাজার অপ্রতিহত প্রভুত্ব, যাহা সামরিক-যুগের উপযোগী ছিল, যাহা সমাজের প্রথমাবস্থায় অত্যাবশ্যক ছিল, তাহা এখন হ্রাস হইতেছে। ইহা বিবর্ত্তনের ফল, সামাজিক বিবর্ত্তনে এফল হইবেই, কারণ ইহা মৌলিক সমাজ-নীতিরই ক্রমবিকাশ। সে নীতি, সমাজের মঙ্গল। প্রাথমিক সমাজে দলপতির আদেশ যে বিনা বিচারে প্রতিপালিত হইত, তাঁহার প্রভুত্ব যে অপ্রতিহত ছিল, তাহাও সমাজের হিতার্থে; আর এযুগে সর্ব্বত্রই যে রাজশক্তি হ্রাস হইয়া সমাজশক্তির বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাও সমাজের হিতার্থেই। এক মূলসূত্রই বিবর্ত্তনের নিয়মানুসারে নানাভাবে আত্ম-প্রকাশ করিতেছে। উহার গতিরোধ করিবার সাধ্য বোধ হয় কাহারও নাই; চেষ্টা করিলেও সুফল উৎপন্ন হইতে পারে না। বিনয়, কৃতজ্ঞতা, ভক্তি প্রভৃতি সদ্‌গুণের সহিত উহার সামাঞ্জস্য রক্ষা করতঃ, পরিবার বা সমাজের হিতার্থে

* রাজা।

ব্যক্তির প্রভাবকে সংকোচিত করিয়া ঐ প্রভাব পরিবার বা সমাজ মধ্যে বিস্তৃত করা আবশ্যক, কেন্দ্রীভূত আর থাকিতে পারে না। সকল শক্তিই এক অনাদি অদ্বিতীয় শক্তির অংশমাত্র; একথা যিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনি বুঝিবেন যে, "যাহা একছিল, তাহাই বহু হইয়াছে।" সামাজিক-শক্তিও আদিতে এক ছিল, এখন বহুবিস্তৃত হইতেছে এবং হইবে। ইহাই প্রকৃতির মূল সূত্র।

প্রথমে উল্লেখ-যোগ্য স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তিই পরিবারের অথবা সমাজের ছিল, ব্যক্তির নহে; এখনও অসভ্য-সমাজে এবং কোন কোন সভ্য-সমাজেও তদ্রূপ ব্যবস্থা বর্ত্তমান আছে। মিতাক্ষরা-শাসিত সুসভ্য হিন্দুসমাজে এখনও ব্যক্তিত্বের বেশী বিকাশ হয় নাই, সম্পত্তি ব্যক্তির নহে, দানবিক্রয়াদি সকল সময়ে ব্যক্তির অধিকারভুক্ত নহে। দায়ভাগ-শাসিত বঙ্গদেশে ব্যক্তিত্বের অধিকতর বিকাশ হইয়াছে। যাহা হউক, নিতান্ত অসভ্য-সমাজেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্পত্তি ব্যক্তির বলিয়া স্বীকৃত হয়। নিজের ও সমাজের অধিকার আদিকাল হইতে যেরূপ মৌলিক ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে, তাহা সমাজ-তত্ত্ববিৎ ডেনিকার সুন্দর ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন, "আমি নিজ হস্তে এই পাথরখানি হইতে অস্ত্র গড়িয়াছি। সুতরাং ইহা আমার"—এইরূপ ভাব হইতে স্বাধিকার উৎপন্ন হয়। আর "আমার স্ত্রী পুত্রাদির সাহায্যে আমি এই গৃহখানি নির্ম্মাণ করিয়াছি; অতএব ইহা সমস্ত পরিবারের"—এইরূপ ভাব হইতে পারিবারিক অধিকার স্বীকৃত হয়। আর "আমি সমস্ত দলবলের সহিত একত্রে এই সকল পশু পক্ষী শিকার করিয়াছি, অতএব এ সকল সমস্ত দলের সম্পত্তি"—এইরূপ ভাব হইতেই সমগ্র দলের বা সমাজের অধিকার স্বীকৃত হয়।* ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, অধিকারের মূল, কর্ম্ম অথবা চেষ্টা। যাহা ব্যক্তির নিজ চেষ্টায় সিদ্ধ হয়, তাহা ব্যক্তির; যাহা পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের সমবেত চেষ্টায় সিদ্ধ হয়, তাহা পরিবারের; আর যাহা সমাজস্থ বহু ব্যক্তির চেষ্টায় সিদ্ধ হয়, তাহা সমাজের এজমালী সম্পত্তি। এই ভাবের বিকাশেই ব্যক্তির এবং সমাজের অধিকার পৃথক হইয়া যায়। কিন্তু এস্থলে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, ব্যক্তির সমষ্টিতেই সমাজ গঠিত। সুতরাং ব্যক্তিকে যদিও সমাজের অধীনে থাকিতেই হইবে, এবং থাকাও অশেষ প্রকারে মঙ্গলজনক, তথাপি ব্যক্তিকে একবারে চাপিয়া

* Hand Book to Ethnograpoical collections, British Museum. p 25.

মারিলে সমাজ অধঃপতিত হইবেই। ব্যক্তিকে সর্ব্ব বিষয়ে অথবা বহুবিষয়ে সমাজের সম্পূর্ণ অধীন করিয়া ফেলিলে অথবা সম্পূর্ণরূপে সমাজের মুখাপেক্ষী করিয়া তুলিলে, ব্যক্তি জড়ত্ব প্রাপ্ত হইবে, সুতরাং সমাজও তদ্রূপই হইবে। ইহা কোন ক্রমেই বাঞ্ছনীয় নহে।

ব্যক্তিকে সমাজের অধীন হইতেই হইবে, কিন্তু তাহার ব্যক্তিত্ব নষ্ট করিতে হইবে না। এই উদ্দেশ্যে ব্যক্তিকে সকল বিষয়েই স্বাধীনতা দেওয়া হইতেছে; কেবল সমাজদ্রোহীতা করিলে দণ্ডের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। সমাজহিতে পুরস্কার, অহিতে দণ্ড। কিন্তু প্রাথমিক সমাজে পুরস্কারের ব্যবস্থা তত থাকে না। দণ্ডের ব্যবস্থাই প্রধান। সে সমাজে দণ্ডও অতিশয় গুরুতর। কিন্তু সমাজ যতই উন্নত হয়, লোক-চরিত্র যতই অধিক মাত্রায় আলোচিত ও পরিজ্ঞাত হয়, দণ্ডের মাত্রাও ততই কমিয়া আসে। গুরুতর দণ্ডবিধান তখন অসভ্যতার পরিচায়ক বলিয়া বিবেচিত হয়। দুশ্চরিত্রগণের অত্যাচার হইতে সমাজ আত্মরক্ষা করিতে সম্পূর্ণ অধিকারী, তজ্জন্য সমাজের সংশ্রব হইতে উহা-দিগকে দূরে রাখিবার অধিকারও সমাজের অবশ্যই আছে। কিন্তু যাহাতে ঐ সকল ব্যক্তি আরও দুরাচারী হয়, এরূপ সংশ্রবে ও স্থানে উহাদিগকে আবদ্ধ করিবার সমাজের কোন অধিকার নাই। বর্ত্তমানকালে কারাগার সকল যে প্রণালীতে রক্ষিত হইতেছে, উহা সমাজের অমঙ্গলজনক। ওরূপ ভাবে অপরাধিগণকে রাখিবার সমাজের কোন অধিকার নাই। ফলেও দেখা যাইতেছে যে, বহু ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ দণ্ডিত হইয়াও অপরাধের কার্য্য করিতেছে। ভারতীয় দণ্ডবিধি আইন অতিশয় ভয়ঙ্কর, ঈদৃশ ভয়ানক বিধি দ্বারা সমাজের উপকার অপেক্ষা অপকারই অধিক হইয়া থাকে। জীবনে একটু স্থিতি স্থাপকতা, সাহসিকতা, এমন কি, একটু অশান্তিপ্রিয়তাও আবশ্যক; তাহাকে কঠিন রাজবিধি দ্বারা নিষ্পেষিত করিলে শান্তিরক্ষা হইতে পারে, কিন্তু ব্যক্তি-ত্বের বিকাশ হয় না। সমাজ ক্রমে জড়ত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে। এই রক্ত-প্রলিপ্ত আইন অচিরে সংশোধিত হওয়া উচিত।

যাহা হউক, দণ্ড বিধানের পূর্ব্বে বিবেচনা করা আবশ্যক যে, ব্যক্তির অপ-রাধ কতটুকু। ব্যক্তি বংশানুক্রম ও পরিপার্শ্বিক অবস্থার ফল। কিন্তু উহার জন্য কি সে স্বয়ং দায়ী? মানব সমাজের আদিকাল হইতে এ পর্য্যন্ত ইহা যথা-যোগ্য ভাবে বিবেচিতই হয় নাই। রাম ক্রোধী, অতিশয় উদ্ধত! সে শ্যামকে হত্যা করিয়াছে। সে যে ক্রোধী হইয়াছে; ইহা কি তাহার দোষ? হয়ত

তাহার কোন পূর্ব্ব পুরুষ তদ্রূপ ছিল, হয়ত উন্মাদ ছিল। এমত অবস্থায় সমাজ সে ব্যক্তিকে বিবাহ করিতে দিয়াছে, তাহার বিবাহের দিনে আনন্দ উৎসব করিয়াছে, উদর পূর্ণ করিয়া দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার নিষ্পন্ন করিয়াছে; শুধু তাহাই নহে। তাহার সন্তান সন্ততি উৎপাদনের কোনরূপ বাধা দেয় নাই, বরং উত্তেজিত করিয়াছে। সে ব্যক্তির সন্তান ক্রোধী এবং উদ্ধত হইবেইতো। বংশানুক্রমের নিয়ম নিবৃত হইবার নহে। যে সমাজ উন্মত্তকে বিবাহ দিয়াছে, সেই উন্মত্তের উদ্ধত সন্তান নরহত্যা করিলে ঐ সমাজের আপত্তি করিবার কি দণ্ড দিরার কোন অধিকার নাই। বালবিধবা ভ্রূণহতা করিতেছে। সমাজ তাহার প্রাণদণ্ডের অথবা নির্ব্বাসনের আজ্ঞা দিতেছেন। আমি বলি, এরূপ করিবার সমাজের কোন অধিকার নাই। সেই বালবিধবা হয়ত এরূপ বংশজাত এবং এরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে প্রতিপালিত যে, সে ভ্রূণহত্যা না করিয়াই পারে না। এরূপ স্থলে শাস্তির উদ্দেশ্যে দণ্ড দিবার কোন অর্থই নাই। ইহাতে দুরাচার দিবৃত্ত হইতে পারে না। সমাজের শাসনকর্ত্তা বংশানুক্রমের ও পরিপার্শ্বিক অবস্থার কথাটা বিবেচনা না করিয়াই দণ্ডবিধি প্রণয়ন করেন। অথচ ঐ দুই-এর উপরেই মানবের সকল কর্ম্ম নির্ভর করে। ইহা অসঙ্গত। সেই জর্ম্মান রমণীর কথা স্মরণ করুণ। ৭৫ বৎসর মধ্যে তাহার বংশে কেবল বদমায়েস, খুনী, ভ্রষ্টা ইত্যাদি জন্মগ্রহণ করিল; কারণ সে নিজে অতি দুশ্চরিত্রা ছিল; রাজকোষ হইতে তাহার বংশধরগণের নিমিত্ত ঐ কাল মধ্যে প্রায় ৪০,০০,০০০ মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল। ইহাদিগকে সমাজ পুনঃ পুনঃ দণ্ডিত করিয়াছে। কিন্তু ফল কি হইয়াছে? যাহারা পুনঃ পুনঃ দণ্ডিত হয়, তেমন দাগীদিগকে পর পর বারে উত্তরোত্তর অধিক দণ্ড দেওয়া হইয়া থাকে। অনেক স্থলে এরূপ করায় ফল তো হয়ই না, বরং আরও কুফল হয়। জীব-বিজ্ঞানের বিধান সকল যতই পরিজ্ঞাত হইতেছে, বংশানুক্রমের নিয়ম সকল যতই আলোচিত হইতেছে, ততই সমাজ সম্বন্ধে (শুধু দণ্ড বিষয়ে নহে) অনেক বিষয়ে প্রাচীন সংস্কার সকল বিশেষ ভাবে পরিবর্ত্তিত করা অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। সমাজের, সুতরাং সমাজের প্রভুর অর্থাৎ রাজার অথবা রাজস্থানীয় ব্যক্তিগণের, এক্ষণে মহাপরীক্ষার সময় উপনীত হইয়াছে। তাঁহারা অন্যদিকে যাহাই কেন করুন না, সে সকল কিছুই নহে। তাঁহাদিগের একমাত্র কর্ত্তব্য কর্ম্মই হইতেছে, দেহে ও মনে সুস্থ ব্যক্তি গঠন করা।* ব্যক্তির প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি বিধানই তাঁহা-

---

*Pearson's The Scope and Importance to the state of the science of National Eugenics p 9.

দিগের একমাত্র মুখ্য কর্ম্ম। যে সমাজ বা সমাজের প্রভু এই কর্ত্তব্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে অক্ষম, তিনি বা তাঁহারা ঐ পদের যোগ্য নহে। তাঁহারা মহা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। প্রথমে নির্দ্দিষ্ট বিচারক ছিল না, * সমাজই দণ্ডবিধান করিত; পরে সমাজ যতই উন্নত হইতে লাগিল, ততই দলপতি, রাজা এবং প্রাড়্‌বিবাক যথাক্রমে এই গুরুতর কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন। সুতরাং ইহার অসম্পূর্ণতার দায়ীও তাঁহারাই।

মানুষই সমাজের একমাত্র সম্পত্তি। এই সম্পত্তি গেলে আর কিছুই থাকে না। মানুষ যদি অধঃপতিত হইল, তাহা হইলে সমাজ কিছুতেই উন্নত থাকিতে পারে না। সমাজের প্রভুর অর্থাৎ রাজার প্রধান কার্য্যই যদি সমাজের হিত সাধন হয়, সমাজকে অধঃপতন হইতে রক্ষা করা এবং তাহার উন্নতি বিধান করা যদি তাঁহার কর্ত্তব্য হয়, তবে মানুষ গড়াই রাজার প্রধান কর্ম্ম, দেহ ও মনে উন্নত মানব গঠিত করাই তাঁহার একমাত্র কর্ম্ম। মানুষ বংশানুক্রম এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বারা নিয়মিত। সুতরাং এই দিকে সুব্যবস্থা করাই রাজার একমাত্র কর্ম্ম। বংশানুক্রম বিবাহ-বিধির উপর নির্ভর করে। এই নিমিত্তই বিবাহ বিষয়ক বিধি নিষেধ প্রণয়ন করা, ও তাহা সমাজ কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হয়, তৎপ্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। শিক্ষা, সংসর্গ ইত্যাদি পারিপার্শ্বিক অবস্থা; সুতরাং ইহারও উন্নতি বিধান করা তাঁহার গুরুতর কর্ম্ম। ব্যক্তির নিমিত্ত এ সকল ব্যবস্থা না করিলে সমাজের কর্ত্তব্য পালন করা হইল না। ইহা অসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

(৩) এক্ষণে আমরা তৃতীয় বিভাগে উপনীত হইয়াছি:—অতিপ্রাকৃতের সহিত মানবের সম্বন্ধ। সত্য বলিতে, অতিপ্রাকৃত কথাটাই অসঙ্গত। বাহ্য জগতে অথবা অন্তর্জগতে যাহা কিছু অনুভূত ও জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে, সকলই প্রকৃতি। জ্ঞাতা পুরুষ ভিন্ন আর সকলই প্রকৃতি। ‡ যাহা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, তাহা তো প্রকৃতিই; যাহা অতিন্দ্রিয় হইলেও অনুমানসিদ্ধ, তাহাও প্রকৃতি। কিন্তু এস্থলে অতি-প্রাকৃত শব্দ পরলোক, ধর্ম্মভাব ইত্যাদি অর্থে ব্যবহার করিতেছি। এ সকল মতও বিবর্ত্তনের অধীন, সুতরাং চিরাতীত কাল হইতে নানা আকারের মধ্য দিয়া বর্ত্তমান রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে।

---

* এখনও অনেক অনুন্নত (?) সমাজে মজলিস করিয়া দণ্ড বিধানের ব্যবস্থা দৃষ্ট হইয়া থাকে।

‡ সাংখ্যদর্শন (৩)

বর্ত্তমান যুগের অতি অসভ্য সমাজগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখিতেপাওয়া যায় যে, যাহাদিগের কোন ধর্ম্মভাব নাই, তাহারাও কোন পর্ব্বত, নদী অথবা বৃক্ষের নিকটে নৃত্যকরে এবং কোনরূপ বাদ্যসহ গান করিয়া থাকে। তাহারা কি নিমিত্ত ঐরূপ করিতেছে, জিজ্ঞাসা করিলে ভালরূপ কিছুই বলিতে পারে না। তবে, অনেক সময়েই পীড়া প্রভৃতি বিপৎপাতে ঐরূপ আচরণ করিয়া থাকে। যাঁহারা অসভ্যগণের এই সকল নৃত্যগীত দর্শন ও শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, উহা মানব অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী কাহারও উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হইতেছে। এ এক শ্রেণীর অনুষ্ঠান। অসভ্য শ্রেণীতে আর এক শ্রেণীর অনুষ্ঠান এই দেখা যায় যে, তাহারা পীড়াদি বিপৎকালে নানাবিধ বিকৃত মুখস পরিয়া পীড়িতের ভীতি উৎপাদন করে; কখন বা তাহাকে প্রহার করে, কখন বা জলে ভিজাইয়া লয়; কখন বা নানা প্রকার বিকট স্বরে চীৎকার করিতে থাকে। আফ্রিকা, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, আন্দামান দ্বীপ প্রভৃতি স্থানে এইরূপ অসভ্য সমাজ এখনও দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই দুই শ্রেণীর অনুষ্ঠান এবং অন্যান্য প্রমাণ হইতে বুঝা যায় যে, প্রাথমিক সময়ে মানুষ আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী ছিল। পরে যখন আত্মনির্ভর পরায়ণতার হ্রাস হইতে লাগিল, তখন হতাশ মানব অজ্ঞাত অতীন্দ্রিয় শক্তি বিশেষের আশ্রয় গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল। পীড়াদি বিপৎকালে, প্রথম অবস্থায় মানব স্বচেষ্টায়ই বিপদ-মুক্ত হইবে, এরূপ সাহস করিত; আর এই সাহসেই সে মুখস পরিধান, রোগীকে প্রহার ইত্যাদি অনুষ্ঠান করিত। সে যেন পীড়াকে মারিয়াই তাড়াইবে, সে যেন ভয় দেখাইয়াই খেদাইবে। পীড়াকে সে যাহাই মনে করুক, পীড়িতের দেহ মধ্যে যাহাই প্রবেশ করা কল্পনা করুক, তাহাকে সে নিজেই দূর করিবে, অন্যের সাহায্য অথবা অনুগ্রহ ভিক্ষা করিবে না। কিন্তু যখন এ চেষ্টায় সর্ব্বদা কৃতকার্য্য হইতে পারে না, তখন তাহার আত্ম-নির্ভরতা দীর্ঘ কাল স্থায়ী হয় না। তখন সে অধিকতর শক্তিশালী অতীন্দ্রিয় কাহারও উপর নির্ভর করিয়া শান্তি লাভ করে, এবং তজ্জন্যই বিশাল মহীরুহ অথবা প্রকাণ্ড পর্ব্বত মূলে, কি জানি কাহার উদ্দেশে নৃত্যগীতাদি করিয়া থাকে। সম্ভবতঃ এই বৃক্ষ অথবা পর্ব্বত, অথবা কোন মৃত আত্মীয় স্বগণকে বিপদুদ্ধারের নিমিত্ত আহ্বান করে। আত্মনির্ভরতার ভাবকে হ্যারিসন্ বলিয়া-ছেন "My will be done," পর-নির্ভরতার ভাবকে তিনি বলিয়াছেন, "Thy will be done" এই শেষোক্ত বাক্যই ধর্ম্মভাবের শেষ কথা।

অসভ্য-সমাজের ব্যবহার বিশ্লেষণ করিলে গর্ব্বিত আত্মনির্ভরতাকেই আদিভাব এবং পরনির্ভরতাকে তদনন্তর উৎপন্ন হওয়া স্বীকার করিতে হয়। প্রকৃত-পক্ষেও কেহ আপনি পারিলে অন্যের আশ্রয় লয় না। ধর্ম্মভাব বলিতে এখন আমরা যাহা বুঝি, অসভ্য-সমাজে তাহা ছিল বলিয়া বিশ্বাস হয় না। কিন্তু আত্মীয়স্বগণের প্রেতাত্মার অস্তিত্ব অসভ্য সময়েও স্বীকৃত হইত; ইহার প্রমাণ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। নিতান্ত অসভ্যও মৃতকে স্বপ্ন দেখিত, সন্দেহ নাই। কুকুরাদি ইতর জীবও স্বপ্ন দেখে, সুতরাং অসভ্য মানব দেখিবে তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। স্বপ্নদর্শনের প্রকৃত কারণ এখনও ভাল করিয়া বুঝা যায় নাই। অসভ্য তাহা কি বুঝিবে? সে নিশ্চয় মনে করিত, যাঁহাকে স্বপ্ন দেখিতেছে, তিনি কোথায়ও কোন ভাবে আছেন। সেইস্থান পরিদৃশ্যমান বায়ুমণ্ডলও হইতে পারে, অথবা অতীন্দ্রিয় পরলোকও হইতে পারে। যথায়ই হউক, তিনি ছায়াবৎ, তিনি অস্থূল; ইহা সে অসভ্যা-বস্থাতেও সিদ্ধান্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিল। সে দেখিত, মানুষ চলাফেরা করিতেছে, কার্য্য কর্ম্ম করিতেছে; হঠাৎ একদিন আর করে না; নিশ্চল নিস্পন্দ হইয়া গেল। অসভ্যমানব শিশুর ন্যায় অনুসন্ধিৎসু। তাই সে মনে করিল, জীবিতের কি যেন ছিল, মৃতের তাহা যেন নাই, কি যেন চলিয়া গিয়াছে। উপরের লিখিত অনির্দ্দিষ্ট সংস্কারের সহিত এই সংস্কার মিলিত হইয়া তাহাকে মৃতের অস্তিত্বে ও পরলোকে বিশ্বাসী করিয়া তুলিল। বিজ্ঞা-নবিৎ এ সকলকে যুক্তি বলে সমর্থন করুন, কিন্তু সে যুক্তি বুঝে নাই; পরলোক ও মৃতের অস্তিত্ব সে প্রত্যক্ষের বিষয় জানিয়া বিশ্বাস করিত; তাই সে প্রিয়-জনের মৃত্যু হইলে তাহার ব্যবহারোপযোগী খাদ্য, অস্ত্র শস্ত্র ও দ্রব্যাদি মৃতের পার্শ্বে রাখিয়া দিত, অথবা সে সকলকে ভাঙ্গিয়া ফেলিত। আত্মীয় স্বগণের মরণের সমকালে ঐ সকলকে ভাঙ্গিয়া ফেলিবার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, উহা-দিগের মধ্যস্থ রুদ্ধ আত্মা মুক্ত হইয়া মৃতের সহিত মিলিত হইতে পারে। অসভ্য-মানব সকল পদার্থেরই আত্মা থাকা বিশ্বাস করে। দার্শনিক-যুগের "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" পৃথক কথা। কিন্তু ইহার মূল অসভ্য সমাজেই নিহিত। ডারুইনের কুকুর ছাতার কাপড় নড়া দেখিলেই ঘেউ ঘেউ করিত; অপরিচিত ব্যক্তি আসিলেও ঘেউ ঘেউ করিত। সে নিশ্চয়ই কাপড়কে সজীব মনে করি-য়াছিল। শিশুগণ মাটীর পুতুলকে পুত্রবৎ স্নেহ করে; শাসন করে; কলার ডগাকে অশ্ব মনে করিয়া মারে ও ঘোড়দৌড় খেলে। নিজে যাহা, জগৎকে

তাহাই বিবেচনা করা প্রায় সকল মানুষেরই স্বভাবসিদ্ধ। গাছ-পালা, পাহাড়-পর্ব্বত, নদী-নালা, তীর-ধনু, কীট-পতঙ্গ, পশু-পক্ষী—সকলকেই নিজের ন্যায় সজীব মনে করা অসভ্য মানবের পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক। কালক্রমে সে সজীব আত্মার পৃথক্ অস্তিত্ব কল্পনা করে। শিশু দর্পণে নিজমূর্ত্তি দেখিয়া তাহার পশ্চাৎভাগে দ্বিতীয় ব্যক্তি থাকা অনুমান করে, তাহার সহিত কথা কয়, নিজ-কেই যেন ডবল্ ভাবে। এই সকল এবং আরও নানাবিধ কারণে মানুষের মধ্যে একটা ছায়াময় আত্মার কল্পনা করা অসভ্য মানবের পক্ষেও সহজ হইয়া থাকে। মরিবার সময় উহাই চলিয়া যায়, কিন্তু দেখা যায় না, অথচ স্বপ্নে মৃত-ব্যক্তিকে দেখা যায়। সুতরাং সেই ছায়াময় পুরুষ দৃশ্য এবং অদৃশ্য উভয় প্রকারই হইতে পারে। আত্মাকে অ-বস্তু কল্পনা করিতে কেহই পারে না, অসভ্যও না, সুসভ্যও না। তাহাকে বায়ুর ন্যায় সূক্ষ্মপদার্থ কল্পনা করা কঠিন নহে। অদৃশ্য আত্মাকে এই ভাবেই কল্পনা করা স্বাভাবিক। তিনি যখন আত্মীয় স্বগণের দেহ হইতে বাহির হইতেছেন, তখন তাঁহাকে ধরিয়া রাখাও যাইতে পারে; তিনি সূক্ষ্ম, তথাপিও বস্তু; সুতরাং ধরা যাইবে না কেন? এইরূপ বিশ্বাসবশতঃ ডেঙ্গার দ্বীপের অসভ্যগণ আত্মা ধরিবার ফাঁদ নির্ম্মাণ করিয়াছে। তাহারা এই ফাঁদ দ্বারা মৃতের আত্মাকে ধরিয়া রাখে। পার্শ্বে তাহার চিত্র অঙ্কিত করিয়া দিলাম।* উহার গেলাকার চক্রগুলির মধ্যে আত্মা আবদ্ধ করে। পরলোক এবং অমর আত্মা এইরূপে প্রাথমিক সমাজ হইতে সভ্য সমাজে নানাবিধ আকারে আত্ম-প্রকাশ করে। ইহা ভাববিবর্ত্তনের ফল। বলিয়াছি, এমন সভ্য-সমাজ নাই, যাহাতে অসভ্য যুগের চিহ্ন সকল সম্পূর্ণরূপে লোপ পাইয়াছে। সে সকল ভিন্ন আকারে, ভিন্ন অর্থে, ভিন্ন উদ্দেশ্যে, কোন না কোন প্রকারে সুসভ্য সমা-জেও অনেক সময়েই দেখা যায়। মৃতের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় চাউল গমাদি, খাট-বিছানাদি, তৈজস্ বাসনাদি, বিনামা কাষ্ঠপাদুকাদি, ছত্র চামরাদি প্রদান করা সভ্য-সমাজেও দৃষ্ট হইয়া থাকে। মৃতের শেষ বিশ্রামস্থানে তাহার হস্তী, অশ্ব, দাস দাসী এবং পত্নীকেও লইয়া যাইবার প্রথা ছিল; এবং মৃতের সহিত পুতিয়া অথবা পুড়িয়া ফেলিবার আভাস জগতের সাহিত্যে অদ্যাপি দুষ্প্রাপ্য নহে। এ সকলের বৈজ্ঞানিক বা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা থাকিতে পারে এবং সম্ভবতঃ আছেও; কিন্তু ইহাদিগের মূল অসভ্যসমাজের প্রাথমিক অনুষ্ঠানের

* ব্রিটিশ্ মিউজিয়মের এথনোগ্রাফিকেল হেণ্ড বুক হইতে গৃহীত।

ও বিশ্বাসের মধ্যে অনুসন্ধান করিতে হয়। ধরাতলে এখনও যে সকল অসভ্য জাতি বর্ত্তমান আছে, তাহাদিগের মধ্যে বীজরূপে সভ্য-সমাজের অতিপ্রাকৃত বিশ্বাস ও অনুষ্ঠান অনেক পাওয়া যায়।

পূর্ব্বে আত্ম-নির্ভরতার ও পর-নির্ভরতার উল্লেখ করিয়াছি। মানব যখন অতি-প্রাকৃত বিষয়ে আত্ম-নির্ভরতা ত্যাগ করতঃ এক শক্তিশালী অজ্ঞাত-সত্তার আশ্রয় গ্রহণ করে, তখন তাহার হৃদয়ে নম্রতা, বিনয়, ভক্তি প্রভৃতি সদ্‌গুণের আবির্ভাব হয়। এই সকল গুণই উন্নত ধর্ম্মভাবের জীবনস্বরূপ। কালক্রমে এই সকল বৃত্তি হইতে ভগবৎ-প্রেম ও আত্মত্যাগ সঞ্জাত হয়। শক্তিমানে একান্ত নির্ভরতা, তাঁহার অনুগ্রহ ও দয়ায় সম্পূর্ণ আস্থা, তাঁহার ন্যায়-বিচারে একান্ত বিশ্বাস, মানব-হৃদয়ের অলঙ্কার-স্বরূপ সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সকল বৃত্তির মূল একান্ত নির্ভরতা প্রভুভক্ত পশু-পক্ষীগণের মধ্যেও পাওয়া যায় না, এরূপ নহে, অন্ততঃ বীজরূপেও পাওয়া যায়।

আদিকাল হইতেই আত্মায় বিশ্বাস লক্ষিত হইতেছে। এ বিশ্বাসের সহিত শুভাশুভ কর্ম্মের যোগ থাকিবেই। জীবিত ব্যক্তি ঐরূপ কর্ম্ম করে, সুতরাং মৃতের আত্মাও ভাল মন্দ, মঙ্গলামঙ্গল উভয়বিধ কর্ম্মই করিতে পারে। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তাহাকে বাক্যদ্বারা তুষ্ট করা, দ্রব্যাদি দান করতঃ তৃপ্ত করা, বিপদগ্রস্ত সমাজের নিত্যকর্ম্ম হইয়া উঠে। কখন বা মানব বিকট বেশভূষা করিয়া ভয়ঙ্কর মুখস্ ইত্যাদি পরিধান করিয়া, অথবা ভৈরব বিকৃতস্বরে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া ঐ আত্মাকে ভয় দেখাইয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধির চেষ্টা করে। অবশেষে যখন পৃথক্ পৃথক্ আত্মা হইতে এক সর্ব্বব্যাপ্ত বিরাট বিশ্বাত্মার ভাব মানব হৃদয়ে জাগ্রত হয়, তখনও উপরের লিখিত দ্বিবিধ উপায়ে উদ্দেশ্য-সিদ্ধির চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হয় না। চৈত পূজার গাজন সময়ে সন্ন্যাসী-দিগের ভয়াল মূর্ত্তি ও বিকট মন্ত্রোচ্চারণ; আর লোমহর্ষণ বোয়ার-যুদ্ধ সময়ে প্রেমাবতার যীশুর নিকট গির্জ্জায় গির্জ্জায় নরহত্যার সহায়তা প্রার্থনা; শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রে যষ্টি পুঁতিয়া তাহার অগ্রভাগে চূর্ণলিপ্ত কাল হাঁড়ী স্থাপন করা এবং স্নেহময় পুত্রের নিকটে পীড়িত কালে বটুক ভৈরবের স্তব পাঠ —এ সকল মূলে একপ্রকার ভাব হইতেই প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। কিন্তু যখন অন্যপ্রকারে এ সকলের উপকারিতা উপলব্ধ হয়, তখন ইহার বিবিধ ব্যাখ্যা

* ব্রিটিস্ মিউজিয়মের এথনোগ্রাফিকেল হ্যাণ্ডবুক হইতে গৃহীত।

কল্পিত হইয়া থাকে। সে যাহা হউক, এ সকলকে তুচ্ছ জ্ঞান করা উচিত নহে; মানবমন এই সকলকে আশ্রয় করিয়াই উন্নত হইয়াছে এবং আরও হইবে। এই সকল ভিত্তির উপরই নিষ্কল, নিরঞ্জন, অনাদি, অনন্ত অদ্বিতীয় পুরুষ মানব মনে আপন সিংহাসন রচনা করিয়াছেন।

দশম অধ্যায়।

দেহ গঠন ও বর্ণানুসারে মানবসমাজকে পণ্ডিতগণ প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভাগ করিয়াছেন,—শ্বেত, কৃষ্ণ, ও পীত। কটা ও লোহিত বর্ণ মানব ইহাদিগের মধ্যবর্ত্তী। ডারুইন্ বিশ্বাস করিতেন যে, এই সকল মানব মূলে একই। কালক্রমে ইহাদিগের দেহ গঠনের সহিত স্বভাবও পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে।

কোন মানব সমাজকে বুঝিতে হইলে প্রথমেই জানা আবশ্যক যে, উহা মানব জাতির কোন্ বিভাগ হইতে উৎপন্ন, এক বা একাধিক বিভাগ হইতে জাত। ব্যক্তিকে বুঝিতে হইলে যেমন তাহার বংশ বুঝা চাই, তেমনই, সমাজকে বুঝিতেও তাহার উৎপত্তি বুঝা আবশ্যক। তৎপর, ব্যক্তির সম্বন্ধে যেমন শিক্ষা ও সংসর্গ, সমাজের সম্বন্ধেও তাহাই। অতীত কাল হইতে যে সমাজ যেরূপ শিক্ষাদীক্ষার মধ্য দিয়া, যেরূপ সংসর্গে পড়িয়া বিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা তদ্রূপই হইয়াছে। সুতরাং সমাজকে চিনিতে হইলে তাহার শিক্ষা ও সংসর্গ বুঝা আবশ্যক। সমাজের উৎপত্তি বুঝিতে লোকতত্ত্ব, এবং তাহার শিক্ষা ও সংসর্গ বুঝিতে ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব জানা অত্যাবশ্যক। এসকল শাস্ত্র আলোচিত না হইলে, সমাজতত্ত্ব সম্যক্ আলোচিত হইতে পারে না।

যাহা হউক, সমাজের উৎপত্তি, শিক্ষা ও সংসর্গ অবগত হইলে সমাজকে বুঝিবার আশা করা যায়। তখন দেখা যায় যে, ব্যক্তির জন্মগত, শিক্ষালব্ধ ও সংসর্গগত দোষ-গুণ যেমন অপরিহার্য্য, সমাজেরও তাহাই। সমাজকেও ব্যক্তির ন্যায় ইচ্ছা করিলেই ইচ্ছামত এদিক ওদিক পরিচালন করা যায় না। তাহার প্রকৃতির অনুরূপ ভাবে তাহাকে না লইলে কোন ঈপ্সিত ফলই আশা করা যায় না।

মানব-সমাজ মানব-সমষ্টি। সুতরাং মানবের দেহ ও মনই সমাজের একমাত্র সম্বল। দেহ ও মন, উভয়ই বংশানুক্রমের নিয়মাধীন। সুতরাং বিবেচনা পূর্ব্বক নরনারীদিগকে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ করা আবশ্যক। যাহারা সুস্থ, সবল, কৃতী, চরিত্রবান এবং জীবন-সংগ্রামে অল্পাধিক জয়যুক্ত ও দীর্ঘায়ুঃ, তাহাদিগের কিম্বা তাহাদিগের বংশধরগণের মধ্যেই সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া কর্ত্তব্য।

ঐসকল গুণ বংশানুগত, সুতরাং অপত্যও সুযোগ্য হওয়া সম্ভব। তাহা না হইয়া, দুর্ব্বল, রুগ্ন, অসৎ, অল্পায়ু ও অকৃতিগণ মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধ অনুষ্ঠিত হইলে পরপর বংশে মানব অধঃপতিত হইয়া যাইবে। ঐসকল গুণবিশিষ্ট নরনারী একবর্ণে অথবা বিভিন্ন বর্ণেও থাকিতে পারে।

বিবাহ অন্তর্জাতীয় হইলে কালক্রমে অপত্য শ্রেণীতে অবসাদ আসিয়া উপস্থিত হয়। এ নিমিত্ত সমাজ-দেহকে সুস্থ রাখিতে হইলে সময় সময় প্রায় সমভাবাপন্ন বহির্জাতীয় বিবাহও প্রচলিত থাকা আবশ্যক। এতদ্দেশেও প্রাচীন কালে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব ছিল না।

তৎপর, সমাজকে দৈহিক ও মানসিক পীড়া হইতে রক্ষা করা এক প্রধান কর্ত্তব্য। ইহা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সিদ্ধ করিতে হয়। দূষিত স্থানকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে শুদ্ধ করিবার চেষ্টা করা আবশ্যক। পীড়িত দেহকেও ঐ উপায়ে রোগমুক্ত করিতে হয়। মানসিক পীড়া নানাবিধ। রোগ, শোক, অত্যাচার অভাব ও মত্ততা ইত্যাদি নানাবিধ কারণে মনের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। ইহাদিগের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করা অত্যাবশ্যক। কর্ম্ম সহজ বৃত্তি। ইহার অনুষ্ঠানও স্বায়ত্ত থাকা প্রয়োজন। কর্ম্ম পরবশ হইলে দৈহিক ও মানসিক জড়তা উৎপন্ন হয়।

দাসত্ব ও প্রভুত্ব, উভয়ই দেহ এবং মনের অবসাদক! প্রত্যেক সমাজ স্বচালিত থাকিলে সুস্থ থাকিবার আশা করিতে পারে।

মানবে মানবে প্রকৃতিগত প্রভেদ আছে। তাহাদিগের কর্ম্ম-প্রবৃত্তিও পৃথক। কর্ম্মানুসারে সমাজ নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইবে। ইহা অনিবার্য্য। প্রত্যেক ব্যক্তি অপরের সহিত প্রতিদ্বন্দীতা করিলে, কলহ বিবাদ উপস্থিত হয়; সামাজিক উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং সমাজ মধ্যে অন্তর্জাতীয় প্রতিদ্বন্দীতা কমাইতে হইবে। কিন্তু প্রতিদ্বন্দীতা যেটুকু অনিবার্য্য, তাহা প্রধানতঃ অপর সমাজের সহিত সীমাবদ্ধ থাকিলে তাদৃশ দোষবহ হয় না। কিন্তু কোনরূপ প্রতিদ্বন্দীতা না থাকিলেও সমাজ অবসন্ন হইয়া পড়ে। নিম্নশ্রেণীস্থ জীবমধ্যে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন এই প্রতিদ্বন্দীতা রক্ষা করে। তন্নিবন্ধন যোগ্যতমের জয় হয়। কিন্তু উন্নত মানব সমাজে তাহা হইতে পারে না। এ নিমিত্ত মানব সমাজে সামাজিক নির্ব্বাচন ঐ কার্য্য সাধন করে। যে সমাজে তদ্রূপ হয় না, তথায় দ্রুতবেগে অবসাদ আসিয়া উপস্থিত হয়। ভাল মন্দ, যোগ্য অযোগ্য বিচার অত্যাবশ্যক। এ বিচার

না থাকিলে শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষা হয় না, সব অবসন্ন হইয়া পড়ে। যোগ্যের যোগ্যত্ব রক্ষা করিতে হইলে নির্ব্বাচন (যে কোনরূপ) আবশ্যক। কিন্তু প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন মানব আর স্বীকার করিবে না; সুতরাং সামাজিক নির্ব্বাচনই এক-মাত্র পন্থা। সমাজের কোন অনুষ্ঠান কি আচরণ, মঙ্গলজনক কি অমঙ্গলজনক—ইহার একমাত্র উত্তরই এই যে, উহা সামাজিক নির্ব্বাচনের সহায়ক কি না? যদি উহা দ্বারা দেহে ও মনে যোগ্য ব্যক্তিগণের আহার সংস্থান ও অপত্যোৎপাদনে বেশী সুবিধা হইল, অযোগ্যগণের তাদৃশ সুবিধা হইল না, তবে মঙ্গলজনক হইতে পারে। নচেৎ না হইতে পারে।*

জীবন সংগ্রাম অপরিহার্য্য; নচেৎ জীবের জড়তা হইতে নিষ্কৃতি নাই। কিন্তু মানবেতর জীব রাজ্যে ঐ সংগ্রাম নখদন্তাঘাতে অনুষ্ঠিত হয়। মানব সমাজে তদ্রূপ হইতে পারে না। মানবের উন্নত বুদ্ধি, উন্নত চিত্ত বৃত্তি, জীবন সংগ্রামকে মনোরাজ্যে লইয়া গিয়াছে। যে সমাজ মনের গুণে বড়, সে-ই বড় হইতেছে। দেহের আদর কমিয়া আসিতেছে। † তবে মনের উৎকর্ষও দেহানুগত। সেই হিসাবে দেহ তুচ্ছ করিবার নহে। মনই প্রধান। দেহ যদি উন্নতি অবনতির কারণ হইত, তবে ক্ষুদ্রকায় দুর্ব্বল মানব জীব রাজ্যের রাজা হইত না।

নিম্নশ্রেণীস্থ জীবগণ মধ্যেও জীবনসংগ্রামই যে সর্ব্বদা জয়যুক্ত হইয়াছে, তাহা নহে। প্রেম, মৈত্রী ইত্যাদি সদ্‌গুণ সকল জীববিবর্ত্তনের কম সহায়তা করে নাই। ক্রোপট্‌কিন তদীয় বিখ্যাত গ্রন্থে ‡ বিশদরূপে দেখাইয়াছেন যে, যে সকল জীব পরস্পরের সহায়তা করিয়া আহার সংগ্রহের ও বিপদ মোচনের উপায় করিয়াছে, যাহারা পরস্পরের উপকারের নিমিত্ত যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছে, তাহারা জীবরাজ্যে অনেক বিষয়ে উন্নতি লাভ করিয়াছে; তাহারা বংশবৃদ্ধি ও আহার লাভ করিয়াছে, তাহারা বুদ্ধি বৃত্তিতেও হীন হইয়া রহে নাই। তাহারা দল অথবা সমাজ গঠিত করিয়া তাহার সাহায্যে বিবিধ সদ্‌গুণের অধিকারী হইয়াছে। ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পিপীলিকা। কীট, পক্ষী, পশু, সকলের মধ্যেই এ নিয়মের দৃষ্টান্ত দেখা যায়। পরস্পরের সহায়তায় জীবের যে আত্ম-প্রতিষ্ঠা হয়, তাহা

* Sabeby's Parenthood and Race Culture.

† The future struggle for supremacy * * will be contest between minds, and muscles will be at a discount. Nature, 9th May, 1902.p 36.

‡ Kropatkin's Mutual Aid as a factor of Evolution.

জীবন-সংগ্রাম অপেক্ষা কম জয়যুক্ত নহে। মানব সমাজে জীবন সংগ্রামের ভাব পরিবর্ত্তন হইয়া যাইতেছে। যদিও যুদ্ধ বিগ্রহ কোন দিনই সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হইবে বলিয়া বিশ্বাস করি না, তথাপি প্রতিদ্বন্দ্বীতা অন্য আকার ধারণ করিবে, এরূপ লক্ষণ দেখা হইতেছে। ন্যায়ের, ধর্ম্মের প্রতিদ্বন্দ্বীতা ধীরে ধীরে জীবন-সংগ্রামকে পবিত্রতর আকার দিতেছে। যাহা সমাজের মঙ্গলজনক, তাহা সৎ, তাহা অনুষ্ঠেয়। যে সমাজ এই তত্ত্ব অধিকতর হৃদয়ঙ্গম করিতেছে, এবং তদ্ধেতু সমাজের মঙ্গলকে প্রধান লক্ষ্য বলিয়া অঙ্গীকার করিতেছে, সে সমাজ উন্নতির পরে অধিকতর অগ্রসর হইতেছে। যে সমাজের নরনারী মিলিত হইয়া সুযোগ্য অপত্য অধিকতর সংখ্যায় উৎপন্ন করিতেছে, সেই সমাজ জগতে অগ্রগণ্য হইতেছে। যে সমাজে সমাজদ্রোহীর এবং অযোগ্যগণের সংখ্যা অধিক, তাহা অধঃপতিত হইতেছে। এইরূপে সামাজিক নির্ব্বাচন অযোগ্য সমাজকে চিরতরে ধরাপৃষ্ঠ হইতে অপসৃত করিতেছে। আর যে সমাজ মঙ্গল-জনক কর্ম্মে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতেছে, তাহাই জয়যুক্ত হইতেছে। এইরূপে বিধাতা অধর্ম্ম হইতে ধর্ম্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিতেছেন।

যাহারা যোগ্য হইয়াছে, তাহারা যোগ্য হইবার উপযুক্ত ছিল, ইহা নিশ্চয়। যাহারা বংশ বৃদ্ধি করত, আহার সংগ্রহ করত, জগতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহারা তদ্রূপ হইবার যোগ্য ছিল। যাহারা প্রাকৃতিক অথবা সামাজিক নির্ব্বাচন বশতঃ নীচে পড়িয়া রহিয়াছে, তাহারা নীচে রহিবারই যোগ্য। একথা প্রায় সত্য, কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য নহে। নিকৃষ্টগণ মধ্যেও কখন কখন উৎকৃষ্ট যৌন সম্বন্ধ বশতঃ উৎকৃষ্ট অপত্য জাত হইয়া থাকে। তাহাদিগকে সুশিক্ষা ও সুসংসর্গ দিলে তাহারাও উন্নত হইতে পারে। কিন্তু এরূপ স্থল অধিক নহে। তাই চিরাতীত কাল হইতে যাহারা নিকৃষ্ট অথবা অকৃতী হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, তাহাদিগকে উন্নত করিবার আশা কম। উন্নতদিগের সহিত তাহাদিগের যৌন সম্বন্ধ ঘটাইলে, তাহারা কিছু উন্নত হইতে পারে; কিন্তু তাহাতে ঐ উন্নত ব্যক্তিগণের সংখ্যা অধিক দিন স্থির থাকিতে পারে না। ইহাতে সমাজ অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে। এই নিমিত্ত যোগ্যগণকে পৃথক রাখাই সাধারণ নিয়ম হওয়া উচিত। তবে কখন কখন নিম্ন শ্রেণী হইতেও উপযুক্ত ব্যক্তি সমাজে উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে; এরূপ ব্যবস্থাও থাকা উচিত। এতদ্দেশে তাহা ছিলও। "শিক্ষা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা" ব্যক্তির এবং সমাজের স্থায়ী উন্নতি বিধান করিতে পারেনা। বংশগত উপকরণ অনুকূল না থাকিলে

শিক্ষা দেওয়াও যায় না; সকলে শিক্ষা পাইবার যোগ্যও নহে। বরং সর্ব্বসাধারণকে শিক্ষা দিলে হিত অপেক্ষা অহিতই হইবার বেশী সম্ভব। কারণ, সাধারণের মধ্যে দেহে ও মনে অবনত ব্যক্তিই অধিক, তাহারা শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে আহার সংস্থানের ও বংশ বৃদ্ধির অধিকতর সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া সমাজকে আরও অধঃপতিত করে।* এস্থলে শিক্ষা বলিতে অধুনা আমরা যাহা বুঝিয়া থাকি, সেই পুস্তকগত বিদ্যা বুঝিতে হইবে; প্রত্যেক সামাজিক ব্যক্তিই স্বাস্থ্য-রক্ষার ও জীবন ধারণের উপযোগী যে সকল সদুপায় বহু-দর্শন হইতে লাভ করে, তাহা বুঝিতে হইবে না। তাহা সকলেরই আয়ত্ত হওয়া উচিত। বংশগুণে উন্নত ব্যক্তিরাই উচ্চ শিক্ষার অধিকারী। উচ্চ শিক্ষিতগণ সমাজকে উন্নত করিবার বিধি ব্যবস্থা রচনা করিবেন,অপরে তাহা গ্রহণ করিবার যোগ্য হইলেই যথেষ্ট হয়।

সমাজ রক্ষা ও সমাজের উন্নতি করিতে হইলে সমাজস্থ পরস্পরের প্রতি প্রেম ও পরস্পরের নিমিত্ত ত্যাগ স্বীকার, প্রধান ধর্ম্ম রূপে পরিগণিত হওয়া উচিত। দেশপ্রীতি না থাকিলেও সমাজ চলে, থাকিলে উন্নতির বিশেষ সহায়ক হয়। ইহার দৃষ্টান্ত স্থল ইহুদী জাতি। কিন্তু সমাজপ্রীতি না থাকিলে সমাজ চলিতেই পারে না। সমাজপ্রীতির অভাবে ধর্ম্ম-বন্ধন শিথিল হয়, প্রেম ও ত্যাগ অসম্ভব হইয়া উঠে। সে সমাজ কখনই আত্মরক্ষা অথবা উন্নতি করিতে সমর্থ হয় না।

অবশেষে, সমাজ তত্ত্বের প্রথম ও শেষ কথা ব্যক্তি। ব্যক্তি লইয়াই সমাজ। ব্যক্তির উন্নতি হইলেই সমাজ উন্নত হইল; অবনতি হইলেই অবনত হইল। ব্যক্তি পিতৃমাতৃজ এবং বংশানুক্রমের ফল। সুতরাং যোগ্য নরনারী, যাহাদিগের বংশে সচ্চরিত্র, সুস্থ, দীর্ঘায়ু ও কৃতী নর নারীর জন্ম হইয়াছে,—তাহাদিগকে বিবাহিত করিয়া যোগ্য বংশধরের উৎপাদন, এবং অযোগ্যগণের অপত্যোৎপাদনে বাধা প্রদান—এই দুই মূল সূত্র অবলম্বন করিয়াই সমাজ পরিচালন করিতে হয়; এই সূত্র হারাইলে সমাজ থাকিতেই পারে না। বিবাহ বিষয়ে যথাযোগ্য বিধি নিষেধ প্রণয়ন করা

* The effects of special care given to the weakly or feeble minded may be absolutely harmful to the race. if the improvement so effected leads to more frequent marriage among rich unfortunates than would otherwise be the case.—Doncaster's Heredity pp 50—51.

ও সমাজ মধ্যে সে সকল প্রচলন করা অতিশয় কঠিন কার্য্য, এ বিষয়ে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হওয়া বোধ হয় অসম্ভব, তথাপিও যে জাতি সর্ব্বাগ্রে এই সকল বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবে, সে-ই মানব সমাজের শীর্ষ স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইবে।* আর যাহারা যেন-তেন-প্রকারেন বিবাহ ব্যাপার সমাধা করিয়া লইতেছে, অথবা লইবে, কিম্বা এক রক্তই পুনঃ পুনঃ মিশ্রিত করিতে থাকিবে, তাহাদিগের অধঃ-পতন নিবারণ করিবার সাধ্য কাহারও নাই। তাহারা শিক্ষা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তন যে ভাবেই করুক না কেন, ও-সকলে বিশেষ কোন ফল লাভের আশা করা যায় না † বংশানুক্রমে জ্ঞানে ও কর্ম্মে সমাজ সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। এই কথা প্রণিধান না করিয়া পুরাকালে কত কত উন্নত জাতি অধঃপতিত হইয়াছে; বাণিজ্য, যুদ্ধবিদ্যা, শাস্ত্রজ্ঞান কিছুই তাহাদিগকে ধ্বংসের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই। তাহারা মানুষ গড়িতে জানে নাই; তাই সমাজ রক্ষা করিবে কে? বর্ত্তমান যুগে জীবতত্ত্বের আলোচনা যেরূপ দ্রুতবেগে চলিতেছে, তাহাতে মানব গঠন অনতিবিলম্বেই সাধারণের জ্ঞানগোচর হইবে, এমন আশা করা যায়। অন্যত্র এই বিষয়ে যেরূপ চেষ্টা হইতেছে, এতদ্দেশে তাহার বিন্দুমাত্রও আরম্ভ হয় নাই, ইহা বিশেষ পরিতাপের বিষয়। আশা করি, মানবতত্ত্ব সুতরাং সমাজতত্ত্ব শাস্ত্র এতদ্দেশে সর্ব্বত্রই আদৃত ও আলোচিত হইবে। প্রকৃত সংস্কারের পথ উদ্ঘাটিত ও প্রদর্শিত হইলে মানব যে সুপ্রষ্ঠিত ও কৃতার্থ হইবে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই।

---

* There is little doubt that the nation which first finds a way, to make them practical will in a very short time be the leader of the world —Ibid p 51.

* How little room is left in the development of the individual for the effects of environment even on the intellect or mind in the broadest sense of the word. Ibid b 50,

পরিশিষ্ট।

সভ্য শব্দের অর্থ বুঝা কঠিন। তবে, বোধ হয়, যাহারা সামাজিকগুণে যত উন্নত, তাহাদিগকে তত সভ্য বলা যাইতে পারে। আদিম অবস্থা হইতে এ পর্য্যন্ত মানুষ দেহে ও মনে যতই উন্নতি করিয়া থাকুক, সমাজবদ্ধ না হইলে তাহার কিছুই হইত না। এ কথা জীবতত্ত্ব ও লোকতত্ত্বের আলোচনায় হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে। সমাজধর্ম্মই মানুষকে উত্তরোত্তর সভ্যপদবাচ্য করিয়া তুলিয়াছে, এবং বিবিধ সদ্‌গুণে মণ্ডিত করিয়াছে। সমাজ ভাঙ্গিয়া গেলে মানুষ কেবল ব্যক্তির সমষ্টি হইয়া পড়ে; তখন তাহার সকল উন্নতিই ফুরাইয়া যায়। যাহা হউক, এই শব্দের মোটামুটি একটা অর্থ আমরা সকলেই বুঝি বলিয়া বিশ্বাস করি। সেই অর্থে প্রয়োগ করিলে দেখা যায় যে, ইহা কয়েকটি আবিষ্কারের উপর নির্ভর করিয়াছে, এবং উহাদিগের সহিত ক্রমবিবর্ত্তিত হইয়াছে। প্রথম আবিষ্কার বোধ হয় ভাষা। ভাষা ব্যবহার করিতে না পারিলে মানব কোনও উন্নতিই করিতে পারিত না, ইহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু প্রথম অবস্থায় উহা লিখিত হয় নাই, কথিত-ভাষারূপেই ব্যবহৃত হইত। মস্তিষ্ক পদার্থ মানবের বিশেষত্ব; ইতর জীবগণের মস্তিষ্ক দেহের অনুপাতে অল্প, এবং জটিল নহে; মানবের মস্তিষ্ক দেহের অনুপাতে অনেক বড়, এবং অপেক্ষাকৃত জটিল। এই উন্নত মস্তিষ্কের অধিকারী হওয়াতেই মানব ভাষার আবিষ্কার ও উন্নতিসাধন করিতে সক্ষম হইয়াছে। অনেক পক্ষী মানবীয় ভাষা উচ্চারণ করিতে ও কিছু কিছু বুঝিতেও পারে। কিন্তু তাহাদিগের বুদ্ধি মানবের ন্যায় উন্নত না থাকায়, তাহারা ভাষার গঠন করিতে সক্ষম হয় নাই। মস্তিষ্কের উন্নতি ভাষা-আবিষ্কারের ও ভাষার উন্নতির হেতু। আবার, ভাষার উন্নতি ও আলোচনার ফলে মস্তিষ্কের উন্নতি হইয়া থাকে। উহারা পরস্পর পরস্পরের উন্নতিবিধান করিয়াছে। এতদ্দ্বারা মানব-সভ্যতা এক পুরুষে যেরূপ উন্নত হয়, পর পর বংশে সেই উন্নতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবার সেইরূপ সুযোগ হয়।

দ্বিতীয় আবিষ্কার, অগ্নি। এই পদার্থের আবিষ্কারের দ্বারা মানবীয় সভ্যতা কতদূর বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহা পরিমাণ করা দুঃসাধ্য। এতদ্দ্বারা শীতনিবারণ করা যাইতে পারে, কিন্তু সে সামান্য কথা। নিদারুণ শীতে চিরতুষারাবৃত স্থানেও মানব নগ্নদেহে অদ্যাপি বাস করিতেছে, তাহাদের অগ্নির সাহায্য আদৌ

আবশ্যক হয় না, অথবা অধিক আবাশ্যক হয় না। কিন্তু অগ্নি রন্ধন কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া ও বস্ত্র-নির্ম্মাণে সহায়তা করিয়াই প্রধানতঃ সভ্যতার উন্নতিসাধন করিয়াছে। ইহার বিস্তৃত উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তবে এইমাত্র বলা সঙ্গত বোধ করি যে, অগ্নি প্রথমতঃ রন্ধন কার্য্যেই ব্যবহৃত হইত; তাহার বহু পরে বস্ত্র-নির্ম্মাণে প্রযুক্ত হইয়াছে।

তৃতীয় আবিষ্কার, পাথরের অস্ত্র নির্ম্মাণ। বোধ হয়, অস্ত্র-নির্ম্মাণে পাথরই প্রথম ব্যবহৃত হইয়াছিল। প্রাচীন যুগের কোনও কোনও পর্ব্বতগুহামধ্যে পাথরের অস্ত্রাদি পাওয়া গিয়াছে। ছুরি, ভোজালি, বল্লম ইত্যাদি বহু অস্ত্র সে যুগে প্রস্তুত হইয়াছিল। পাথর দ্বারা এই সকল সুন্দর অস্ত্র প্রস্তুত করা সভ্য মানবের অসাধ্য, অথবা দুঃসাধ্য। অসভ্যগণের চক্ষু ও হস্ত সভ্য মানবের অপেক্ষা অনেক বলিষ্ঠ ও কর্ম্মঠ। অস্ত্র প্রস্তুত করিতে না পারিলে ক্ষীণ, দুর্ব্বল ও ক্ষুদ্র মানব জীব-জগতে আপন প্রভুত্ব কখনও প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইত না। বিশেষতঃ, তৎকালে বিভিন্ন গোষ্ঠীর ও দলের মধ্যে সর্ব্বদাই আহার ও স্ত্রীসংগ্রহার্থ যে সকল সংগ্রাম হইত, তাহাতেও জয়-পরাজয় এই আবিষ্কারের উপর অনেকাংশে নির্ভর করিত। অস্ত্রের উদ্ভাবন, নির্ম্মাণ ও ব্যবহারে পারদর্শী হইতে হইলে, ক্রমে বুদ্ধিবৃত্তির যে উৎকর্ষ হয়, ঐ সকল সংগ্রামে জয়ী হইবার জন্য বীরত্বের সহিত যেরূপ একতা, ধীরতা, ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি ও কৌশল আবশ্যক হয়, তাহার নিকট মানবীয় সভ্যতা অনেক পরিমাণে ঋণী।

চতুর্থ আবিষ্কার, লৌহ। এই আবিষ্কার মানব-সমাজের কত দূর উপকারী হইয়াছে, তাহা বিখ্যাত "স্বর্ণ ও লৌহের দ্বন্দ্ব" হইতে বালকেও জানে। ইহার প্রসাদে প্রথম হইতে এ পর্য্যন্ত নৌকা * প্রস্তুত করিয়া মানব দেশদেশান্তরে বিস্তৃত হইয়াছে; হলাদি প্রস্তুত করিয়া কৃষিকার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছে; নানাবিধ কল কারখানা গঠিত করিয়া সভ্যতা-বিস্তার করিবার সুযোগ পাইয়াছে; অস্ত্রশস্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিয়া আত্মরক্ষা ও শত্রুদিগকে আক্রমণ করিতেছে। ইহার বলে মানব আত্মপ্রতিষ্ঠায় সক্ষম হইয়াছে ও হইতেছে।

পঞ্চম আবিষ্কার, কৃষি ও পরিচ্ছদ। যদিও চর্ম্ম ও লতাপত্র এই অবস্থার অনেক পূর্ব্ব হইতেই পরিচ্ছদস্বরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া অনুমান করিবার কারণ আছে, কিন্তু সে অলঙ্কারের জন্য, শোভার নিমিত্ত। লজ্জা-নিবারণের জন্য পরিচ্ছদ প্রথমে ব্যবহৃত হয় নাই। পরিচ্ছদের উন্নতি সামান্য কথা; উহার বিস্তৃত বিব-

---

* প্রথম নৌকা বোধ হয় একটি মোটা গাছ কিংবা কাঠ খুলিয়া প্রস্তুত হইয়াছিল।

রণ এ প্রসঙ্গে অনাবশ্যক। কিন্তু কৃষির আবিষ্কার মানবীয় সভ্যতার একটি প্রধান হেতু। সম্ভবতঃ, ইহা হইতে আর্য্যগণ স্বীয় গৌরবান্বিত নামের অধিকারী হইয়াছিলেন। এই কৌশল জ্ঞাত হইবার সময় হইতেই মানব এক স্থানে স্থিরভাবে বসবাস করিতে সমর্থ হইয়াছিল। বেদিয়াদিগের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইয়া শিকার দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিবার আর প্রয়োজন হয় নাই। কৃষির প্রয়োজনবশতই এক স্থানে বসিতে হইয়াছে। ইহা হইতেই যথার্থ সমাজের উৎপত্তি। সমাজধর্ম্ম, যাহা মানবকে মানব-নামের প্রকৃত অধিকারী করিয়াছে, তাহাও ইহারই অন্যতর ফল। কৃষিজাত শস্যে উদর পূর্ণ হওয়াতে, মানবের বহু অবসর লাভ করিবার সুযোগ হইয়াছিল। নিয়ত ভ্রমণ ও শিকার করিতে হইলে তাহা সম্ভব হইত না। কৃষি হইতেই মানবের অবসর-কাল-প্রাপ্তি, সুতরাং জ্ঞানচর্চ্চার সুবিধা লাভ। এই সময় হইতেই মানব উত্তরোত্তর জ্ঞানোন্নত হইতে লাগিল। দেহের অভাব ছাড়িয়া মনের অভাব অনুভব করিল; বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের দিকে চক্ষু তুলিয়া চাহিবার সময় পাইল, এবং বিশ্বের সৌন্দর্য্যে ও শৃঙ্খলায় মুগ্ধ হইয়া বিশ্বরচয়িতার অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাই মানবত্ব ছাড়িয়া এখন হইতে দেবত্বে উন্নীত হইবার পথ আবিষ্কার করিবার প্রয়াসী হইল। কৃষির আবিষ্কারকে সভ্যতার এক প্রধান কারণ বিবেচনা করা যায়।

ষষ্ঠ আবিষ্কার, লেখা। মানব লিখিতে শিক্ষা করিয়া সময়কে জয় করিয়াছে। এক সময়ে যে সকল উন্নতি করিতেছে, তাহা তৎকালেও দেশদেশান্তরে ব্যাপ্ত হইয়া জ্ঞানোন্নতিসাধন করিতেছে, এবং পরবর্ত্তী কালেও, বহু সহস্র বৎসর অন্তেও, মানব-সমাজের প্রভূত উপকার করিতেছে। লেখা প্রথমেই বর্ত্তমান আকার প্রাপ্ত হয় নাই। নানাবিধ দুর্ব্বোধ চিত্র, বক্র অতিবক্র রেখা ইত্যাদির মধ্য দিয়া অক্ষর সকল বর্ত্তমান রূপ ধারণ করিয়াছে। ইহাই যে শেষ আকৃতি, তাহাও বলা যায় না। প্রথম হইতে প্রস্তর, বৃক্ষপত্র ও বৃক্ষত্বক্, পশুচর্ম্ম ইত্যাদি নানাবিধ পদার্থের উপর লেখা হইয়া আসিয়াছে; এক্ষণে কাগজ ব্যবহৃত হইতেছে। কথিত ভাষার আবিষ্কারের পরে সভ্যতার উন্নতিসাধন করিবার এত বড় প্রবল সহায় আর কিছুই হয় নাই বলিলে, বোধ হয়, অত্যুক্তি হইবে না।

ইহার পরের আবিষ্কার বারুদ সভ্যতার সহায়ক, এ কথা শুনিলে অনেকে কাণে হাত দিতে পারেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই মারাত্মক যমদূতের অস্ত্রগুলিও সভ্যতার উন্নতিসাধন করিয়াছে। সাংঘাতিক অস্ত্রশস্ত্র যেমন একদিকে হত্যা-

কার্য্য করিয়া পশুত্বের পরিচয় দেয়, তেমনই, অন্যদিকে হতাবশিষ্টদিগের আহার-সংগ্রহের ও বংশবৃদ্ধির সুবিধা করিয়া দিয়া, মানবের অশেষ উপকার করে। পালন ও সংহার, পৃথক্ পদার্থ নহে, একের নিমিত্তই অন্য আবশ্যক। সুতরাং সপ্তম আবিষ্কার বারুদকেও সভ্যতা-বিস্তারের সহায়-স্বরূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে। বারুদ-আবিষ্কারের পর যুদ্ধবিগ্রহে হত্যাকার্য্যের বাহুল্য হইয়াছে সত্য, কিন্তু যুদ্ধবিগ্রহ ঘোষণা করিবার পূর্ব্বে লোকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ইতস্ততঃ করিতেছে। যখন মৃত্যুর আশঙ্কা অল্প, তখনই যুদ্ধও সহজেই বাধিয়া উঠে; এই আশঙ্কা অধিক থাকিলে, যুদ্ধ কম বাধিত। সুতরাং মারাত্মক অস্ত্রাদি মোটের উপর মানবসমাজকে উন্নতই করিয়াছে। উহারা বিভিন্নজাতীয় মানবকে পরস্পরের সহিত সংস্পৃষ্ট করিয়াছে, ভাব-বিনিময়ের সুবিধা ও সভ্যতা-বিস্তারের সহায়তা করিয়াছে। এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে পূর্ব্বকালের যুদ্ধ বিগ্রহ বর্ত্তমান কালের ন্যায় এত অধিক মারাত্মক ছিল না, একথা সত্য। কিন্তু এ স্থলে এ কথা বিস্মৃত হওয়া যায় না যে, যেরূপ সংস্রবের, ভাব-বিনিময়ের ও সভ্যতা-বিস্তারের কথা উল্লেখ করিলাম, তাহাতে অনেক জাতি, বিশেষতঃ বিজিত জাতি, কখনও কখনও জগৎ হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছে। মহাত্মা ডারুইন স্বীয় অমর গ্রন্থের (১) প্রথম খণ্ডের সপ্তম অধ্যায়ে এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। ইহাতে কোনও জাতি উচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, অথবা এখনও যাইতেছে সত্য, কিন্তু মানব জাতির সভ্যতা যুগে যুগে ক্রমবিবর্ত্তিত হইতেছে, সন্দেহ নাই। জাতি মরে, কিন্তু তাহার সভ্যতা মরে না, কোনও না কোনও ভাবে উহা সজীব থাকিয়া মানব-জাতির কল্যাণসাধন করে। জগতে মোটের উপর কল্যাণ ভিন্ন অকল্যাণ নাই। বারুদ-আবিষ্কার এ নিয়মের বহির্ভূত নহে।

ইহার পরেই বিদ্যুৎ-আবিষ্কাররর কথা বলিতে হয়। অর্থাৎ, উহা প্রস্তুত করিবার প্রণালী-উদ্ভাবনের কথা এ স্থলে সহজেই মনে হইতে পারে। কিন্তু আমি ইহাকে মানবীয় সভ্যতার বাহ্য বিকাশের সহিত গুরুতররূপে সংস্পৃষ্ট মনে করি না। এ নিমিত্ত আমি অষ্টম ও শেষ আবিষ্কারের স্থলে ব্যোমযানের উল্লেখ করিব। এই আবিষ্কারের যুগ চলিতেছে। কালে এই হেতু মানব-সভ্যতা কি আকার ধারণ করিবে, তাহা নিশ্চয় বলা কঠিন। মানব বাষ্পীয় শকট ও অর্ণবপোত নির্ম্মাণ করিয়া জলে স্থলে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়াছে। এখন সে

(১) Descent of man.

আকাশ বিজয় করিতে প্রয়াসী হইয়াছে। যদি সফল হয়, তাহা হইলে তাহার দেহ ও মন নিশ্চয়ই অন্যভাবে বিবর্ত্তিত হইবে। সুতরাং তাহার সভ্যতাও ভিন্ন আকার ধারণ করিবে, সন্দেহ নাই। ইহাতে বিভিন্ন জাতির মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহও কমিয়া যাইতে পারে। আর যদি না কমে, তবে নিশ্চয়ই ধ্বংসক্রিয়া এতই বৃদ্ধি পাইবে যে, তাহা কল্পনা করিতেও হৃৎপিণ্ড স্তম্ভিত হয়। এই আবিষ্কারের ফল যেরূপই হউক, উহা মানব সভ্যতাকে গুরুতর ভাবে পরিবর্ত্তিত করিবে, সে বিষয়ে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই।

আমরা যে দিক হইতে সভ্যতার বিকাশের আলোচনা করিতেছি, দেখিলাম, উহা কতিপয় আবিষ্কারের উপর নির্ভর করিতেছে। উহাতে এক দিকে যেমন নির্দ্দিষ্ট সমাজের বন্দন দৃঢ় করিতেছে, অপর দিকে তেমনই বাহ্য প্রকৃতির উপর মানবের আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। কিন্তু সভ্যতার এই দিকটা বাহ্যিক, ইহা পারমার্থিক নহে। মানব সমাজ মানসিক উন্নতিতে অগ্রসর হইতে না পারিলে তাহার সভ্যতা অতিশয় অকিঞ্চিৎকর। মনের উন্নতিই প্রধান কথা। দেহ যে পরিমাণে মনের সহায়তা করে, সেই পরিমাণে প্রয়োজনীয়, সত্য; কিন্তু মনই প্রধান পদার্থ। বাহ্য জগতের অনুশীলন করিতেও মন বিশেষ ভাবে উন্নত হইতে পারে, সন্দেহ নাই। কিন্তু মানব মন শ্রীভগবানের পদে আকৃষ্ট হওয়াই পরম পুরুষার্থ, উহাই জীবনের প্রধান লক্ষ্য। সমাজ ঐ দিকে অগ্রসর হইলেই প্রকৃত সভ্যতার অধিকারী হইল; নচেৎ সকলই সভ্যতার ভাণ মাত্র। ইহা মানব সমাজ যত শীঘ্র হৃদয়ঙ্গম করে, ততই মঙ্গল। অধুনা সমাজ-নীতির সহিত ধর্ম্মনীতির প্রভেদ ক্রমেই স্পষ্টীকৃত হইতেছে। ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর নাই। ভারতবর্ষীয় হিন্দু বর্ত্তমান সভ্য জগৎকে এই শিক্ষা দিবার নিমিত্তই আজিও জীবিত আছে। এ শিক্ষা ভারতের নিজস্ব। ইহাই তাহার বিশেষত্ব। ভারতবর্ষকে এই শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিতে হইবে। বিধাতার ইচ্ছা এই দিকেই অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিতেছে। বিধাতার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

জাতীয় উৎকর্ষ।

এই গুরুতর বিষয়ের অবতারণা মাত্রই আমার উদ্দেশ্য। অনুকূল সময়ে এ বিষয়ে জাতীয় দৃষ্টি যথাযোগ্যরূপে আকর্ষণ করিতে পারিলেই কৃতার্থ হই।

মানব সমাজ কি লইয়া বড়াই করিবে? ধন, জন, শক্তি না আধিপত্য? কিসের গৌরব প্রকৃত গৌরব? কিসের উন্নতি প্রকৃত উন্নতি? ধনে উন্নতি হইলে, ইহুদি জাতির আজ এ অবস্থা দেখিতাম না। জগতে তাহাদের মাথা লুকাইবার স্থান পর্য্যন্তও নাই। শক্তি ও আধিপত্যই যদি উন্নতি হইত, তবে রোম আজিও জীবিত থাকিত। প্রচলিত শিক্ষা ও শাস্ত্র-জ্ঞান যদি স্থায়ী উন্নতির চিহ্ন হইত, হিন্দু জাতি এরূপ অধঃপতিত হইত না। এ সকল কি উন্নতি নহে? উন্নতি অবশ্যই। কিন্তু বালির উপর জলের লেখা মাত্র। কত সমাজ, কত সাম্রাজ্য জল বুদ্বুদের ন্যায় উঠিয়াছে, আবার তখনই অনন্তকাল-গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ"। বাণিজ্যই অর্থাগমের শ্রেষ্ঠ পন্থা। কিন্তু আরবগণের, ফিনিশিওগণের, স্প্যানিয়ার্ডগণের, ওলন্দাজগণের ন্যায় বাণিজ্যের উন্নতি ও প্রসার পুরাকালে আর কে করিয়াছে? আজি তাহাদের ভাগ্যলিপি পাঠ করুন, বুঝিবেন—যে লক্ষ্মী বাণিজ্যে বাস করেন, তিনি চঞ্চলা, অতি মাত্র চঞ্চলা, তাহাতে সন্দেহ নাই। সমাজ-তত্ত্ববিৎ ডাক্তার রেণ্টুল গভীর মর্ম্মবেদনার সহিত বলিয়াছেন, "টাকা, টাকা, টাকা, কম্পানির ডিভিডেণ্ট শতকরা ২০৲ কুড়ী টাকা, সেয়ারের দাম ক্রমেই চড়িয়া গেল। কিন্তু ফলে লাভ হইল জননহীনতা আর অধঃপতন"।* টাকায় উন্নতি নাই, বাণিজ্যে উন্নতি নাই। অর্থাৎ অর্থের উন্নতি অতিশয় ক্ষণস্থায়ী।

শক্তি আধিপত্য—এ সকলের উন্নতিই বা কি? রোমের ন্যায় অতুলনীয় শক্তি প্রাচীন জগতে কাহার ছিল? বর্ত্তমান যুগেও রুশিয়ান্ কশাকের ন্যায় শক্তিশালী পুরুষ কে? ইংরাজ জাতিও প্রচুর শক্তিশালী।

---

*"Hustle hustle" may allow a company to declare a 20 per cent dividend and to rush up shares, but it steedily works for sterility and other forms of degeneracy.

Race Culture P. 82.

কিন্তু জীবতত্ত্ববিৎগণ, সমাজ-তত্ত্ববিৎগণ এই জাতির উন্নতির পরিণাম সম্বন্ধে যাহা মীমাংসা করিতেছেন, তাহা খ্যাতনামা পণ্ডিতগণের আলোচনা হইতেই অবগত হওয়া সঙ্গত, আমার বলিতে সাহস হয় না। জীব রাজ্যে দৈহিক শক্তিই উন্নতির মূল হইলে দুর্ব্বল, অসহায়, অরক্ষিত-দেহ মানব জগতে জীবশ্রেষ্ঠ হইত না। বিপুল সেনাসঙ্ঘ, ভয়ঙ্কর ধূমোদ্গারী সমরপোত—এ সকল মুহূর্ত্ত মধ্যে কালগর্ভে লীন হইতে পারে। পারস্যের ইতিহাস, স্পেনের ইতিহাস, এমন কি, বুয়ারদিগের ইতিহাসও এ বিষয় মুক্ত কণ্ঠে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। স্থায়ী উন্নতি এ সকলে নাই।

শিক্ষায়, জ্ঞান চর্চ্চায়, প্রাচীন জগতে, এবং বর্ত্তমান যুগেও প্রাচীন হিন্দু জাতির তুলনীয় কে? কিন্তু আজি তাহাদিগের কি দশা! এ দিকেও স্থায়ী উন্নতি নাই।

সহজ কথায় বলিব, যে যত উঠিয়াছে, সে তত পড়িয়াছে; কারণ সে উঠিতে জানে নাই। প্রাচীন জগৎ যাহাকে উঠা বলিয়াছে, তাহা উঠা নহে। তাহা পড়িবার জন্যই উঠা। এতদিন যাহাকে উন্নতির লক্ষণ স্থির করিয়া রাখিয়াছি, তাহা উপরের বার্ণিশ, অচিরেই ফাটিয়া চটিয়া যায়। তথাকথিত উচ্চ সভ্যতা, তথাকথিত শক্তিশালী সাম্রাজ্য, এ সকল বিনষ্ট হইল কেন? ডাক্তার সেলেবির ভাষায় বলিতে গেলে, জিজ্ঞাসা করিতে হয়, "Why is it that not enslaved but Imperial peoples degenerate? Why is it that nothing fails like success?"* এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিতেছেন যে, সভ্যতা ও সাম্রাজ্য মানুষেই রক্ষা করে; বংশানুক্রমের নিয়ম জ্ঞাত না থাকায় প্রাচীনগণ মানুষ গড়িতে জানেন নাই, তাই অনুপযুক্ত মানব যুগ-পরম্পরাগত বাহ্য সভ্যতার ভার বহন করিতে পারে নাই। উহা তাহাদিগের অবনত প্রকৃতির উপযোগী হয় নাই। মানুষ দেহে ও মনে অবসন্ন হইলে বাহিরের উন্নতির চাপ সহিবে কে? †

বৈজ্ঞানিক আমাকে শিখাইয়া দিলেন,—এইরূপে এইরূপে মানব আকাশ

---

* Parenthood and Race culture P. 264.

† I believe then that civilization and Empire have succumbed because they represented only acquired or traditional or educational progress and this awaited not at all when the races that built them up began to degenerate. Ibid p. 203.

পথে উড্ডীয়মান হইতে পারে। কিন্তু আমার সে সাহস নাই, আমার সে অধ্যবসায় নাই, আমার সে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব নাই, আমি দেহে ও মনে অবনত; আমি কেমন করিয়া উঠিব? উঠিলেও অচিরেই পড়িয়া গিয়া মানবলীলা সম্বরণ করিব। আমার উপরেই সব নির্ভর করে। ব্যক্তির উপরেই সব। ব্যক্তি যদি অবনত হইয়া গেল, তবে সামাজিক উৎকর্ষের কোন অর্থই থাকে না। সমাজের একমাত্র সম্পত্তিই ব্যক্তি; ব্যক্তিই জাতির একমাত্র ধন। রাস্‌কিন বলিয়াছেন "there is no wealth but life." ডাক্তার সেলেবি এই কথাকেই অন্য ভাবে বলিতেছেন, "there is no wealth but mind" ব্যক্তি ভিন্ন সমাজের আর সম্পত্তি নাই। ব্যক্তির সম্বলও দেহ এবং মন। মন দেহেরই বিকাশ, অথবা দেহই মনের বিকাশ, এ তর্কের অবতারণা করিব না। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, দেহের সহিত মনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। ডাক্তার ব্যাষ্টিয়ান্ অধ্যাপক লেব প্রভৃতি মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ দেখাইতেছেন যে, স্নায়ুমণ্ডলীর গঠনের উপর এবং জ্ঞাত-অজ্ঞাত প্রতিক্রিয়ার উপরই মন বিশেষ রূপে নির্ভর করে।* স্নায়ুমণ্ডলের সর্ব্বোচ্চ পরিণতি মস্তিষ্ক। মস্তিষ্ক হইতে সমস্ত মেরুদণ্ডে বিন্যস্ত হইয়া স্নায়ুমণ্ডল দেহের সর্ব্বত্র প্রসারিত হইয়াছে। বাহ্য জগতের ঘাত প্রতিঘাত, দেহাভ্যন্তরের ক্রিয়া প্রতি-ক্রিয়া স্নায়ু পথে মস্তিষ্কে নীত হয়, এবং তথায় উপযুক্ত কেন্দ্রে অনির্ব্বচনীয় উপায়ে ভাবে পরিণত হইয়া আমাদিগের বোধগম্য হইয়া থাকে। সেই ভাবতরঙ্গ মস্তিষ্ক হইতে বহির্গত হইয়া পেশি-সংযোগে কর্ম্মে পরিণত হয়। স্নায়ু দ্বিবিধ; অন্তর্ব্বাহী ও বহির্ব্বাহী।† যে সকল স্নায়ু ঘাত প্রতিঘাত সকলকে মস্তিষ্কে লইয়া যায়, তাহারা অন্তর্ব্বাহী, আর যে স্নায়ু ঐ সকলকে তথা হইতে পেশি মণ্ডলীতে লইয়া আসে, তাহারা বহির্ব্বাহী। যে সকল ঘাত প্রতিঘাত, ক্রিয়া প্রতি-ক্রিয়া মস্তিষ্কে নীত হয়, তাহারা তথায় পদাঙ্ক রাখিয়া যায়। ইহাই স্মৃতির মূল। স্মৃতি আত্মবোধের প্রধান লক্ষণ। আর আত্মবোধ হইতেই মনের অনেক ভাব উদ্ভূত হইয়াছে। স্নায়ু মণ্ডলই মনের উপকরণ; অন্ততঃ স্নায়ুমণ্ডলের উত্তেজনাই মনকে বিকশিত করিয়াছে। মস্তিষ্ক পদার্থের ঊর্দ্ধতন ভাগই মানবকে মানব নামের অধিকারী করিয়াছে। যে জীব স্নায়ু বিধানে উন্নত, সে মনেও উন্নত। তাই বলিয়াছি, দেহ ও মনে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। দেহসহ স্নায়ুবিধানও আমরা বংশ-পরম্পরা-ক্রমে প্রাপ্ত

* Brain as an organ of mind. chap, V.

† Afferent and Efferent.

হইয়াছি। সুতরাং মনও বংশ পরম্পরাগত। অব্যবহিত হউক, দূরবর্ত্তী হউক, পূর্ব্ব পুরুষগণই আমাদিগের মনের নিয়ামক। সদ্যোজাত শিশু শূন্য মন লইয়া জন্মে না। কত যুগ যুগান্তরের ছায়া বহন করিয়াই জাত হয় *। সমাজের প্রধান সম্পত্তি, ব্যক্তি, ব্যক্তির প্রধান সম্পত্তি মন।; আর সেই মন পূর্ব্বপুরুষাগত। সুতরাং মনের উন্নতি অবনতি ও সমাজের উন্নতি অবনতি এক সূত্রেই গ্রথিত।† সমাজের উৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে বংশানুক্রমের নিয়ম অনুসরণ করতঃ মনের উৎকর্ষ সাধন করিতে হয়। প্রাচীন সভ্যতা এই লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিল। রোম, গ্রীস, স্পেন, আরবস্থান, এমন কি, চীন এবং ভারতবর্ষেও মনের বংশানুক্রমিক উন্নতির দিকে যত্নবান হওয়া দূরে থাকুক, তেজস্বী মন এবং একাগ্রহৃদয়কে,সামাজিক ও রাজনীতিক দণ্ডে দণ্ডিত, অবরুদ্ধ, এমন কি, ভস্মীভূত করিতেও ক্রটী করে নাই। সবল দেহ, তেজস্বী মন প্রাচীন যুগে নানাবিধ রূপে নিষ্পেষিত হইয়াছে। পর পর বংশ গড়িবে কে? তাই তাহাদিগের সভ্যতা স্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ অচিরেই বিনষ্ট হইয়া গেল। অতীতকালেও উন্নতি অবনতি ব্যক্তির উপর নির্ভর করিয়াছে, ভবিষ্যতেও তেমনিই সামাজিক উন্নতি ইহারই উপর নির্ভর করিবে। নতুবা কোন উন্নতিই স্থায়ী হইবে না। উপযুক্ত পিতা মাতা, উপযুক্ত সন্তান লাভ করিলে, সমাজ উন্নত হইবে। নচেৎ অন্য উপায় নাই। ব্যক্তি গাছে ধরে না। তাই পিতৃ মাতৃ নির্ব্বাচন সামাজিক উন্নতি অবনতির, অর্থাৎ স্থায়ী উন্নতি অবনতির একমাত্র কারণ। মানব-শিশু যে উপকরণ লইয়া জন্মিবে, যেরূপ দেহ ও মন লইয়া মাতৃগর্ভে সংস্থিত হইবে, তাহার নিকট তদতিরিক্ত ফল আশা করা যায় না। মানুষকে কাদার মত গড়িয়া পিটিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করা যায় না। যে শিশুর যথাযোগ্য উপকরণ নাই, তাহাকে গড়িলে পিটিলেও শঙ্করাচার্য্য হইবে না। শিক্ষা দিলে শিক্ষা বিফল হইবে। শিক্ষার উপযোগীতাই তাহার নাই, শিখিবে কেমন করিয়া? সকলকেই শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে, একথা বলিয়া সমাজকে প্রতারিত করা অত্যন্ত অসঙ্গত! রেণ্টুল বলিতেছেন, "It is not honest for us fo gull the public into believing that these

* The tabula rasa of Locke is the last thing in the world to resemble a child's mind. Indeed the child's mind is a piece of mosaic—made of ancestral pieces. Parenthood P. 124.

† Weisman's Heredity Vol, II p. 22.

can be really educated.* ডাক্তার সেলেবী এই কথাই অন্য ভাষায় বলিতেছেন, "It must be maintained that education is limited in its power by the inherent nature of the educated material ; it is a process of drawing out and you can not draw out what is not there."অধ্যাপক টম্‌সন্ আরও দৃঢ়তর ভাষায় বলিতেছেন,"The psychical characters are inherited in the same way and at the same rate as the physical" অর্থাৎ মানবের দেহ যে পরিমাণ বংশপরম্পরা-গত, মনও তদ্রূপই। দেহ শুক্র-শোণিতের সংমিশ্রণ-জাত। সুতরাং মনও ঐ সংমিশ্রণেরই ফল। তাই টম্‌সন্ বলেন, জন্মগত ভাব কিছুতেই যাইবার নহে।* তবে কি আমরা সেই নিশ্চেষ্ট অদৃষ্ট-বাদে আসিয়া উপনীত হইলাম? না, তাহা নহে। শিশু যে উপকরণ লইয়া জন্মিয়াছে, তাহাকে তদুপযোগী পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে ফেলিতে হইবে। তাহা হইলেই তাহার অন্তর্নিহিত নিগূঢ় শক্তি পরিস্ফুট হইবে। হেকেল্ বলেন, ব্যক্তির প্রবণতা অর্থাৎ ঝোঁক বংশানুগত; কিন্তু কর্ম্মে তাহার বাহ্যবিকাশ হওয়া না হওয়া সাময়িক অবস্থার অধীন। এই সাময়িক অবস্থাই পারিপার্শ্বিক অবস্থা।† শিক্ষা এই পারিপার্শ্বিক অবস্থারই নামান্তর মাত্র।‡

এই আলোচনা হইতে কি বুঝিলাম ? বুঝিলাম,—ব্যক্তি গড়িতে হইলে, বংশ চাই; শিখাইতে হইলে, যথাযোগ্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিধান করা চাই। তাহা হইলে সেই পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপযোগী শিক্ষায় ব্যক্তির অন্তর্নিহিত নিগূঢ় উপকরণকে টানিয়া বাহির করিবে এবং তাহাই স্থায়ীত্ব লাভ করিব। নচেৎ যাহা তাহার আভ্যন্তরিক উপকরণের সহিত সামঞ্জস্য

* Nor from the moment of fertilization can teaching or hygiene or exhortation pick out the particles of evil in that zygote or put one particle of good. Thomson's Heredity p. 507.

† The character of the inclination was determined long ago by heredity from parents and ancestors, the determination to each particular act is an instance of adaptation to the circumstances of the moment where-in the strongest motive prevails.

The Riddle of the Universe, chap. V. II p.-47.

‡ Education the provision of an enviroment. Parenthood p 125.

রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না, তাহা বাহির হইতে আনিয়া লেপিয়া দিলে সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইবে; শুধু নিস্ফল নহে, অবনতির বীজ তখনই বপন করা হইবে। ইহাই প্রকৃত আশঙ্কা। *

এক্ষণে সামাজিক উৎকর্ষ সাধনের প্রকৃত তথ্য হৃদয়ঙ্গম করা অপেক্ষাকৃত সহজ হইতে পারে। আমরা দেখিয়াছি যে, আর কিছুতেই স্থায়ী উন্নতির আশা করা যায় না, সকলই দুদিনেই ফুরাইয়া যায়। কেবল যিনি সকল কর্ম্মের কর্ম্মী, সকল উন্নতি অবনতির কর্ত্তা, সেই "ব্যক্তি" যোগ্য হইলেই উন্নতি স্থায়ী হইল, নতুবা নহে। কিন্তু উন্নতি স্থায়ী হইলেও আশঙ্কা দূর হয় না। উন্নতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়া চাই। এ ক্ষেত্রে দাঁড়াইবার স্থান নাই। উন্নতি বন্ধ হইলেই অবনতি আরম্ভ হইবে। তবে ব্যক্তির উন্নতি কিরূপে সাধিত হইবে? কেবল মাত্র বংশ-পরম্পরার প্রতি মনোযোগ করিয়া, এবং যথাযোগ্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিধান করিয়া।

কিন্তু মানবের দুর্ভাগ্য বশতঃ এতদিন এদিকে কেহই লক্ষ্য করেন নাই। মানব গৃহপালিত পশুর উন্নতি বিধান করিতে গিয়া যে সকল নিয়ম স্বয়ং প্রতিপালন করিতেছেন, আপনার সম্বন্ধে সেই সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দ্রুতগামী অশ্ব চাই, ঘোড়দৌড় জিতিতে হইবে। অশ্ব-ব্যবসায়িগণ কি করিয়া থাকেন? বংশানুক্রমে যে অশ্ব এই কর্ম্মের উপযোগী, তাহাকে আনিয়া অথবা তাহা দ্বারা অশ্ব-শাবক উৎপন্ন করাইয়া লইয়া, উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করেন। যে-সে অশ্ব আনিয়া তাহাকে দ্রুতগমন শিক্ষা দেওয়াই যায় না। প্রচুর দুগ্ধবতী গাভী চাই, গোপালগণ কি করিয়া থাকেন? তদ্রূপ গাভীতে বৎস উৎপন্ন করাইয়া লন; তৎপর তাহাকে উত্তম আহার প্রদান করেন। সুবৃহৎ আম্রফল চাই। তখন মালদহী ফজলীর চারা করিতেই হইবে; যে-সে গাছে তাহা হইবেই না। মানুষ সকলই জানে। কিন্তু নিজের সম্বন্ধে তাহা একেবারেই বিস্মৃত হইয়া যায়। ব্যক্তির উৎকর্ষের দিকে লক্ষ্য করে না। যেমন তেমন নরনারী হইলেই হইল। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা এবং কখন কখন পুত্রদায়গ্রস্ত পিতাও, কোন প্রকারে দায় হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিলেই কৃতার্থ হন। এরূপ করিলে যথেচ্ছ পরিণীত নরনারীর সন্তান সন্ততি সাধারণতঃ অযোগ্যই হইয়া

* There is thus a real risk involved in the accumulation of acquired, traditional or educational progress. Ibid p. 265.

যাইবে। দৈবাৎ কথন যোগ্য পুত্রলাভ হইলে হইতে পারে। তখন সমাজও লাভবান হয়; নচেৎ সাধারণতঃ সমাজ ক্ষতিগ্রস্তই হইয়া থাকে। সমাজস্থ যোগ্য ও সুস্থ ও প্রাপ্ত-বয়স্ক ব্যক্তির অপত্য ভিন্ন সমাজের উৎকর্ষ সাধন করিবার আর কাহারও অধিকার নাই। * সাময়িক উত্তেজনায় যিনি যতই আস্ফালন করুন, আর কাহারও দ্বারাই সমাজের উন্নতি বিধান হইতে পারে না। সুতরাং সমাজের উৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে আমাদিগের প্রধান কর্ত্তব্য, কর্ম্ম দেহ ও মনে উৎকৃষ্ট নরনারীর যৌন সম্বন্ধ স্থাপন করা। মানসিক শক্তিও যে দৈহিক সবলতার ন্যায় বংশানুক্রমে অর্জ্জন করা যাইতে পারে, ইহাই সামাজিক উন্নতির প্রধান আশার স্থল। তাই কোন বিখ্যাত সমাজ-তত্ত্ববিৎ বলিয়াছেন, "There can be no question that amongst the promises of race culture is the possibility of breeding such things as talent and the mental energy upon which talent so largely depends" সুস্থ ও সবল দেহ, পবিত্র, তেজস্বী মন, শান্ত দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ স্বভাব,—এ সকলের অধিকারী ব্যক্তি অল্প সময় মধ্যেই সমাজের হিতার্থে যত কর্ম্ম করিতে সক্ষম হন, রুগ্নদেহী, দুর্ব্বল-মনা তাহা দীর্ঘকালেও সম্পন্ন করিতে সমর্থ হয় না। এ নিমিত্ত যিনি সমাজের মঙ্গল সাধন করিতে ইচ্ছা করিবেন, তিনি পরবংশীয়গণের পিতৃত্ব নির্ব্বাচনে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মনোযোগী হইবেন। পিতৃত্ব বলিতে মাতৃত্বকেও বুঝিতে হইবে। উন্নতির প্রধান উপায়, জ্ঞান পূর্ব্বক বিবাহ ক্ষেত্রের প্রসার এবং যথাযোগ্য ব্যক্তির বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন। রুগ্ন, পতিত ব্যক্তিগণের দ্বারা পরবর্ত্তী বংশ গঠিত হইলে সামাজিক অবনতির হস্ত হইতে অব্যাহতি নাই। যাহারা বংশানুক্রমিক উৎকট পীড়াগ্রস্ত, যাহারা মদ্যপায়ী, সুরা প্রভাবে যাহাদিগের দেহ ও মন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, ইন্দ্রিয়পরায়ণ, নরহন্তা, দস্যু তস্কর পরস্বাপহারী প্রভৃতি যাহারা সামাজিক অপকর্ম্মসাধনে একান্ত অনুরক্ত, যাহারা অন্ধ, খঞ্জ, বিকৃতমনা, এ সকল ব্যক্তির অপত্যোৎপাদন সামাজিক অবনতির প্রধান হেতু। ইহাদিগের বিবাহ নিষেধ করা, বোধ হয়, অরণ্যে রোদন করা মাত্র হইবে; কিন্তু ইহারা যাহাতে সন্তান উৎপাদন করিতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

---

* No race or species, vegetable animal or human, can maintain much less raise its organic level unless its best be selected for parenthood. Ibid P. 264

' যতদিন সমাজ ঈদৃশ বিধানে সম্মত না হইবে, ততদিন স্থায়ী উন্নতির আশা করা দুরাশা মাত্র। সামাজিক উন্নতি ব্যক্তির রক্ত-মাংসের মধ্যে নিহিত, বাহিরের চাকচিক্য কিছুই নহে।

বাহিরের চাকচিক্য বলিতে কি বুঝি? আমি বর্ত্তমান সভ্যতা বুঝি। নয়ন-মনোহর গগনস্পর্শী সৌধমালা, বৃক্ষ লতাবিভূষিত প্রশস্ত রাজপথ, বিচিত্র উদ্যান, গাঢ় কৃষ্ণ ধূমোদ্গারী বিশাল আগ্নেয় যন্ত্র, মনের ন্যায় বেগগামী বিদ্যুৎ প্রবাহ-বাহী অদ্ভুত তড়িৎ যন্ত্র, মানবের ভাষানুকারী আশ্চর্য্য বাগ্-যন্ত্র, এ সকল কি সভ্যতার পরিচায়ক নহে? অবশ্যই পরিচায়ক। যে সমাজ এ সকল উদ্ভাবিত করিতে পারে, সে সমাজ মনের উন্নতি পথে অগ্রসর হইয়াছে সন্দেহ নাই। বিজ্ঞান মানবের সুখ বিধানের প্রধান সহায়। বিজ্ঞান ব্রহ্মাণ্ডের রহস্য উদ্ঘা-টন করিয়া মানবকে তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দিবার প্রধান উপকরণ। এ সকল আমি কতবার বলিয়াছি! ইহা আমি মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতেছি। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস আদির চর্চ্চা মানবকে মানব নামের অধিকারী করে; ইহা সত্য। কিন্তু এ সকল বাহির হইতে কেবল মাত্র অনুকরণ দ্বারা প্রাপ্ত হইলে ফল স্থায়ী হইতে পারে না। সমাজের মধ্য হইতে গড়িয়া উঠা চাই। এ সকলের উপযোগী ব্যক্তি সমাজে জাত হওয়া চাই। সমাজ এ সকল পাইলেই কৃতার্থ হয়, তাহা নহে। সমাজ যন্ত্র চায় না, জীবন চায়। বিজ্ঞান চায় না, ব্যক্তি চায়। তাই সূক্ষ্মদর্শী সেলিবি বলিতেছেন the products of progress are not mechanisms but men. অযোগ্য মানুষ অনুকরণ করিয়া বাহির হইতে যাহা প্রাপ্ত হইবে, তাহা সে কথনই আত্মসাৎ করিতে পারিবে না। তাহা তাহার নিজস্ব কথনই হইতে পারিবে না। তাহার ভারে সে আপনই চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। প্রাচীন ও বর্ত্তমান কালে অনেক সমাজ সভ্যতায় অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু সমাজের যাহা প্রধান সম্পৎ, সেই মানুষকে, সেই জন্মগত মানুষকে, প্রাপ্ত হইবার কৌশল শিক্ষা করে নাই। তাই মানুষের অভাবে কোন সমাজের সভ্যতাই স্থায়ী হইল না। মানুষ গড়ি-তেই হইবে। কেমন করিয়া গড়িব? ইহাই মানবের প্রধান আলোচ্য। লোক তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতবর হ্যাডেন্ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, it seems strange that man should study every thing in heaven and earth and largely neglect the study of himself, this is what has virtually happened * * * after all we are of more

interest to ourselves than any study can be. ‡ মানুষ সকলই আলোচনা করে, কেবল নিজের বিষয় আলোচনা করে নাই। আর সময় নাই, মানুষ গড়িতেই হইবে। কিন্তু ইহাও কি সম্ভব? মানুষ কি ইচ্ছামত গড়া যাইতে পারে! মানব শিশু জন্মিবার পর আর ইচ্ছামত গড়িয়া পিটিয়া তোলা যায় না, সত্য। কিন্তু জন্মিবার পূর্ব্বে, যাঁহাকে আহ্বান করিতেছি, তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার চেষ্টা একেবারে নিষ্ফল নহে। মানবের প্রযত্ন এ ক্ষেত্রে একেবারেই বৃথা হয় না। ইচ্ছামত পুত্রকন্যা লাভ সহজসাধ্য নহে; কিন্তু বংশানুক্রমের নিয়ম সকল, পরিবর্ত্তনের ও বিবর্ত্তনের * নিয়ম সকল, স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যভঙ্গের তথ্য সকল স্মরণ রাখিয়া যথারোগ্য নরনারীর পবিত্র বিবাহ বন্ধন স্থাপন করিতে জানিলে, মানব-প্রযত্ন সফলতার দাবী করিতে পারে। কিন্তু এ সকল অবগত হওয়া শ্রমসাধ্য। এ শ্রম স্বীকার করিতেই হইবে। এ শাস্ত্রকে প্রধান আলোচ্য বিষয় বলিয়া গ্রহণ করিতেই হইবে।

সকলেই জানেন, আমরা বাঙ্গালী জাতি; ক্রমশঃ অবনত হইয়া যাইতেছি। বিবাহ ক্ষেত্র এত সংকীর্ণ কাহার হইয়াছে? ফলও হাতে হাতে পাইতেছি। কাহারও বিবাহ হইতেই পারিল না; কাহারও বা বিবাহ হইল, অপত্য হইল না। কাহারও সন্তান সন্ততি প্রায় মরিয়াই গেল। উচ্চ শ্রেণীস্থ হিন্দু ৪০।৫০ বৎসরের মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেক হইয়া গেল। মোটের উপর বাঙ্গালী বাড়িতেছে; কিন্তু বাড়িবার হার ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে। বাঙ্গালীর সংখ্যা বৃদ্ধি প্রায় নিম্ন শ্রেণীতেই দেখা যায়। সরকারী আদমশুমারীও এই সকল কথা সমর্থন করে। কেবল নিম্নশ্রেণী হইতে সমাজকে গড়িয়া তুলিলে, সমাজ ধনশালী হওয়া সম্ভব, কিন্তু যোগ্য হইবে না। সুতরাং উন্নত হইবে না।

ইহুদি জাতির লোকতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলে মনে এক অভূত-পূর্ব্ব আশার সঞ্চার হয়। ইহাদিগের প্রায় সকলই গিয়াছে। দেশ নাই, ঐক্য নাই, শিক্ষা নাই, জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোচনা একেবারেই নাই। যন্ত্রবহুল সভ্যতার কিছু মাত্র নাই। কিন্তু ইহাদিগের প্রধান সম্পত্তি এখনও অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। ইহাদের ব্যক্তিত্ব অবনত হয় নাই। ইহারা দেহে ও মনে কেমন সুন্দর! ইহাদিগের সুগঠিত দৃঢ় বলিষ্ঠ দেহ নয়নাভিরাম। ইহাদিগের মধ্যে সামাজিক পাপে কলঙ্কিত ব্যক্তির সংখ্যা নগণ্য বলিলেই হয়। উৎকট পীড়াগ্রস্ত, মস্ত-

‡ Study of Man pp XV. XXIV.

* Fluatuating variation and mutation

পায়ী, নীচপ্রকৃতি ইহুদির সংখ্যা নিতান্তই কম। ইহাদিগের সদ্যোজাত শিশু আকৃতিতে, বক্ষঃ-পরিমাপে, এবং গুরুত্বে অনেক জাতিকেই পরাভব করে। ইহাদিগের মধ্যে শিশু মরণ সর্ব্বাপেক্ষা কম। † ইহাদিগের জনসংখ্যা অধিক বিস্তৃত না হইলেও নিতান্ত কম নহে। ইহাদিগের ধৈর্য্য, একগ্রতা, উদ্যমশীলতা জগতের ঈর্ষা বৃত্তি জাগাইয়া তুলিয়াছে। ইহাদিগের উপর যুগে যুগে কত অত্যাচার উৎপীড়ন চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহারা পর্ব্বতের ন্যায় অটল। তথা-কথিত সভ্যতায় ইহারা পতিত; কিন্তু মানব-সম্পৎ কাহারও অপেক্ষা ইহাদিগের ন্যূন নহে; তাই ইহাদিগের ভবিষ্যতের আশা আছে। ইহার গূঢ় রহস্য কি? যে বিপদরাশি পুনঃ পুনঃ ইহাদিগকে নিষ্পেশিত করিবার চেষ্টা করিয়াছে, তাহাই ইহাদিগের রক্ষা-কবজ স্বরূপ হইয়া যুগে যুগে রক্ষা করিয়াছে। ঐ বিপদ রাশি মধ্যে অযোগ্যের স্থান হয় নাই; তাহারা নিষ্পেষিত হইয়া কালগর্ভে বিলীন হইয়াছে। যাহারা জীবিত আছে, তাহারা বাছা লোক। দৈহিক ও সামাজিক বলে যাহারা বলীয়ান ছিল, চরিত্র গুণে যাহারা তেজস্বী ছিল, তাহারাই সহস্র উৎপীড়ন সহ্য করিয়াও জাতীয় বিজয় পতাকা স্বরূপ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তাহারা বিজয়ী, তাহারাই ইহুদি সমাজের যোগ্যতম ব্যক্তি। যোগ্যতমের জয় চির প্রসিদ্ধ। তাই ইহুদি সমাজ আজ ব্যক্তিত্বে সৌভাগ্যশালী।* ইহাদিগের বিবাহ-বন্ধন যোগ্যে যোগ্যে। যে যোগ্যতমেরা রহিয়া গিয়াছে, তাহারাই এখন পর পর বংশ গঠিত করিতেছে। তাই বলিয়াছি, ইহাদিগের আশা আছে। বাঙ্গালী হিন্দু জাতির কি আশা নাই?

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে পূর্ব্বের কথা স্মরন করা আবশ্যক। আমরা

† All observers are agreed that infant mortality is at a minimum amongst the jews ; their children are superior in height and weight and chest measurment to gentile children.

Parenthood p, 274.

* Every measure of persecution practised against them has directly tended towards this very end* * *their unexampled struggle has been a great source of their unexampled strength. The weaklings and the fools being weeded out, intensity and strength of mind became the common heritage of this amazing people.

I bid p. 274.

বলিয়াছি মানবের মন, স্নায়ু-মণ্ডলীর ও তাহার শেষ-পরিণতির অর্থাৎ মস্তিষ্ক পদার্থের উপর নির্ভর করে। স্নায়ুতে ও মস্তিষ্কে যে সকল স্নায়ু-গণ্ড অবস্থিত, তাহারা মন বিকাশের বিশেষ সহায়তা করে। মনের ক্রিয়া দৈহিক আর কোন যন্ত্রের উপরই সাক্ষাৎ স্বরূপে নির্ভর করে না। অন্য যন্ত্রাদি পুষ্ট ও সুস্থ না থাকিলে স্নায়ুমণ্ডল ক্রিয়া করিতে সম্পূর্ণ বা আংশিক রূপে অসমর্থ হয়। তাই উহারা যে পরিমাণে স্নায়ুমণ্ডলের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার সহায়তা করে, সেই পরিমাণই মনের বিকাশের নিমিত্ত আবশ্যকীয় হয়, নতুবা আবশ্যকীয় হইত না। মনের উন্নতিতেই যদি মানুষ মানুষ-নামের যোগ্য হয়, আর স্নায়ুমণ্ডলই যদি মন বিকাশের একমাত্র যন্ত্র হয়, তবে সেলিবি সত্যই বলিয়াছেন, the nervous system is the man মানুষ বলিতে স্নায়ুমণ্ডলকেই সুতরাং মনকেই সূচিত করে। মনই মানুষ।† এক্ষণে নিম্নতর জীবগণের কথা স্মরণ করুন। প্রথমজ ও কীট শ্রেণী হইতে মৎস্য, উভচর, সরীসৃপ, পক্ষী, ও স্তন্যপায়ী পর্য্যন্ত, যাহার স্নায়ুমণ্ডল যত প্রকটিত হইয়াছে, মনও তাহার ততই বিকশিত হইয়াছে। প্রথমজ প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীতে দেহই প্রধান, মন প্রায় কিছুই নহে। উত্তরোত্তর দেহের প্রাধান্য কমিয়া মনই প্রবল হইয়াছে।§ মানবের দেহ ত নাই বলিলেই হয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, হস্ত, পদ পৃষ্ঠ বংশ, পঞ্জর, পাকস্থলী, অন্ত্র হনু ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্র সকল ইতর জীবের তুলনায় মানবের কতই অবনতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে। ইহারা সকলেই ধ্বংসাভিমুখ।* মানবের ক্ষীণ, দুর্ব্বল দেহ জীবন সংগ্রামে জয়ী হইতে কখনই পারিত না। মানবের মনই তাহাকে জীব রাজ্যের শীর্ষ স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। মানবের মস্তক ও মস্তিষ্কই তাহার প্রধান বিশেষত্ব। অন্যের পক্ষে দেহই প্রধান সম্বল, কিন্তু মানবের মনই প্রধান। তাই মানব-সমাজের উন্নতির প্রধান উপায় মনের উৎকর্ষ সাধন; অর্থাৎ স্নায়ুমণ্ডলের উৎকর্ষ সাধন। স্নায়ুমণ্ডলের ক্রিয়া-প্রবণতার বাহ্য লক্ষণ, ভাব, বুদ্ধি ও উদ্যমশীলতা। সামাজিক প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত, সমাজের হিতার্থে এ সকলকে যিনি যত অধিক নিয়োগ করেন, তাঁহার সন্তান সন্ততি ততই সমাজের উৎকর্ষ সাধন করিতে সক্ষম হয়। দেহকে

---

† এস্থলে মন = জীবাত্মা।

§ Man is above all things a mind,
Parenthood. 54.

* মৎপ্রণীত পরবশতা গ্রন্থে "মানব দেহের পরিণতি" দ্রষ্টব্য।

* Descent of man P. 219—220.

তুচ্ছ করিতেছি না; দেহ পুষ্ট ও সুস্থ থাকিলে স্নায়ুমণ্ডলের সুতরাং মনের ক্রিয়ার সহায়তা করে। কিন্তু প্রধান লক্ষ্যই মন। যিনি এই পদার্থের প্রকৃত অধিকারী, তিনিই পর পর বংশ গঠন করিবার অধিকারী। মানব সমাজের স্থায়ী উৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে বংশপরম্পরায় মনের উৎকর্ষই সাধন করিতে হয়। ব্যক্তিগত উৎকর্ষ অপেক্ষাকৃত সহজ কথা; কিন্তু জাতীয় উৎকর্ষ, উন্নতমনা নরনারীদিগের যৌন-সম্বন্ধ স্থাপন এবং দুর্ব্বল অধঃপতিতদিগের যৌন সম্বন্ধ নিষেধ, এই দুইয়ের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। এই দুই সংস্কার যুগপৎ সিদ্ধ না হইলে সুফলের আশা নাই।

এক্ষণে পূর্ব্বপ্রশ্নের সদুত্তর বিবেচনা করুন। বাঙ্গলী জাতির কি আশা নাই? বাঙ্গালী দীর্ঘকাল অনেক উৎপীড়ন সহ্য করিয়াছে, তাহাদিগের দেহ অবসন্ন হইয়াছে, তথা-কথিত সভ্যতার লক্ষণ সকল অনেক তিরোহিত হইয়াছে, কিন্তু স্নায়ুমণ্ডলের শক্তির ও প্রভাবের হ্রাস কোন অংশেই দেখা যায় না। জাতীয় কর্ম্মে অনভ্যাস বশতঃ অথবা জাতীয় কর্ম্ম আয়ত্ত্ব না থাকায় মনে কিছু কিঞ্চিৎ জড়তা না আসিয়াছে, তাহা নহে; কিন্তু তাহাদিগের ভাব, বুদ্ধি ও উদ্যমশীলতা এখনও বিনষ্ট হয় নাই। ইহুদি জাতির ন্যায় বাঙ্গালী জাতিরও উপকরণ ঠিক আছে, কেবল বিকাশ নাই। আর, নাই বা বলি কেন? যে জাতি এত হীন অবস্থার মধ্যেও, এত পরিপার্শ্বিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্রকে, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, রামতনু ও দেবেন্দ্রনাথ, রামমোহন ও জগন্নাথ তর্ক-পঞ্চাননকে এবং সর্ব্বোপরি চৈতন্য মহা প্রভুকে প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হইয়াছে, তাহারা ঐ ত্রিবিধ সম্পদে হীন তো হয়ই নাই, হীনতার বিশেষ কোন লক্ষণও তাহাদিগের মধ্যে দেখা যাইতেছে না। স্নায়ু মণ্ডলই মানবের প্রকৃত Energy, এ জাতির সে Energy কত রকমে পরীক্ষা করিতে চাও? তাহা কিয়দংশ গূঢ় হইয়াছিল মাত্র, নষ্ট হয় নাই। ডারউইন্ বলেন, জনন-হীনতাই জাতীয় বিলোপের প্রধান কারণ। বাঙ্গালীর সে কারণ অদ্যাপিও উপস্থিত হয় নাই। জানি, ইহাদিগের জন্ম সংখ্যা অপেক্ষা মৃত্যু সংখ্যা অধিক। ইহাদিগের সহস্র জনে জন্মের হার ৩৩, মৃত্যুর হার ৩৮ হইয়াছে। জানি, বর্ষে বর্ষে ইহাদিগের মধ্য হইতে ১২ লক্ষ লোক নানাবিধ রোগে মরিয়া যাইতেছে। † কিন্তু আমি সম্প্রতি লোক-পরীক্ষা

* অবশ্য, মৃত্যুর হার জন্মের হার অপেক্ষা কমাইতেই হইবে। চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতির সহিত এবং স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের প্রচারের সহিত. মৃত্যুর হার কমিবেই। নচেৎ জাতিয়া লাভ

দ্বারা যে সকল বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিয়াছি, তাহাতে জনন-হীনতার কোন-লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই। আমি জননশক্তির সম্বন্ধে যে তালিকা সংগ্রহ করিয়াছি, তাহার সারাংশ নিম্নে প্রকাশিত হইল ‡।

তবেই দেখা যাইতেছে যে, বাঙ্গালী স্নায়ু বিধানে ক্ষীণ হয় নাই ; ভাব বুদ্ধি ও উদ্যমে অবনত হয় নাই। কতিপয় বৎসর হইল এই জাতির যে উদ্যম-শীলতা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা জগতে অতুলনীয়। এত অল্পদিনে এমন প্রকাণ্ড সাহিত্য কোন্ জাতি গড়িতে পারিয়াছে? এত অল্পদিনে শিক্ষা ও শিল্প বাণিজ্যে এত উদ্যমশীলতা কোন্ জাতি দেখাইতে পারিয়াছে? সুতরাং মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, বাঙ্গালীর মন অধঃপতিত হয় নাই। যদি তাহাই হইল, তবে জাতীয় মঙ্গলকামী, (যিনি প্রকৃত ও স্থায়ী মঙ্গল কামনা করেন) তাঁহার নিরাশ হইবার কারণ নাই। তিনি বিবেচনা পূর্ব্বক জীব তত্ত্বের নিয়ম সকল প্রতিপালন করিয়া, বিশেষতঃ পরিবর্ত্তন ও বংশানুক্রমের নিয়ম সকল স্মরণ রাখিয়া, এই জাতির নরনারীগণকে পবিত্র দাম্পত্য সূত্রে সম্বদ্ধ করিতে জানিলেই জাতীয় প্রধান উপকরণ; অর্থাৎ যথাযোগ্য শিশু লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। সেই ভবিষ্যতের আশাতরু—বঙ্গশিশু—লাভ করিয়া এবং তাহাকে সুশিক্ষা ও সৎসঙ্গ দানে প্রতিপালিত করিয়া জাতীয় উন্নতির স্থায়ীত্ব বিধান করিতে সমর্থ হইবেন। সকল কর্ম্মের, সকল উন্নতির একমাত্র কর্ম্মী যিনি, তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইবেন। জাতির একমাত্র সম্বলই মানব। ধন, ঐশ্বর্য্য এ সকল স্থায়ী নহে, যথাযোগ্য মানব না থাকিলে, এ সকলে অধঃপতনের গতিরোধ করিতে পারে না। তাই কত সভ্যতা, কত সাম্রাজ্য জলবুদ্বুদের ন্যায় বিলীন হইয়া গিয়াছে। প্রাচীনগণ মানব গড়িতে জানেন নাই। বংশ পরম্পরার দিকে একাগ্র দৃষ্টি রাখিয়া মানব গড়িতেই হইবে। মানব সমাজের কথা ভাবিতে গেলেই যৌন সম্বন্ধের উপযোগীতাই প্রধান বিবেচ্য। যাঁহারা শক্তিশালী, কৃতী, মনের বলে বলীয়ান, যাঁহারা সুস্থ ও সমাজের উন্নতিকামী, তাঁহারাই পরবংশ গঠিত করিবেন। তাঁহারাই পবিত্র বিবাহ বন্ধন আশ্রয় করতঃ স্থায়ী উন্নতির ভিত্তি স্থাপন করিবেন। যাহারা রুগ্ন, দুর্ব্বলমনা ও সমাজদ্রোহী, তাহারা অনুরূপ অপত্য-জন্মদান করতঃ ভবিষ্যৎ সমাজকে অধঃপতিত করিবার দাবী রাখিতে

নাই। অধিক জন্ম, অধিক মৃত্যু। সুতরাং জন্মের আধিক্যে লাভ নাই, যদি মৃত্যুর সংখ্যা হ্রাস না হয়। ইহা হইবেও। মূল কথাই জননহীনতা।

‡ এই তালিকা এক্ষণে বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদ মন্দিরে।

পারিবে না। দেহে ও মনে সুস্থ ও সবল নরনারী ভবিষ্যৎ সমাজ গঠিত করিবেন, অন্যে করিতে পারিবে না। ইহাই জাতীয় উৎকর্ষ সাধনের মূল মন্ত্র। এ মন্ত্রে সিদ্ধ হইতে খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি বহু বিষয়ের আলোচনা করা আবশ্যক; কিন্তু আমার সে সময় ও সামর্থ্য নাই। তথাপি একথা বলিতে পারি যে, অভিলষিত নরনারী স্ব-সমাজে সুলভ হয় ভালই, নচেৎ অন্য সমাজ হইতেও গ্রহণ করা আবশ্যক হইতে পারে। হইতে পারেই বা বলি কেন? সময় সময় তদ্রূপ করা জাতীয় উন্নতির পক্ষে অত্যাবশ্যক। এইরূপ করিলে সমাজ মধ্যে নূতন রক্তের সহিত নবশক্তি সঞ্চারিত হয়। সমাজ যখন অন্তর্জাতীয় বিবাহ দীর্ঘকাল অবলম্বন করে, তাহার পর বহির্জাতীয় বিবাহ প্রয়োজনীয় হয়। এতদুভয় বিবাহ প্রণালী বিবেচনা পূর্ব্বক অবলম্বন করিলে জাতীয় চরিত্র যেমন স্থায়ীত্ব লাভ করে, তেমনই সেই স্থায়ী ভিত্তির উপর কল্যাণকর পরিবর্ত্তন আসিয়া উপস্থিত হইবার অবসর পায়। নচেৎ জাতীয় স্থিতিস্থাপকতা থাকে না। এ কথা বর্ত্তমান সময়ে এতদ্দেশীয়গণের অপ্রীতিকর হইলেও, বিশেষ ভাবে বিবেচ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। পরবর্ত্তিগণ অযোগ্য হইলে কোন উন্নতিই স্থায়ী হয় না; একথা বিস্মৃত হইলে জাতীয় অবনতি নিবারণ করিবার উপায় নাই। মঙ্গলময়ের ইচ্ছায় এ কথা এতদ্দেশীয়গণের হৃদয়ে বদ্ধমূল হউক।

সংগৃহীত তালিকার সারাংশ।

জননশক্তির ও আয়ুষ্কালের হ্রাস বৃদ্ধি অবধারণ করিবার নিমিত্ত মোট ১৩৭জন লোককে জিজ্ঞাসা করা হয়। তন্মধ্যে ১৩১ জন হিন্দু, ৬ জন মুসলমান। সকলে সকল কথা বলিতে পারে নাই। তাহাদিগের উত্তর ৯টী তালিকাতে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। তাহাতে দেখা গেল যে, চারি পুরুষের মধ্যে শতকরা ২২.০৭ জনের জনন-শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে, এবং ১৪.৬ জনের হ্রাস হইয়াছে। ৭.৪ জনের জনন-শক্তি অতিমাত্র অব্যবস্থিত। অবশিষ্ট ৫৫.৯৩ জনের জনন-শক্তির সামান্য ইতরবিশেষ হইয়াছে; কিন্তু তাহাতে হ্রাস বৃদ্ধি বড় বুঝা যায় না। এই সকল তালিকাতে কোন কোন ব্যক্তির একাধিক স্ত্রীর অপত্যও এক স্ত্রীর অপত্যের ন্যায় গণনা করা হইয়াছে। কাহারও বংশে হঠাৎ অপত্য সংখ্যার অত্যন্ত বৃদ্ধি অথবা হ্রাস দেখা যায়, এবং বর্ত্তমান পুরুষে অনেকের সন্তান-জননক্ষম বয়স অতীত না হওয়ায় এখনও হ্রাস বৃদ্ধি নিশ্চিত রূপ বলা যায় না। কিন্তু অতীত তিন পুরুষের তুলনায় বোধ হয় জননশক্তি ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে।

ইহা দারিদ্র্যের লক্ষণ হইতে পারে; কারণ মোটের উপর গত তিন পুরুষে জনন-শক্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে। ব্যবসায় ভেদে জনন-শক্তির হ্রাস বৃদ্ধি বুঝা গেল না। তালিকা গুলির অধিকাংশেই ভদ্র লোকের নাম; সুতরাং উচ্চশ্রেণীর লোকের জননশক্তি বৃদ্ধি হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। নিম্ন শ্রেণীতে জনন-শক্তি বৃদ্ধি হওয়া সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।

চারি পুরুষের আয়ুঃ সম্বন্ধে এই তালিকায় দেখা যাইতেছে যে, প্রতি পুরুষের আয়ুস্কাল ক্রমে কিছু কিছু কমিয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান পুরুষ জীবিত; সুতরাং এই কমা স্থির থাকিবে কি না বলা যায় না। উর্দ্ধতন পুরুষের গড় আয়ু (Mean longivity) প্রপিতামহ শ্রেণীতে ৭০·৮, পিতামহ শ্রেণীতে ৬৪·৬ পিতা শ্রেণীতে ৫০·৬ জানা গিয়াছে এবং বর্ত্তমান পুরুষে উপস্থিত গড় আয়ুঃ ৩১·৮ কিন্তু এই শেষোক্ত অঙ্ক গ্রহণীয় নহে। জনন-শক্তি বাড়িতেছে অথচ আয়ুঃ কমিতেছে, সুতরাং অন্নকষ্ট অথবা মারাত্মক পীড়া অথবা উভয়েরই প্রাদুর্ভাব সূচিত হইতেছে।

সমাপ্ত।